রাজশাহীর ইতিবৃত্ত

এবনে গোলাম সামাদ

রাজশাহীর ইতিবৃত্ত

এবনে গোলাম সামাদ

www.pathagar.com

রাজশাহীর ইতিবৃত্ত
এবনে গোলাম সামাদ

১ম প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
প্রকাশনায় ঃ প্রীতি প্রকাশনী

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক

মুদ্রণে ঃ
দি বেঙ্গল প্রেস
রাণীবাজার, রাজশাহী

প্রচ্ছদ ঃ
এম, এ, কাইউম
প্রচ্ছদের নকসা-মুদ্রা (Ornamental motif) বাঘা মসজিদ এবং পুঠিয়ার মন্দিরের পোড়া মাটির ফলক থেকে নেওয়া

মূল্য ঃ অফসেট- ২০০.০০
শোভন- ১৭৫.০০

RAJSHAHIR ITEBRITTHYA by Ibne Golam Samad,
Published by : Priti Prokashoni
1st edition: February, 1999.
Price : Taka- Off-set- 200.00
Shovon- 175.00

www.pathagar.com

আরম্ভের আগে

মানুষ অতীতের কথা শুনতে ভালবাসে। সে চায় অতীতের মাধ্যমে বর্তমানের ব্যাখ্যা পেতে। একদিন রাজশাহীর ইতিহাস প্রসঙ্গে ঘরোয়াভাবে এক জায়গায় কথা হচ্ছিল। সেখানে ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মিজানুর রহমান মিনু। তিনি আমাকে রাজশাহীর ইতিহাস নিয়ে একটা ছোট বই লিখে দিতে বলেন। বর্তমান বইটি হতে যাচ্ছে তাঁর সেই অনুরোধের সাড়া। ঠিক প্রথাগত ভাবে লেখা ইতিহাস বই এটা নয়। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগাযোগ রেখে কিছু ঘটনার কথা আলোচনার চেষ্টা করা হবে এই বইতে। আমি বইটা লিখতে যাচ্ছি রাজশাহীর একজন পুরাতন পুরবাসী হিসাবে। এই লেখাতে তাই থাকবে আমার জীবন স্মৃতিরও ছাপ। যার কিছু অংশ হয়ত ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের উপকরণ হতে পারবে। এই বইয়ের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নানা প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং প্রবন্ধপঞ্জি থেকে। আমি ইতিহাসের শিক্ষক অথবা গবেষক নই। তবে এক সময় অবসর সময় কাটাতাম ইতিহাস পড়ে। এই ছোট বইটি লেখা সম্ভব হচ্ছে সেই ইতিহাস পঠনের জন্য। আর সেই সঙ্গে থাকছে বহু ব্যক্তির কাছে শ্রুত এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কথা। এই লেখার শৈলী হবে কতকটা একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির কথার পরে কথা বলে চলা।

www.pathagar.com

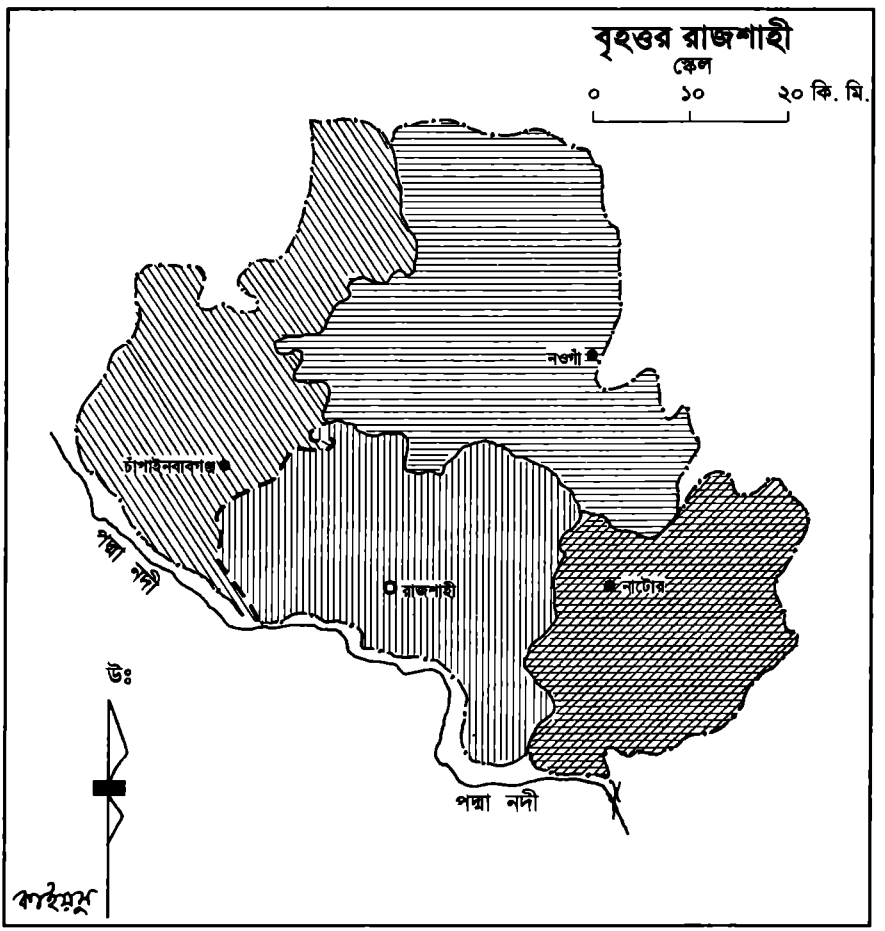

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ নাম, সীমানা ও সময় পরিধি	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ রাজশাহী অঞ্চলের নৃ-পরিচয়	৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ প্রাচীন যুগের ইতিহাস পরিক্রমায় রাজশাহী	১৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ মধ্যযুগের মুসলিম সংস্কৃতি ও রাজশাহী	২২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ রাজশাহীতে রেশম ও নীল	২৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ সাবেক রাজশাহী জিলার জমিদার বৃন্দ	৩৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ জমিদারী পর্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি	৪৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ সে সময়ের রাজশাহীর সমাজ জীবন	৫৬
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ বৈষ্ণবদের খেতুর মেলা	৬৭
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ খ্রিষ্টান মিশনারীদের কথা	৭২
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ মুসলিম মানসে বিবর্তন	৮১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ রাজশাহীতে রাজনীতির ধারা	৯০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	ঃ রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে	৯৭
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	ঃ ক্ষেত-খামার	১০১
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	ঃ জীবিকার আর সব উপায়	১০৮
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী	১১৩
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	ঃ পীর আউলিয়া-দরবেশ	১১৯
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ জন-সংস্কৃতি	১২৮
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ নাথ-সাহিত্য	১৩৬
বিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ লোক-শিল্প	১৪৩
একবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ গাছপালা ও জীবজন্তু	১৪৭
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ	১৫১
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ কারিগরী শিক্ষা	১৬২
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ অপরাধ ও শাস্তি	১৬৬
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	ঃ বিচিন্তা	১৭১
পরিশিষ্ট	ঃ রাজশাহী বিভাগ পরিচয়	১৭৪
আলোকচিত্র	ঃ	১৭৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ
নাম, সীমানা ও সময় পরিধি

প্রথমেই কথা ওঠে নাম নিয়ে। "রাজশাহী" নামটার বুৎপত্তি নিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক আছে। কারণ "রাজা" এবং "শাহ" শব্দ দুটি একই অর্থ বহ। একটি সংস্কৃত আর অপরটি ফারসী। শাহ "থেকে বিশেষণ" "শাহী" শব্দের অর্থ হলো "রাজকীয়"। "রাজশাহী" নামের তাই অর্থ দাঁড়ায় "রাজা রাজকীয়"। কিন্তু রাজাকে তো রাজকীয় হতেই হবে। রাজশাহী নামটা তাই অনেকের কাছে মনে হয়েছে হেঁয়ালী।

তবে বাংলা ভাষায় আমরা অনেক কথা দুবার করে বলি। যেমন, " চাষ-আবাদ," "শাক-সবজি," "চালাক-চতুর," "ভুল ভ্রান্তি" প্রভৃতি। এই একই ভাবে উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে রাজ-শাহী নামটিও। রাজশাহী রাজকীয় রাজাদের আবাস ভূমি।

আর একটি মত ঃ রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানায় ভাতুড়িয়া নামে একটি গ্রাম আছে। অতীতে গণেশ নামে এখানে একজন পরাক্রান্ত সামন্ত ছিলেন। এই সামন্ত এক সময় গৌড়ে ক্ষমতা দখল করে নেন। হন রাজা গণেশ। অনেকের মতে রাজা গণেশের নাম অনুসারে হয়েছে "রাজ-শাহী" নাম। কারণ গণেশ সাধারণ ভাবে "রাজা" নামে পরিচিত ছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি হন শাহী বা রাজকীয়। কিন্তু রাজা গণেশ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত কিছু জানিনা। ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্ব কালে তিনি প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং এক পর্যায়ে নিজ হাতে শাসন ভার গ্রহণ করেন। রাজা গণেশের এক পুত্রের নাম ছিল যদু। যদু নিজ ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং জালাল-উদ-দীন নাম ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। জালাল-উদ-দীনের রাজ্য ছিল বিশাল। কুশী নদীর ধার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছিল তার রাজ্যের ব্যাপ্তি। জালাল-উদ-দীন-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র শামস-উদ-দীন আহ্মদ শাহ কিছুদিন রাজত্ব করেন। পরে তিনি তার অনুসারীদের চক্রান্তে নিহত হন। এরপর আবার ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। অনেকে এই বংশকে এখন "মাহ্মুদ শাহী" বংশ হিসাবে উল্লেখ করতে চান।

আগে বাংলাদেশ নামে কোন দেশ ছিল না। বাংলাদেশ নামটা পাওয়া যাচ্ছে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। সামস-ই-সিরাজ আফিফ তাঁর ফারসীতে লেখা ইতিহাস গ্রন্থ "তারিখ-ই-ফীরোজ শাহী"-তে ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহকে বলেছেন "সুলতান-ই-বঙ্গালহ"। ইলিয়াস শাহ কে নিয়ে এক সময় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। কিন্তু এখন আর নেই। কারণ ৭৪৩ হিজরিতে (১৩৪২ খৃঃ) উৎকীর্ণ ইলিয়াস শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহ বা মাহ্মুদ-শাহী বংশ সম্পর্কেও অনেক তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে। মাহ্মুদ শাহী বংশের অন্যতম সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতে শাহ-র সময়ের একটি শিলা লিপি রাজশাহী শহরের হেতেম (হাতেম) খাঁ নামক পাড়া থেকে পাওয়া গিয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় আর একটি মত, যা এখন বেশী চলে, তা হলো, নামটা আসলে সৃষ্টি হয় নবাবী আমলে, একটি বিশেষ কারণে। "রাজশাহী" নামটা আসলে খুব পুরাতন নয়। সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্য ছিল ১৫ সুবাতে বিভক্ত। এর মধ্যে একটি সুবার নামে হলো "বঙ্গালহ্"। এই বঙ্গালহ, সুবা ছিল ২৪-টি সরকারে বিভক্ত। এই সরকারগুলি আবার বিভক্ত ছিল কতগুলি পরগনায়। অনেক গুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো এক একটি পরগনা। মুঘল আমলের সুবাকে কতকটা তুলনা করা চলে ইংরাজ আমলের প্রদেশের সঙ্গে। আর সরকারকে কতকটা তুলনা করা চলে জেলার সঙ্গে। শাসন ও খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্যে সম্রাট শাহজাহান-এর সময় থেকে কতকগুলি পরগনাকে একত্রিত করে এক একটি চাকলা গঠন করা হতে থাকে। মুনসি গোলাম হুসেন সালীম, তাঁর ফারসীতে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ, "রিয়াজ-উস-সালাতীন"-এর এক যায়গায় বলেছেন, "রাজশাহী" বলে একটি চাকলা ছিল। এই চাকলার জমিদার ছিলেন উদিত নারায়ণ। তিনি কার্যত ছিলেন একজন স্বাধীন সামন্তের মত। তিনি তাঁর নিজ চাকলা ছাড়াও বিস্তীর্ণ খাস জমি থেকে খাজনা আদায় করতেন। এই খাজনার একটি অংশ তিনি নবাবকে দিতেন। এক পর্যায়ে নবাব মুর্শিদ কুলী খার সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয় এবং যুদ্ধবাধে। যুদ্ধ হেরে যেয়ে জমিদার উদিত নারায়ণ আত্মহত্যা করেন। মুর্শিদ কুলী খা উদিত নারায়ণের জমিদারী রাম জীবন ও কুলী কুন্ওয়ার নামক দুজন জমিদারের মধ্যে (ইজারাদারের মধ্যে) ভাগ করে দেন। কারণ, এ দুজন জমিদার ছিলেন খুবই বিশ্বাস ভাজন। এঁরা নবাবকে যথা সময়ে প্রাপ্য খাজনা পরিশোধ করে দিতেন। আমরা এর পর অনুমান করতে পারি যে রাম জীবন এভাবে হয়ে ওঠেন "রাজশাহীর" জমিদার।

রাম জীবনের জমিদারীর কেন্দ্র ছিল নাটোর। কিন্তু যেহেতু এ সময় থেকে নাটোরের জমিদার রাজশাহীর জমিদার হিসাবে পরিচিত হতে থাকেন, তাই সেই সূত্রে এসে যায় রাজশাহী নামটা। যা পরে হয় একটা জেলার নাম ।

"জেলা" এবং "মহকুমা" শব্দ দুইটি আরবী। কিন্তু জেলা এবং মহকুমা বলতে ইংরাজ আমলে যে ধরনের প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগকে বোঝান হতে থাকে মুঘল আমলে তা ছিল না। ইংল্যান্ডের ডিসট্রিক্ট্-এর অনুকরণে লর্ড হেসটিংস প্রথম বাংলা প্রদেশকে কতগুলি জেলায় বিভক্ত করেন। শুরুতে রাজশাহী জেলা বলতে একটা খুব বিরাট অঞ্চলকে বোঝাত। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এর আয়তন ছিল ৩৩৬৭০ বর্গ কিলোমিটার (১৩,০০০ বর্গ মাইল)। এতবড় জেলা এক জন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে শাসন করা ছিল খুবই কঠিন। তাই ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে পদ্মার দক্ষিণে সাবেক রাজশাহী জেলার যে অংশ ছিল তা অন্য জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী থেকে থানা রোহনপুর,চাপাই এবং তখন কার দিনাজপুর (এখন যে অংশ ভারতে পড়েছে) ও পূর্ণিয়া (বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশের একটি জেলা) থেকে কতগুলি স্থান নিয়ে গঠন করা হয় মালদহ নামক একটি নতুন জেলা (যার অধিকাংশ এলাকা এখন ভারতে পড়েছে)। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী থেকে থানা আদম দিঘি, নওখিলা, শেরপুর, বগুড়া এবং রংপুর হতে দুই থানা নিয়ে ও দিনাজপুর হতে তিন থানা বের করে নিয়ে বগুড়া জেলা গঠন করা হয়। এর আট বছর পর রাজশাহী হতে থানা

www.pathagar.com

শাহজাদপুর, খেতুপাড়া, মথুরা ও পাবনা নিয়ে গঠন করা হয় ইংরাজ আমলের তখনকার পাবনা জেলা।

এই ভাবে সেই সাবেক বৃহৎ রাজশাহী জেলা ভেঙ্গে পরে অনেক গুলি জেলার উদ্ভব হয় ইংরেজ আমলেই। নাটোর মহকুমা গঠিত হয় ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং নওঁগা মহকুমা গঠিত হয় ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। ইংরেজ আমলে নওঁগা মহকুমা গঠন করবার সময় তখন কার দিনাজপুর জেলা থেকে মহাদেবপুর থানা এবং বগুড়া জেলা থেকে আদম দিঘি থানার কিছু অংশ ও সে সময় কার মালদা জেলার নবাবগঞ্জ থানা থেকে কিছুটা অংশ কেটে নওঁগা মহকুমার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইংরেজ আমলে রাজশাহী জেলার ছিল তিনটি মহকুমা: রামপুর-বোয়ালিয়া (সদর), নাটোর এবং নওঁগা। প্রথমে রামপুর-বোয়ালিয়ার ছিল ছয়টি, নাটোরের চারটি এবং নওগাঁর চারটি থানা:

রামপুর-বোয়ালিয়া (রাজশাহী) মহকুমা (সদর)
(১) বোয়ালিয়া
(২) চারঘাট
(৩) পুঠিয়া
(৪) গোদাগাড়ী
(৫) তানোর
(৬) বাগমারা
নাটোর মহকুমা
(৭) নাটোর
(৮) লালপুর (বিল মারিয়া)
(৯) বড়াই গ্রাম
(১০) সিংড়া
নওগাঁ মহকুমা
(১১) নওগাঁ
(১২) পাঁচুপাড়া
(১৩) মহাদেবপুর
(১৪) মান্দা

পরে ইংরাজ আমলে এই ১৪ টি থানা ভেঙ্গে গঠিত হয় ২২ টি থানা। এগুলো হলোঃ

রামপুর-বোয়ালিয়া(রাজশাহী) মহকুমা (সদর)
১। বোয়ালিয়া
২। চারঘাট
৩। পুঠিয়া
৪। দুর্গাপুর
৫। গোদাগাড়ী

www.pathagar.com

৬। তানোর
৭। বাগমারা
৮। মোহনপুর
৯। পবা

নাটোর মহকুমা

১০। নাটোর
১১। সিংড়া
১২। গুরুদাসপুর
১৩। বড়াইগ্রাম
১৪। বাগাতিপাড়া
১৫। লালপুর

নওগাঁ মহকুমা

১৬। নওগাঁ
১৭। মাধবপুর
১৮। বাদল গাছি
১৯। মান্দা
২০। নিয়ামতপুর
২১। রানীনগর
২২। আত্রাই

বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী জেলার আয়তন পরিবর্তনকে এই ভাবে দেখান চলে ঃ

১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ	১২,৯৯৯ বর্গ মাইল
১৭৮৬	১২,৯০৯ বর্গ মাইল
১৮৭২	২,২৩৪ বর্গ মাইল
১৮৯১	২, ৩৩০ বর্গ মাইল
১৮৯৭	২,৪৯৮ বর্গ মাইল
১৯৮১	৩৬৫৩ বর্গ মাইল
১৯৮৩	৮৪৯ বর্গ মাইল

নাটোর একটা খুব প্রাচীন জনপদ। অনেক ভাষাতাত্ত্বিকের মতে নাটোর নামটা ছিল কোন একটি অনার্য ভাষার শব্দ। আর্য ভাষার নয়। নাটোরকে মহকুমা শহর করবার আগে নাটোর ছিল রাজশাহী জেলার সদর। অর্থাৎ প্রশাসনিক এবং রাজস্ব কেন্দ্র। নাটোর থেকে জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে আনা হয় রামপুর-বোয়ালিয়াতে। বর্তমান রাজশাহী শহরের আগের নাম হলো রামপুর-বোয়ালিয়া। রামপুর এবং বোয়ালিয়া ছিল দুটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। যার মধ্যে দিয়ে প্রবহমান ছিল একটা ছোট নদী। যে নদীটি এখন আর নেই। যা একদিকে যুক্ত ছিল (নওহাটার) কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া বারনই এবং অপর দিকে পদ্মার সঙ্গে। রামপুর-বোয়ালিয়া ছিল রেশম এবং নীল ব্যবসায়ের কেন্দ্র এবং বড় নদী বন্দর।

www.pathagar.com

জায়গাটা ছিল পদ্মা নদীর ধারে এবং খুবই স্বাস্থ্যকর। তাই নাটোর থেকে জেলা সদর সরিয়ে আনা হয়েছিল এখানে। কেবল জেলা সদর নয়, এখানে ইংরাজ আমলে এক সময় স্থাপন করা হয় বিভাগীয় সদর দফতর। কিন্তু সে সময় রাজশাহী সদরের সঙ্গে রেল যোগাযোগ না থাকায় বিভাগীয় দফতর পরে স্থানান্তরিত করা হয় জলপাইগুড়িতে, যা এখন ভারতের অংশ। ইংরাজ আমলে ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহীতে বিভাগীয় সদর দফতর ছিল।

রামপুর-বোয়ালিয়া বহুদিন নদী বন্দর হিসাবে খ্যাত ছিল। নদী পথেই এখান থেকে রেশম এবং নীল (Indigo) চালান যেত। রামপুর-বোয়ালিয়ার সঙ্গে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে। রাজশাহী রেল স্টেশন চালু হয় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ। রাজশাহী রেল স্টেশন ছিল একটা খুবই ছোট রেল স্টেশন। ইংরাজ আমলে এর বিশেষ কোন বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল না। নদী পথেই বেশীর ভাগ মাল আনা নেওয়া করা হতো।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হবার ফলে রাজশাহী জেলার আবার আয়তন বাড়ে। মালদহ জেলার ১৫টি থানার মধ্যে ৫টি থানা এসে যুক্ত হয় রাজশাহী জেলার সঙ্গে। এই পাঁচটি থানাকে নিয়ে গঠন করা হয় একটি নতুন মহকুমা, যার নাম হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ইংরাজ আমলের দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ পড়ে ভারতে। কিছু অংশ পাকিস্তানে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক দিনাজপুর জেলা থেকে তিনটি থানা এসে যুক্ত হয় নওগাঁ মহকুমার সঙ্গে। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জকে করা হয় চারটি পৃথক জেলা। কিন্তু বেসরকারী ভাবে, পত্র পত্রিকায় এখনও এদের একত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে বৃহত্তর রাজশাহী হিসাবে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান হবার পর রাজশাহী শহরে স্থাপিত হয় রাজশাহী বিভাগের সদর দফতর। পাকিস্তান হবার পর প্রথম দিকে খুলনা একটা পৃথক বিভাগ ছিল না। এখন যা খুলনা বিভাগ, তা ছিল রাজশাহী বিভাগেরই অংশ।

পাকিস্তান হবার পর তাই রাজশাহী শহর, বিভাগীয় শহর হিসাবে লাভ করে বিশেষ গুরুত্ব। ইংরাজ আমলে রাজশাহী বিভাগ (Division) থাকলেও এর সদর ছিল জলপাইগুড়িতে। যা এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অংশ। ইংরাজ আমল শেষ হবার আগে, রাজশাহী বলতে বোঝাত একটা শহর, একটা জেলা এবং একটা বিভাগের নামকে। ইংরাজ আমলের শেষ পর্বে রাজশাহী বিভাগ ছিল আটটি জেলায় বিভক্ত। এরা হলোঃ রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং। ইংরাজ আমলের বাংলা প্রদেশ ছিল পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। এরা হলোঃ প্রেসিডেনসি, বর্ধমান, রাজশাহী, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম।

আগে পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ নামগুলি প্রচলিত ছিল না। এসব নামের ব্যবহার শুরু হয় ইংরাজ আমলে, ভূগোল বই লিখতে যেয়ে। ইংরাজ আমলের বাংলা প্রদেশের যে অংশ ছিল ভাগীরথী নদীর পশ্চিমে, তাকে বর্ণনা করা হতো পশ্চিমবঙ্গ হিসাবে। পদ্মা নদীর দক্ষিণে এবং ভাগরথী ও মধুমতী নদীর মধ্যবর্তী অংশকে উল্লেখ করা হতো

www.pathagar.com

মধ্যবঙ্গ হিসাবে। যমুনা ও মধুমতীর পূর্বের অংশকে বলা হতো পূর্ববঙ্গ। আর যে অংশ যমুনার পশ্চিমে এবং পদ্মার উত্তর অবস্থিত, তাকে বলা হতো উত্তরবঙ্গ। কিন্তু এই বিভাগ যে খুব প্রাকৃতিক ছিল, তা নয়।

প্রাচীনকালে, পাল ও সেন রাজাদের সময় উত্তরবঙ্গের একটা অংশকে বলা হতো বরেন্দ্র। এটা ছিল একটি মন্ডল। অনেকগুলি মন্ডল নিয়ে তখন গঠিত হতো একটা ভুক্তি। বরেন্দ্র মন্ডল ছিল পুন্ড্রবর্ধন নামক ভূক্তির অন্তগর্ত। অতীতে "পুন্ড্র" বলে একটা জাতি ছিল। যারা ছিল মহা পরাক্রান্ত এবং রণ নিপুণ। মহা ভারতে উল্লেখ আছে যে ভীম দিগ্বিজয়ে এসে মহাপরাক্রমশালী পুন্ড্রাধিপতি বাসুদেবকে পরাজিত করেছিলেন। অনেকে এখন রাজশাহীর ইতিহাস বলতে বরেন্দ্র মন্ডলের ইতিহাসকে বোঝাতে চান। কিন্তু রাজশাহী জেলা হলো প্রাচীন বরেন্দ্র মন্ডলের একটা ভগ্নাংশ মাত্র, সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চল নয়। আমরা এই বইতে, রাজশাহীর ইতিবৃত্ত বলতে প্রধানত বুঝাবো, ইংরাজ আমলের শেষ ভাগে রামপুর-বোয়ালিয়া (রাজশাহী সদর), নাটোর এবং নওগাঁ মহকুমা নিয়ে গঠিত রাজশাহী জেলার ইতিহাসকে। অবশ্য এর সঙ্গে সংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাসের কথাও নানা ভাবে আসবে। এই বইতে আমরা প্রাচীন যুগ বলতে ধরবো মৌর্যদের সময় থেকে সেন রাজাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়কে। মধ্যযুগ বলতে বুঝবো, বিন বখতিয়ারের সময় থেকে নবাবী আমলের শেষ ভাগকে, যে সময় এদেশে থেকেছে মুসলিম ধর্ম চেতনা এবং ফারসী ভাষার বিশেষ প্রাধান্য। ইংরাজ আমলে, ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আদালতে ফারসীর স্থলে ইংরাজীর প্রবর্তন হয়। আধুনিক যুগ বলতে সাধারণ ভাবে ধরা হবে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এ সময় থেকেই ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের দেশে এসে পৌছাতে থাকে ইউরোপের নবজন্মের (Renaissance) চিন্তা-চেতনা। সমকাল বলতে আমরা বুঝাবো ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্টের পরবর্তী সময়কে। বর্তমান বইটি প্রথাগত ইতিহাস বই না হলেও ঐতিহাসিক যুগ বিভাগকে কিছুটা মেনে চলা হবে। কারণ, এর ফলে ইতিহাস আলোচনায় সুবিধা হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
রাজশাহী অঞ্চলের নৃ-পরিচয়

নৃজাতিক (Ethinic) ইতিহাসে একটা অঞ্চলের মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য (Physical features), তার ভাষা এবং তার ধর্ম চেতনার বিশেষতা নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়। মানবধারা (Racialtype) বলতে বোঝায় এমন লোক-সমষ্টি যাদের দেখে অন্য লোক-সমষ্টি থেকে পৃথক বলে মনে হয়। কিছু বংশগত বাহ্যিক শারীরিক বৈশিষ্টাদি থাকবার কারণেই এ ভাবে তাদের পৃথক করা যায়। যেমন, মাথার চুল, মাথার আকৃতি, গায়ের রং, নাকের আকৃতি চোখের অবস্থা, মুখের চেহারা ও উচ্চতার পরিমাপ। এসব বৈশিষ্ট্য জৈবিক। এরা এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে জন্মগতভাবে বর্তাতে পারে। রাজশাহী অঞ্চলে যে রকম মানুষ অধিক হারে দেখা যায়, তাদের মাথা সাধারণ হতে দেখা যায় গোলাকৃতির। নাক টিকাল না হলেও চেপ্টা নয়। গায়ের রং সাধারণত কাল। তবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নয়। চুল মসৃণ, খড়খড়ে নয়। মুখে যথেষ্ট দাড়ি গোঁফ হতে দেখা যায়। এদের অনুরূপ মানুষ এশিয়ার পামীর অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, গালচা এবং তাজিক। এরকম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মানুষকে অনেকে বলেন আলপাইন। কারণ, ইউরোপের আল্পস পাহাড়ের ধারেও এরকম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ অনেক দেখতে পাওয়া যায়। যাদের মাথার আকৃতিও গোল। আমরা পুন্ড্রদের কথা বলেছি। পুন্ড্ররা দেখতে কেমন ছিল আমরা তা জানিনা। এখনকার বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ তাদের বংশধর কিনা, তাও বলা যায় না। কথিত আছে, গৌড়ের একজন রাজা ছিলেন, যাঁর নাম আদিশূর। তিনি উত্তর ভারত থেকে কয়েক ঘর খাঁটি ব্রাহ্মণ এনে এদেশে বসান। তাদের থেকে জন্মনেন পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণগণ। কিন্তু উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের মাথা সাধারণ হতে দেখা যায় লম্বা। অথচ এদেশের ব্রাহ্মণদের মাথা সাধারণত হয়ে থাকে গোল। তাই এই কিংবদন্তি কতটুকু সত্য, তা বিতর্কের বিষয়। নৃতত্ত্বে যাদের বলে "আর্য" তাদের প্রভাব এই অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, বাংলার মোট জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সংখ্যায় এত কম কেন, এই সমস্যার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা নেই। উত্তরবঙ্গে চিরদিনই উচ্চ বর্ণের হিন্দুর সংখ্যা, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ছিল আরো অনেক কম।

যাদের বলা হয় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ তাদের মাথার প্রস্থ হলো তাদের মাথার দৈর্ঘ্যের শতকরা ৮০ দশমিক ৮ থেকে ৮৩ দশমিক ১-এর মধ্যে। দেহের উচ্চতা হলো ১৬২ থেকে ১৭৪ সেন্টিমিটারের মধ্যে। বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলমানদের দেহের মাপ-জোখ বিশেষ সংগৃহীত হয়নি। কিন্তু একটি হিসাব অনুসারে মুসলমানদের মাথার প্রস্থ হলো দৈর্ঘ্যের শতকরা ৭৮ দশমিক ৮ ভাগের কাছাকাছি এবং দেহের উচ্চতা ১৬৩ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। অর্থাৎ মুসলমানদের মাথার প্রস্থ বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মাথার প্রস্থের তুলনায় হলো কিছুটা কম। তবে মোটামুটিভাবে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদের মাথাকে বলা চলে

www.pathagar.com

গোলাকৃতি নৃতত্ত্বে যদি,

প্রস্থ × ১০০ হয় ৭৬- এর বেশী না হয়, তবে সে রকম মাথাকে বলে লম্বা মাথা
দৈর্ঘ

(Dolichoephalie)।

যদি হয় ৮১ বা তার বেশী, তবে তাকে বলে গোলাকৃতি (Brachycephalic) মাথা। আর যদি হয় ৭৬ থেকে ৮১ এর মধ্যে, তবে তাকে বলে মধ্যমাকৃতি (Mesocehalic) মাথা। বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলমানদের মাথা মধ্যমাকৃতি প্রবণতা সম্পন্ন।

নৃতত্ত্বে মানুষের নাকের আকৃতিকেও তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। চিকন-নাক (Leptorrhire), মধ্যমাকৃতি নাক (Mesorrhine) এবং চওড়া নাক (Platyrrhine) । চিকন-নাক সরু এবং উঁচু। আর চওড়া নাকের অগ্রভাগ চওড়া এবং বোঁচা। রাজশাহী অঞ্চলের মানুষের নাকের গড়ন সাধারণভাবে হলো মধ্যমাকৃতি। তা সরু নয়। আবার তা চেপ্টাও নয়। সব মানুষের দেহের রক্ত সব মানুষের দেহে প্রদান করা যায় না। মানুষের রক্তকে সাধারণত A.B.O এবং AB গ্রুপে ভাগ করা যায়। রক্তের এই গ্রুপ (group) গুলি বংশগতির বিশেষ সূত্র অনুসারে মানুষের বংশধারায় বর্তায়। রাজশাহী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত মোটামুটি এই হারে পরিলক্ষিত হয় ঃ B = ৩৫%, O = ৩৪%, A= ২৩% এবং AB = ৮%। রাজশাহী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে B ও O গ্রুপের রক্ত সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা তুলনামুলক ভাবে বেশী।

রাজশাহী অঞ্চলে মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খুব বেশী সংখ্যায় নয়। এদের মাথার চুল হলো খড়খড়ে। এদর মুখে দাড়ি-গোঁফের পরিমাণ থাকে কম। নাক উন্নত নয়। তবে ঠিক বোঁচাও নয়। চোখের উপর পাতায় বিশেষ ধরনের ভাঁজ (Epicanthic fold) থাকতে দেখা যায়। যে কারণে এদের চোখকে ছোট বলে মনে হয়। যাদের বলা হয় সেনট্রো মঙ্গল (centro-Mongol), তাদের মধ্যে B গ্রুপের রক্ত সম্পন্ন মানুষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রাজশাহী অঞ্চলে না হলেও উত্তরবঙ্গের কোন কোন জায়গায় মুসলমানদের মধ্যে মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। খালি চোখে দেখেই যা বোঝা যেতে পারে।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত O'Malley লিখিত গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, এখন যাকে বলা হয় রাজশাহী জেলা, প্রাচীন কালে তা ছিল পুন্ড্রবর্ধনের অংশ। এর পূর্বে ছিল করতোয়া নদী আর পশ্চিমে মহানন্দা। এর দক্ষিণে ছিল পদ্মা । কিন্তু এর উত্তরভাগকে যথেষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়না। উত্তরভাগে ছিল হিমালয় অঞ্চল থেকে আগত নানা লোকসমষ্টির বাস। যাদের একত্রে বলা হতো "কিরাত"। এখন মনে করা হয়, কিরাত বলতে বোঝায় মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষদের।

www.pathagar.com

মিনহাজ-ই-সিরাজ তার ফারসীতে লেখা ইতিহাস গ্রন্থ, "তববাকাৎ-ই-নাসিরী"-তে বলেছেন, বিন বখতিয়ার যখন বঙ্গ বিজয় করেন, তখন গৌড়-এর উত্তরে এবং হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে মেচ, কোচ এবং থারু নামে জাতি বাস করতো। মেচ জাতির একজন সর্দার বিন বখতিয়ার-এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার নাম হয় আলী। আলীমেচ পরে গৌড়-এর অধিপতি হন। মেচরা এখনও কিছু কিছু আসামে বাস করে। এরা বৃহৎ মঙ্গোলীয় মানবধারাভুক্ত। কোচদের থেকেই উদ্ভব ঘটেছে রাজবংশীদের । রাজশাহীর তানোর থানায় কিছু রাজবংশী আছে। অবশ্য রাজবংশীরা কখনোই স্বীকার করতে চায়না যে কোচদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক আছে। তারা নিজেদের দাবী করে ক্ষত্রিয় হিসাবে। কিন্তু কোচরা এক সময় যথেষ্ট যুদ্ধ করেছে এবং রাজ্য গড়েছে। কুচবিহার রাজ্য কোচদের স্মৃতিবাহী। যা ইংরেজ আমলে ছিল একটা করোদ রাজ্য। কোচ এবং রাজবংশীরা সকলেই এখন কৃষিজীবী। এরা আগে যে ভাষায় কথা বলতো, এখন আর তা বলেনা । এদের সবার ভাষা এখন হলো বাংলা। এমনকি ঘরেও তারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে।

রাজশাহীর একটা অঞ্চলে মেয়েরা আগে শাড়ী পরতো না। পরতো "কাপা"। কাপা বলতে বোঝোয় পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা এবং বক্ষে বিশেষভাবে বাঁধা আর একটি কাপড়। এ ধরনের কাপড় পরতে দেখা যায় বিভিন্ন মোঙ্গলীয় লোক-সমষ্টির মেয়েদের। তাই মনে হয়, "কাপা" পরা মঙ্গোলীয় ঐতিহ্যের প্রভাব।

রাজশাহী অঞ্চলে একাধিক উপজাতি বাস করে। যেমন, সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মাল পাহাড়ী। এরা এখানকার ভূমিজ সন্তান (autochthon) নয়। পরদেশী। মাত্র ইংরাজ আমলে এরা এই অঞ্চলে এসে বসতি করেছে। মানবধারার দিক থেকে অনেক নৃতাত্ত্বিক এদের উল্লেখ করেন " মেলানো-ইন্ডিয়ান" (Les Melano-Indians) বা কৃষ্ণ-ভারতীয় হিসাবে। সম্ভবত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এদেরকেই বলা হয়েছে "নিষাদ"। এদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চুল তরঙ্গাকৃতি। মাথা লম্বাকৃতি। নাক মধ্যমাকৃতি (Mesorrhine)। দেহ খর্বকায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে,এই মানবধারার প্রভাব এই উপ-মহাদেশের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আছে। সাঁওতালরা এদের একটা বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত। সাঁওতালরা এক সময় বাসকরত ছোট নাগপুরের আরণ্যক অঞ্চলে। পরে ইংরেজ আমলে এরা সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। নীলকর সাহেবরা অনেক সাঁওতালকে নীলচাষ করবার জন্য নিয়ে আসে মালদহ অঞ্চলে। সেখান থেকে বিংশ শতকের গোড়ায় এরা আসতে আরম্ভ করে তখনকার রাজশাহী জেলায়। এদের এখন সবচেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায় নওগাঁ জেলায়। বর্তমান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাতেও অনেক সাঁওতাল বাস করে। নবাবগঞ্জের নাচোল থানায় অনেক সাঁওতাল ছিল। বহু হিন্দু জমিদার সাঁওতালদের নিয়ে আসেন বরিন্দায়, জঙ্গল কেটে আবাদি জমি বেরকরবার জন্যে। প্রথমে বন কেটে কৃষিক্ষেত্র তৈরি করবার পর কয়েক বছর সাঁওতালদের কাছ থেকে ঐ জমি বাবদ কোন খাজনা নেওয়া হতো না। বিনা খাজনায় ওদের কয়েক বছর জমি আবাদ করতে দেওয়া হতো। কিন্তু পরে দাবী করা হতো খাজনা। খাজনা না দিলে জমি থেকে ওদের উচ্ছেদ করে জমি নিলাম করা হতো।

www.pathagar.com

একটা পুরাতন সাঁওতাল গানের কথা বস্তু হলো এই রকম ঃ

হিন্দু বাবু হহো লেদা
সেদায় ঝাড়কাট দিছম
লিলম ও কান
সে দায় গোরম বাবা
চিরবুরু মানবুরু
কুটম টন্ডি জাগা জমি লেদারে
ঝাড় কাড দিছম দোলে দখল গোরা।

টানা বাংলা করলে দাঁড়ায়, হিন্দু বাবুরা বললো, তোমার জমি নিলাম হয়ে যাচ্ছে। এর উত্তরে সাঁওতাল বলছে, ও জমি আগে ছিল জঙ্গল। আমি জঙ্গল কেটে ক্ষেত করেছি। ও জমি আমার। আমি জমির দখল ছাড়বো না।

ইংরাজ আমলে উপজাতি (Tribal pesples) বলতে সাধারণত বোঝাত এমন লোক সমষ্টি, যারা দুর্গম স্থানে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাস করে; যারা কৃষিকাজ করেনা; যারা সাধারণত বন্য ফল-মূল আহরণ করে ও বন্য জন্তু শিকার করে খায়; যাদের একটা পৃথক ভাষা থাকলেও কোন লিখিত সাহিত্য নেই; যাদের ধর্ম চেতনায় অশরীরী আত্মা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে; যারা মনে করে তাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে তা অশরীরী আত্মা বা বোঙ্গা-র জন্য ঘটেছে। অশরীরী আত্মার জন্য সব কিছু ঘটে, এ রকম ধারণাকে নৃতত্ত্বে বলা হয় অ্যানিমিজম (Animism)। উপজাতিদের প্রথম দিকে আদমশুমারীর রিপোর্টে অ্যানিমিষ্ট (Animist) হিসাবে উল্লেখ করা হতো। বিদেশী খৃস্টান মিশনারীদের প্রভাবে অনেক সাঁওতাল খ্রিষ্টান হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাদের ব্যবধান না কমে বৃদ্ধি পেতেই চলছে। কারণ, বিদেশী খ্রিষ্টান মিশনারীরদের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করছে এক ধরনের মুসলিম বিদ্বেষ।

সাঁওতাল, মুন্ডা, হোঁ প্রভৃতি উপজাতির ভাষা নিয়ে মিশনারীরা বেশ কিছু গবেষণা করেছেন। এদের ভাষা সমূহকে এক সময় স্থাপন করা হতো একটা বৃহৎ ভাষা পরিবারে, যাকে বলা হতো "অস্ট্রিক" (Austric)। কিন্তু এখন ভাষাতাত্ত্বিকরা এই অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের অস্তিত্বকে আর স্বীকার করেন না। সাঁওতালদের ভাষা অন্য কোন ভাষা পরিবারে পড়ে না। এটাকে বলতে হয় একটা পৃথক পরিবার। রাজশাহী অঞ্চলের সাঁওতালদের ভাষার মধ্যে এখন বাংলা শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে। এ অঞ্চলের সাঁওতাল ভাষা আগের মতো থাকছে না।

বাংলা ভাষাকে সাধারণত আর্য ভাষা পরিবারে স্থাপন করা হয়। কিন্তু এর অনেক বৈশিষ্ট্য দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষার অনুরূপ। যেমন ধ্বন্যাত্মক (Onomatopoetic) শব্দ গঠন, যথা, কট্-কট, খট-খট প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রতিধ্বনিমূলক

www.pathagar.com

(Echo-words) শব্দ গঠন। বাংলা ভাষাতেও আমরা এভাবে শব্দ গঠন করে থাকি। যেমন, বাড়ি-টাড়ি, বড়োলোক-টড়োলোক ইত্যাদি। এসব ঠিক আর্য ভাষার রীতি নয়। বাংলা ভাষাকে অনেকগুলি উপ-ভাষায় (Dialect) বিভক্ত করা চলে।

রাজশাহী শহরে এক সময় একটা বিশেষ আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ছিল এবং এখনো সেই ভাষাটা কিছু কিছু প্রচলিত আছে। একটা পুরাতন লোকগীতি থেকে এই ভাষাটার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে ঃ

উত্তর হিনি অ্যালো বাদুড়, আমার গাছের শবরী খাবার
দক্ষিণ হিনি অ্যালো বাদুড়, আমার গাছের কলা খাবার
পূর্ব হিনি অ্যালো বাদুড়, আমার গাছের আম খাবার
পশ্চিম হিনি অ্যালো বাদুড়, আমার গাছের লিচু খাবার।

এটা একটা ভাল লোকগীতির পরিচয় নয়। এক সময় এই শহরে অনেক ফলের গাছ ছিল। আর বাদুড়ও ছিল অনেক। মানুষ রাত জেগে বাদুড় তাড়াত ফল রক্ষা করবার জন্য। রাজশাহীর ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে "ন" স্থলে "ল" উচ্চারিত হয়। যেমন, "নিবে" স্থানে বলা "লিবে"। অনেক সময় "র"-এর স্থলে "ল" উচ্চারিত হয়। যেমন, "শরীরে" না বলে বলা "শরীলে"। রাজশাহীর কথ্য ভাষায় "বলছি" স্থলে বলা হয় "বুলছি"। 'বল্ল' স্থলে "বুল্ল"।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্টের পর মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ থেকে এক সাথে অনেক লোক এসে বসতি করেছে রাজশাহীতে। তাঁদের কথিত ভাষার একটা প্রভাব এখন পড়ছে স্থানীয় কথিত ভাষার উপর। মালদহের আঞ্চলিক ভাষায় "আমাকে" স্থলে বলা হয় "হামাকে" , "খাওয়ান" স্থলে বলা হয় "খিলান"। ঐ অঞ্চলের ভাষার নমুনা হিসাবে একটা পুরান গম্ভীরা গানের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

শিব হে, তোমার একি সাজ?
মাথাত ব্যাইন্ধ্যাছ ক্যানে জটা!
ম্যালেরিয়ায় ভূগ্যা ভুগ্যা
ভুড়ি ক্যান কর‍্যাছ মোটা।
হাতি ঘোড়া ছ্যাড়ে দিয়া
ষাঁড়ের উপরে চড়্যা
তোমার কপাল গেলছে পুড়্যা।
এবার লতুন সাজে না সাজালে
পূজা কইরবে কেটা।

গম্ভীরা হলো মালদহ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসূচক লোকগীতি। এখানে যে শিবের কথা থাকে, সেই শিব হিন্দু ধর্মের সনাতন শিব নন। কৃষকের শিব। যিনি তাদের সঙ্গে এসে চাষ-আবাদ করেন। যাঁর গায়ে জোঁক লাগে। শিবকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা গানে "শিব-হে" স্থলে নবাবগঞ্জ অঞ্চলে বলে "নানা-হে"। মুসলমানদের রচিত গম্ভীরা গানে এখন শিব আর থাকেন

www.pathagar.com

না। এক সময় শিবকে বলো হতো "ভোলা নানা"। এখন বলা হয় কেবলই নানা।

পাকিস্তান হবার পর রাজশাহী শহরে বহু লোক এসে ছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকে। তাদেরও একটা প্রভাব পড়েছে এই শহরের জীবনে। অবশ্য মুর্শিদাবাদের প্রভাব এই অঞ্চলের উপর আগেও পড়েছে। সৈয়দ গুলাম হুসেন-এর ফারসীতে লেখা ইতিহাস গ্রন্থ "সিয়ার-উল-মুতাক্ষারিন" একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বইটি ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে লিখিত হয়। এই বইটি পড়লে নবাব আলীবর্দির সময়ের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। নবাব আলীবর্দির সময়ে মুর্শিদাবাদে বর্গির বিরাট হামাঙ্গা হয়। এসময় মুর্শিদাবাদ থেকে বহুলোক নদী পার হয়ে চলে আসেন রামপুর-বোয়ালিয়াতে। আর শেষ পর্যন্ত এখানেই তারা থেকে যান স্থায়ীভাবে। রাজশাহী শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার(১৯ মাইল) পশ্চিমে গোদাগাড়ী নামক স্থানে বর্গীর হাঙ্গামার সময় এসে আশ্রয়নেন নবাব আলীবর্দির পরিবারের সকলেই। এখানে এসে আশ্রয় নেন তার কন্যা এবং জামাতা নওয়াজেশ মাহমুদ। জাগৎশেঠ তার টাকশাল অস্থায়ীভাবে উঠিয়ে এনেছিলেন গোদাগাড়ীতে।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমাজ চিন্তায় অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার (Caste system) উপর প্রতিষ্ঠিত। "বর্ণ" কথাটার সাধারণ অর্থ হলো "রং"। এক সময় হিন্দু সমাজে ছিল চারটি প্রধান বর্ণ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। পরে এই চার বর্ণ থেকে অনেক বর্ণের উদ্ভব হয়। মহাভারতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণরা দেখতে ফর্সা, ক্ষত্রিয়রা দেখতে রক্তাভ, বৈশ্যদের রং পিতাভ এবং শূদ্ররা দেখতে হলো কালো। এথেকে মনে হয় বর্ণ ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে গড়ে উঠে ছিল জৈবমানবধারাগত পার্থক্যকে নির্ভর করে। কিন্তু এই বিভাজন ছিল অনেক পরিমাণে কর্মগতও। এক এক বর্ণভুক্ত মানুষ বংশ পরম্পরায় একই কর্ম করে চলতো। তাদের জীবিকার উপায় এবং জীবন যাত্রার ধরনে কোন পরিবর্তন আসতে পারতো না। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল পূজা করা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা; ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল যুদ্ধ করে ক্ষেত্র রক্ষা করা ; বৈশ্যদের কর্ম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য আর শূদ্রদের কাজ ছিল খেটে খাওয়া ও তিন বর্ণের মানুষের সেবা বা দাসত্ব করা।

হিন্দুদের প্রাচীনতম আইনগ্রন্থ হলো মুনুসংহিতা। এতে বলা হয়েছে ঃ

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসংচয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।

সমর্থ হলেও শূদ্রকে অধিক ধন সঞ্চয় করতে দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ, তাহলে সে তার নিজ কর্তব্য অর্থাৎ উচ্চজাতিকে সেবাকররূপ ধর্ম পরিত্যাগ করবে। এর ফলে ঘটবে সামাজিক অমঙ্গল। হিন্দু ধর্মে মনে করা হয়, বিধাতা মানুষকে জন্মগত ভাবেই ছোটবড় করে সৃষ্টি করেছেন। মুসলমান ধর্মে যা মনে করা হয় না। মুসলমান ধর্মে মনে করা হয়, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাঁর কর্মকে নয়। কর্মের স্বাধীনতা মানুষের আছে। তাই প্রশ্ন ওঠে, পাপ পূণ্যের। হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত অদৈতবাদী (monist)। তাঁরা পাপ-পুণ্যে তফাত করতে চান না। কিন্তু মুসলমানদের কাছে শয়তান মিথ্যা নয়। তাঁদের ধর্ম তাঁদের উপদেশ দিয়েছে, শয়তানের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলতে বোঝায়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য। আর বাকি সব অনুচ্চবর্ণ। অনুচ্চবর্ণের মধ্যে যাদের বলা হয় "নবশাখ" তাদের হাত থেকে ব্রাহ্মণরা "জল গ্রহণ" করতেন। এদের বলা হতো "জল-চল"। বাদবাকী সব অনুন্নত বর্ণের হিন্দুদের ছোঁয়া কোন জিনিস ব্রাহ্মণরা খেতেন না। নবশাখদের অন্তর্ভুক্ত হলো, তিলি, হিন্দু তাঁতী, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমার, গন্ধবণিক ও মোদক। ইংরেজ আমলে ভারত গভর্নমেন্ট হিন্দুদের মধ্যে সরকারীভাবে দুইটি ভাগ করেন। একটিকে বলা হত বর্ণহিন্দু (Caste Hindu) আর অরেকটিকে বলা হতে তপশীল-হিন্দু (Scheduled Caste)। রাজশাহী জেলায় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুদের মোট সংখ্যার শতকরা ৩৬ দশমিক ৩ ভাগ ছিল তপশীল-হিন্দু।

মুসলমানদের সব হিন্দুরাই ভাবতেন অচ্ছুৎ বা অশুচি। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (M.N. Roy) ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বহুল পঠিত The Historical Role Of Islam বইতে এক জায়গায় বলেছেন ঃ

"ভারতবর্ষের বেশিরভাগ লোক গোঁড়া হিন্দু - মুসলমান মাত্রই তাদের কাছে ম্লেচ্ছ, অশুচি, বর্বর। নিজেদের সমাজের নিম্নতম বর্ণের মানুষের প্রতি যে ধরনের আচরণে এরা অভ্যস্ত, তার চেয়ে ভাল ব্যবহার এদের বিচারে কোনও মুসলমানেরই প্রাপ্য নয়। মুসলমান যতই সদ্বংশজাত হোক, সুশিক্ষিত হোক, সংস্কৃতিবান হোক গোঁড়া হিন্দুর বিচারে কোনও ব্যতিক্রম নেই। গোঁড়ামির ফলে দেশে আজ এক সঙ্গীন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে।" *(ইংরেজী থেকে বাংলা)*

যতগুলি কারণে বাংলাভাষী মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল, তার মধ্যে উপরে বর্ণিত অবস্থাই ছিল বিশেষভাবে দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন নিগ্রোদের ঘৃণা করা হয়, দক্ষিণ এশিয়াতে হিন্দুরা মুসলমানদের প্রায় অনুরূপভাবে ঘৃণা করতেন। যা মনে করিয়ে দেয় কতকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিম-ক্রো আইনের (Jim Crow Laws) কথা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "অপ্রিয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নহে—কারণ, তাহা হইলে ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে যে কেবল সৈয়দ আহম্মেদ ও জিন্নার অবদান আছে তাহা নহে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে হিন্দুদিগের চিরন্তন মনোভাবও ইহার জন্যে কতক পরিমাণে দায়ী।....." (বাংলাদেশের ইতিহাস। তৃতীয় খন্ড)

ইংরেজ আমলের রাজশাহী জেলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৬ জন ছিলেন মুসলমান। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার যথাক্রমে শতকরা ৫৪ এবং ৫৫ জন ছিলেন মুসলমান। হিন্দু এবং মুসলমানরা একই ভাষায় কথা বলছেন, কিন্তু তবু তাঁদের মধ্যে থেকেছে একটা বড় রকমের মানসিক ব্যবধান। তাঁরা এক হতে পারেননি। এই উপমহাদেশের সর্বত্রই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরাজ করেছে, যাকে বলে একটা "সামাজিক দূরত্ব"। যার পথ ধরে সারা উপমহাদেশে সৃষ্টি হতে পারে "দ্বিজাতি তত্ত্ব" জিন্না সাহেব নন,

www.pathagar.com

পাঞ্জাবের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা লালা লাজপৎ রায় প্রথম ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অবসানের জন্য তখনকার বৃটিশ ভারতের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব সীমান্তে দুটি পৃথক মুসলিম প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবকে ধরা চলে পাকিস্তান প্রস্তাবের আদিম রূপ। রাজশাহীবাসী মুসলামানগণ সাধারণভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে ছিলেন। কারণ, তাঁরা ভেবেছিলেন, মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং আত্মন্নোতির জন্য একটা পৃথক আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা আছে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী শহরসহ নওহাটা পর্যন্ত অংশকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করবার একটা দাবী উঠেছিল। কিন্তু সে দাবী গ্রাহ্য হয়নি। হলে রাজশাহী শহরের ইতিহাস নিশ্চয় ভিন্নরূপ হতো। ইংরেজ আমলে মানবধারা (Race) এবং ভাষার বাস্তবতার চাইতে ধর্ম সম্প্রদায়ের চেতনাই এক পর্যায়ে রাজনীতিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একটা কথা চলতি আছে, As a man thinketh, so is he– কোন মানুষ যে ভাবে চিন্তা করে, সে রকম হলো সে। এজন্য নৃতত্ত্বে কেবল মানুষের দৈহিক ও ভাষার পরিচয়কেই যথেষ্ট ভাবা হয় না। জরিপ করা হয় একটা অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকেও। নৃতত্ত্বের লক্ষ্য হলো মানুষ ও তার ইতিহাসের স্বরূপ (Nature) উপলব্ধি। ধর্ম সব দেশের মানুষেরই আচার-আচরণকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আমাদের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার নিয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারণা থাকতে দেখা যায়। অতীতে অনেক মুসলমান যেমন বাইরে থেকে এসেছিলেন, তেমনি এদেশেরও বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার মুসলমানের রক্তের গ্রুপ নিয়ে প্রথম বিশেষ ভাবে গবেষণা করেন জার্মান মহিলা গবেষক ম্যাক ফারলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বজবজ অঞ্চলের সামান্য সংখ্যকমুসলমানের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে দেখাতে চান যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের রক্তের গ্রুপের হার মিলছে। কিন্তু পরবর্তী কালে W.C.Boyed ও অন্যান্য গবেষকরা পূর্ববঙ্গের মুসলমানের রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে যে গবেষণা চালিয়েছেন তা থেকে দেখা যায়, এই রক্তের গ্রুপের হার মিলছে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গেই বেশী। এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ নিয়ে কোন গবেষণার ফল এখনও আমাদের জানা নেই। তবে মনে করবার কারণ আছে এখানেও অনুরূপ ফলই পাওয়া সম্ভব। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ শব্দ দুটি বেশ গোলমেলে। আসলে হিন্দু সমাজে যাদের নিম্নবর্ণের মানুষ বলে এখন ঘৃণা করা হয়, এক সময় তারাও ছিল যথেষ্ট পরাক্রমশালী। দৃষ্টান্ত হিসাবে "পোদ" দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখন মনে করা হয়, পোদরা হলো এক কালের মহাপরাক্রমশালী পৌন্ড্রদেরই বংশধর। রাজনৈতিকভাবে তাদের পরাজয় না ঘটলে তারাও হতেন উচ্চ জাতি হিসাবেই বিবেচিত। রাজনৈতিক পরাজয় অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বাংলায় যে সব মুসলমান প্রথমে এসেছেন বাইরে থেকে, তাঁরা এদেশে ইসলাম প্রচার করেছেন। এদেশে বহু মানুষ গ্রহণ করেছেন ইসলাম। বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ঘটেছে মিশ্রণ। কারণ, বহিরাগত মুসলমানদের অনেককেই বিবাহ করতে হয়েছে এদেশেরই কন্যা। বাইরে থেকে মুসলমান মেয়েরা যে খুব বেশী সংখ্যায় এসেছিলন এমন নজীর ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে যে সব মুসলমান এসে ছিলেন, তারা

www.pathagar.com

প্রধানত এসেছিলেন মধ্যএশিয়া থেকে। আমরা দেখেছি, মধ্যএশিয়ার মানুষের মাথার আকৃতি সাধারণত হয়ে থাকে গোল। বহিরাগত মুসলমানরা, অনুমান করা চলে, বাড়িয়ে ছিলেন এই অঞ্চলে গোল-মাথা মানুষেরই প্রাধান্য। মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্র শক্তি থাকলে দেশে উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্ণের ধারণা ভিন্ন রকম হতো বলেই মনে হয়। মুসলমানদের কুড়াতে হতো না হিন্দুদের ঘৃণা।

ইংরাজ আমলে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে যে আদমশুমারী হয়, তাতে দেখা যায়, তখন কার বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল বেশী আর মুসলমানের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রমশ মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে আর হিন্দুর সংখ্যা কমেছে। মুসলমানদের এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্ণিত হয়নি। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের কারণ ছিল বিধবা বিবাহের অপ্রচলন এবং অত্যধিক কন্যাপণ প্রথা, যার ফলে অনেক হিন্দু মেয়েকে অনূঢ়া থাকতে হতো। কারণ যাই হোক, বাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে ইংরাজ আমলে। যখন হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করবার কোন সুযোগই ছিল না। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। রাজশাহী অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনাতেও যা বিবেচ্য। দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহকে নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছিল সাবেক পাকিস্তান। সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আর রাজশাহী তার অংশ।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
প্রাচীন যুগের ইতিহাস পরিক্রমায় রাজশাহী

প্রাচীন কালে এদেশে "পুন্ড্র" নামে একটি জাতি বাস করতো। পৌরাণিক মতে এক রাজার পাঁচ পুত্র ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুস ও পুন্ড্র। এদের নাম অনুসারে পাঁচটি দেশের নাম হয়ঃ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুস ও পুন্ড্র। বগুড়ার মহাস্থানগড় নামক জায়গায় সম্রাট অশোকের সময়কার একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিটি চুনা পাথরের উপর খোদিত। এর ভাষা হলো অশোক প্রাকৃত এবং অক্ষর হলো ব্রাহ্মি। এতে পুন্ড্র নগরের শাসন কর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সরকারী শস্য ভান্ডার থেকে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের শস্য প্রদান করা হোক। তাই অনুমান করা হয়, পুন্ড্র নগর ছিল মহাস্থানগড় অঞ্চলেই অবস্থিত। আর সেই সঙ্গে মনে করা হয় যে, সম্রাট অশোকের সময় থেকেই, অর্থাৎ আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে এই অঞ্চলে আর্য-ভাষা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই শিলালিপিটি পাওয়া গিয়েছিল মাটির উপরে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, সেই স্থানেরই কিনা। ভিন্ন জায়গা থেকেও কার দ্বারা ঐ শিলালিপিটি ঐ স্থানে নীত হয়ে থাকতে পারে। এখন যা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, সম্রাট অশোকের সময় সেখানে জৈন ধর্মের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। দিব্যাবদান নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, পুন্ড্রবর্ধন নগরীতে একটি চিত্রে বুদ্ধ জৈন তীর্থাঙ্কর মহাবীরের চরণে প্রণাম করছেন, এই রকম অঙ্কিত হয়েছিল। একথা জানতে পেরে সম্রাট অশোক এক দিনের মধ্যে ষোল হাজার জৈন ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করবার হুকুম দেন। ধর্ম নিয়ে বিবাদ কেবল আমাদের কালের ঘটনা নয়। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম খুব নিকট সম্বন্ধীয়। উভয়েই অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু তবু এ দুটি ধর্মের মধ্যে ঘটেছে রক্তক্ষরা সংঘাত। কলহ, হিংসা। হানাহানি। নওগাঁর মান্দাতে এবং রাজশাহীর বাগমারা থানার বাইগাছা গ্রামে সম্রাট অশোকের সময়কার ছাপকাটা (Punch marked coin) মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তবে এসব মুদ্রা নিয়ে এখনও যথেষ্ট গবেষণা হয়নি।

উত্তরবঙ্গে সম্রাট অশোকের সময় জৈনধর্ম প্রচলিত ছিল। পরে এখানে বাড়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনেক ধ্যান-ধারণাই বৈদিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে মেলেনা। এসব ধারণার উৎস বেদ নয়। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সংগেও এই দুই ধর্মের পার্থক্য অনেক।

রাজশাহী শহরের হড়গ্রাম নামক এলাকা থেকে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে বিরাট বোধিসত্ত্বের মূর্তি। যা থেকে অনুমান করা চলে, এই অঞ্চলে এক সময় প্রচলিত ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম। মহাযান ধর্ম মতে, পরম বুদ্ধ থাকেন বৈকুণ্ঠে। তাঁর ধর্মকায়া হিসাবে মর্তে আসেন বোধিসত্ত্বগণ। এরা পরম বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। যাতে সাধারণ মানুষের পাপের বোঝা এবং দুঃখ যন্ত্রনা লাঘব হতে পারে। আদি বৌদ্ধ ধর্মে পূজা-অর্চনা ছিল না। কিন্তু মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে আছে। বৌদ্ধ ধর্মে এই বিরাট পরিবর্তন আসে কুষাণদের সময় থেকে। কুষাণ যুগের কিছু মুদ্রা উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে।

www.pathagar.com

বগুড়ার মহাস্থানগড়ে একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, যার এক পিঠে রয়েছে বিখ্যাত কুষাণ রাজ কনিষ্কের প্রতিমূর্তি । কুষাণরা এসে ছিলেন মধ্যএশিয়া থেকে। তাঁরা কথা বলতেন প্রাচীন পারসিক ভাষায়। যাতে 'বোরিন্দ' মানে উচুঁ। উত্তরবঙ্গে উঁচু লাল মাটি অঞ্চলকে এখনও বলে বোরিন্দা।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশীয় রাজারা উত্তর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। হিন্দু-সংস্কৃতি বলতে এখন সাধারণ ভাবে যা বোঝান হয়, তার বিকাশ ঘটে এই গুপ্ত সম্রাটদের সময়। আদিম গুপ্ত রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কেউ কেউ অনুমান করেন, গুপ্ত রাজারা ছিলেন বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোক। গুপ্তরা ছিলেন হিন্দু। কিন্তু গুপ্তরা বৌদ্ধদের উপর বিরূপ ছিলেন না। এ সময় বৌদ্ধ মূর্তি কলারও ঘটেছিল বিশেষ বিকাশ। রাজশাহী জেলার তানোর থানার বিহারল নামক গ্রাম থেকে একটি খুব সুন্দর বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিটি বেলে পাথরের। গুপ্ত যুগের সারনাথের ধারায় পাথর কেটে তৈরি। কিন্তু অনেকের মতে, মূর্তিটি যদিও সারনাথ শৈলীর, কিন্তু এর মধ্যে স্থানিক বৈশিষ্ট্য আছে। তানোর অঞ্চল থেকে প্রাচীন যুগের আরো অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই অনুমান করা চলে, ঐ অংশে প্রাচীন কালে একটি খুব সভ্য সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

আগে হিন্দু-আমলে রাজারা এবং অন্য গণ্যমান্য হিন্দু বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন। এই সব দান, দান-পত্র করে দেওয়া হতো। দান-পত্র লেখা হতো তামার পাতের উপর। অক্ষরগুলি খোদাই করে লেখা হতো। আর তাতে অনেক সময় রাজার লক্ষণ বা চিহ্ন ও অঙ্কিত থাকতো। এরকমভাবে তামার পাতে লেখা দলিলকে বলা হয় তাম্রশাসন। এরকম তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সবচেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন, বাংলাদেশে যা এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে নাটোরের বড়াইগ্রাম থানায় প্রাপ্ত গুপ্ত-সম্রাট কুমারগুপ্তের সময়ের। এর সময়কাল, খ্রিষ্টাব্দের হিসাবে দাঁড়ায় ৪৩২ থেকে ৪৩৩-এর মধ্যে। তাম্রশাসনটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এর পরে মুসলমান যুগ পর্যন্ত অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। মুসলমান পূর্বযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্রশাসনগুলিই বলতে গেলে প্রধান সহায়। এইসব তাম্রশাসনে গ্রামের নাম আর জমির চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর বর্ণনায় তখনকার দিনের অনেক গ্রামের নাম পাওয়া গিয়েছে। এই সব নাম সংস্কৃত ভাষার নয়। স্থানীয় ভাষাকে কিছুটা সংস্কৃতের অনুরূপ করে নেওয়া। এসব নাম থেকে অনুমান করা চলে, এই সময় বাংলাদেশে প্রাকৃত-শ্রেণীর ভাষা ব্যবহৃত হতো। সেই ভাষার অনেক শব্দ আমরা সামান্য কিছু পরিবর্তিত রূপে এখনও বাংলা ভাষায় ব্যবহার করে থাকি।

পালরাজাদের সুদীর্ঘ চারশো বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল ছিল। যদিও এই বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে প্রকৃত বুদ্ধ-ধর্মের বিশেষ কোন মিল ছিল না। খ্রিষ্টীয় নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দী পাল রাজাদের সময়কাল হিসাবে গণ্য করা চলে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ।

www.pathagar.com

রাজশাহী অঞ্চল থেকে পাল-রাজাদের সময়কার বহু ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মূর্তিগুলি সাধারণত বড় প্রস্তর খন্ডের মধ্যস্থল কেটে তৈরি করা হতো। মূল মূর্তিটিকে খোদিত করা হতো প্রস্তর খন্ডের মধ্যস্থলে। প্রত্যেক মূর্তির থাকতো চাল-চিত্র। মূল মূর্তির পাশে ধর্মীয় ধারণা অনুসারে খোদাই করা হতো অন্য আর সব মূর্তি। চাল চিত্রের উপরেও থাকতো মূর্তি। চাল-চিত্রে করা হতো বহুবিধ নক্সা। পাল যুগের অনেক মূর্তিতে দেখা যায় একটা আড়ষ্ট ভাব। আবার অনেক মূর্তিতে থাকতে দেখা যায় কান্ত কমনীয় রূপ। অনেক মূর্তিতে দেখা যায় আদিরসের আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা। মূর্তিগুলিকে খুব পালিশ করা হতো। এসব মূর্তি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে কাল ব্যাসল্ট পাথর। যা বিহারের রাজমহল পাহাড়ে পাওয়া যায়।। রাজশাহী অঞ্চলে এসব মূর্তি যে তৈরি করা হতো, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কারণ, এই অঞ্চলে অনেক অসমাপ্ত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পাল যুগের মূর্তির মধ্যে মা এবং শিশুর মূর্তি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

পাল রাজাদের রাজত্ব অনেকগুলি মন্ডলে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে একটি মন্ডলের নাম ছিল "বরেন্দ্র"। সন্ধ্যাকর নন্দির রচিত "রাম চরিত" কাব্যে গঙ্গার (পদ্মার) উত্তরে এবং করতোয়া এবং মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বরেন্দ্র বলা হয়েছে। উত্তরের সীমানা সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি।

বরেন্দ্রভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে পাল বংশীয় রাজা ধর্ম পাল একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। বিহার বলতে বোঝাত, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা থাকতেন এবং ধর্মালোচনা করতেন। মনে করা হয়, নওগাঁর পাহাড়পুর নামক স্থানে যে বিরাট বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাই হলো সেই সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই বিহারের মধ্যস্থলে ছিল একটি বিরাট মন্দির। যার সঙ্গে যবদ্বীপের এবং মায়ানমারের কোন কোন মন্দিরের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। মন্দিরটি ইট-কাদার গাঁথুনিতে তৈরী। অথচ আজ তেরশো বছর পরেও এই ইটের দেওয়ালের প্রায় ২১ মিটার উঁচু পর্যন্ত (৭০ ফিট) অবশিষ্ট আছে। মন্দিরটি ছিল ত্রিতল। এর কেন্দ্র স্থলে একটি বর্গাকৃতি অংশ সোজা উপরে উঠে গিয়েছে। মন্দিরটি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দিতে নির্মিত। কিন্তু এর গাত্র সংলগ্ন কোন কোন ভাস্কর্য গুপ্ত যুগের। সম্ভবত কোন প্রাচীন মন্দির থেকে এগুলি এনে এই মন্দিরের প্রাচীরে স্থাপন করা হয়েছিল। পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে অনেক মূর্তি-উৎকীর্ণ পোড়া মাটির ফলক আছে। যাতে চিত্রিত হয়েছে সে সময়ের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তুঃ হাট ফেরৎ পিতা-পুত্র; শিশু কোলে কূয়ো থেকে পানি তুলছে মা; লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যাচ্ছে কৃষক; কলসি কাঙ্খে ঘরে ফিরছে গ্রাম্য বধু; উখলিতে সম্ভবত ধান কুটছে স্ত্রীলোক; দম্পতি, দুহাতে ঢাকের মত বাদ্য বাজাচ্ছে বাদ্যকর। পাহাড়পুর মন্দির গাত্রে ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে থাকতে দেখা যায় বহু বিশুদ্ধ লৌকিক বিষয়। যা সে সময়কার প্রাত্যহিক জীবন ধারা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে সাহায্য করে। এ সময় বৌদ্ধরা সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার প্রতি অবজ্ঞা দেখাননি। বরং দেখিয়েছেন বিশেষ আগ্রহ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পোড়ামাটির শিল্প-কলা বহু প্রাচীন। এর বিশেষ নিদর্শন আমরা পাই পাহাড়পুরের মন্দিরের দেওয়ালে।

পাহাড়পুরে আব্বাসী খলিফা হারুন-অর-রশিদ-এর একটি রৌপ্যা মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রাটি ১৭১ হিজরীর (৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)। বাংলাদেশে আর একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ছিল কুমিল্লার ময়নামতিতে। যার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানেও আব্বাসী বংশের খলিফার রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় আরব মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে পাল আমলের বাংলাদেশের কিছু কিছু বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে যখন বাংলাদেশে চলেছে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, তখন সিন্ধু উপত্যকায় এসে গিয়েছে ইসলাম। হতে পারে আরব, মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলেও ইসলাম প্রচার তখন আরম্ভ হয়েছিল।

রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানার মন্ডয়েল বা মাড়ইল নামক গ্রামে ধ্বংসপ্রাপ্ত চারটি মৃত্তিকা স্তুপ আছে। এই চারটি স্তুপের মধ্যে একটি হলো ১২ মিটার (৪০ ফুট) উঁচু। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এখান থেকে জৈন তীর্থাঙ্কর শান্তি নাথের প্রস্তর মূর্তি পেয়েছেন। মনে হয় এই স্থানের অধিবাসীরা বহু পূর্বে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়।

এক সময় বরেন্দ্র অঞ্চলে জৈন ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অথবা তার পূর্বে ঐ স্থানে একটি জৈন বিহার ছিল।

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার পশ্চিমে বিজয়নগর নামে একটি গ্রাম আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই জায়গায় সেন বংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের পিতা, বিজয় সেনের রাজধানী ছিল। এর উত্তর দিকে অবস্থিত দেবপাড়া নামক পল্লী থেকে এক খানি শিলা লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে জানা যায়, কর্নাটক দেশের সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন পাল বংশীয় রাজাদের কাছ থেকে গৌড় রাজ্য জয় করে ছিলেন। এই শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় উমাপতি ধর কর্তৃক রচিত এবং শিল্পী চনক শূলো পানি কর্তৃক উৎকীর্ণ। এই শিলালিপির অক্ষরকে মনে করা হয় আদি বাংলা অক্ষর (Proto-Bengali script) । এর অক্ষরগুলির মধ্যে ২২ টি পুরোপুরি প্রায় বাংলা অক্ষরের মত। এই প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত বিজয় সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পদুমেশ্বর দেবের মন্দির তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ দিঘি পদুমেশ্বর এর ধারে অবস্থিত ছিল বলে ধরা যায়। পদুমেশ্বর দিঘিধার থেকে দুইটি পাথরের কারুকার্য খোচিত চৌকাঠ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নিকটে পালপুর নামক স্থানে সুদীর্ঘ দুর্গ পরিখার চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তাই মনে করা হয় বর্তমান রাজশাহী জেলার এই অংশে ছিল সেন রাজদের প্রথম রাজধানী।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাঁরা

www.pathagar.com

নিজেদের দাবী করতেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হিসাবে। অর্থাৎ তাঁরা এমন ব্রাহ্মণ, যারা ক্ষত্রিয়দের মত যুদ্ধ করতে সক্ষম। সেন রাজাদের সময় হিন্দু বর্ণশ্রম ব্যবস্থা (Caste system) বাংলাদেশে খুব তীব্র আকার ধারণ করে। হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেন। ফলে বৌদ্ধরা সেন রাজাদের উপর হয়ে ওঠেন বিরূপ। "ধর্মপূজা বিধান" বলে একটি বই পাওয়া গিয়েছে। এতে 'নিরঞ্জনের রুস্মা' বলে একটি কবিতা আছে। তাতে বলা হয়েছে, বৈকুণ্ঠে ধর্ম ঠাকুর (বুদ্ধ) ভক্তদের প্রার্থনা শুনে মুসলমানদের পাঠান হিন্দুদের অত্যাচার রোধ করবার জন্য ঃ

"বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম
মনেতে পাইয়া মর্ম
মায়ারূপে হইল খনকার।
ধর্ম হইলা যবনরূপী
শিরে নিল কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান ॥
যতেক দেবতাগণ
সবে হয়ে একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।

সেন রাজা লক্ষণ সেন ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান কুতুব-উদ-দীন আইবেক এর সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খালজীর হাতে পরাজিত হন। আরম্ভ হয় বাংলার ইতিহাসে, যাকে বলে, পাঠানদের রাজত্ব। বিন বখতিয়ার এসে ছিলেন আফগানিস্তানের গর্মসীর থেকে। কিন্তু তিনি পাঠান (পশ্তুভাষী) ছিলেন না। ছিলেন তুর্কী। অনেক সময় ইতিহাস বইতে লেখা হয় বখতিয়ার খালজি বাংলা জয় করেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বাংলার উত্তরাঞ্চল জয় করেছিলেন বিন বখতিয়ার। আরবীতে "বিন" অর্থ পুত্র। বিন বখতিয়ার মানে হলো বখতিয়ারের পুত্র। সেন রাজা লক্ষণ সেন খুব অল্প সংখ্যক তুর্কী সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কেন তিনি এভাবে হেরে গিয়েছিলেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেকের মতে এই হেরে যাবার একটা বড় কারণ হলো বাহু বলের চাইতে মন্ত্রবলের উপর অধিক বিশ্বাস। মধ্যযুগের "বাংলা ও বাঙালী" নামক ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান গবেষণামূলক পুস্তিকায় সুকুমার সেন লিখেছেন, সে সময় ধারণা করা হতো, শ্মশানের ছাই আর কয়েকটি বিশেষ গাছের ছাল ও শিকড় বেটে তুর্যের গায়ে লাগিয়ে নিচের মন্ত্রটি পড়ে তা বাজালে শত্রু সৈন্য অবশ্যই পরাজিত হবেঃ

ওং অং হং হলিয়া হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিনেহি
মশাণেহি খাহি লুঞ্চহি কিলি কিলি কালি হুং ফট স্বাহা।

কিন্তু এরকম মন্ত্র পড়ে কোন রণ নিপুণ বহিঃশক্তিকে বাধা দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেন রাজ্যের পতন ঘটে ছিল। বিন বখতিয়ার উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। বিন বখতিয়ার উত্তরবঙ্গে গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। রাজশাহী অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

www.pathagar.com

মধ্যএশিয়া হতে অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ এসেছে এই উপ-মহাদেশে। গড়েছে সাম্রাজ্য। কুষণরা এসেছিলেন মধ্যএশিয়া থেকে। গড়েছিলেন বিশাল এক সাম্রাজ্য। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে থানেশ্বর-এর যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের পরাজয় হবার পর মুহাম্মদ ঘোরী এসে দখল করেন দিল্লী। এর মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে তুর্কী মুসলমানগণ এসে পৌছান বঙ্গোপসাগরের কূলে। তুর্কী-মুসলিম প্রভাবে রাজধানী গৌড়কে নির্ভর করে আত্ম প্রকাশ করে একটি বৈশিষ্ট্যময় সংস্কৃতি।

মুঘলরাও এসে ছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে। তারাও মূলত ছিলেন তুর্কী। কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশ্রন ঘটে ছিল যথেষ্ট মঙ্গোল রক্তের। মুঘলরা বিশেষভাবে পছন্দ করতেন সাফাভী ইরানের সংস্কৃতিকে। তাদের সময় ফারসী ভাষা সাহিত্য বাংলা ভাষা সাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। এসব প্রসঙ্গে আমরা এর পরের অধ্যায়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগের মুসলিম সংস্কৃতি ও রাজশাহী

বাংলাদেশের একটা বড় অংশ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আসে তুর্কী-মুসলিম শাসনাধীনে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দকে ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন (ইবন) বখতিয়ার খালজির বঙ্গ বিজয়ের সময় হিসাবে উল্লেখ করেন। বিন বখতিয়ার গোটা বাংলাদেশ অধিকার করেননি। অধিকার করেছিলেন প্রধানত উত্তরবঙ্গ। প্রচলিত মত অনুসারে সেন রাজাদের একাধিক রাজধানী ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল নদীয়া, আরেকটি ছিল লখনৌতি। লখনৌতি পরে গৌড় নামে অভিহিত হয়। বিন বখতিয়ার প্রথমে নদীয়া জয় করেন। পরে জয় করেন লখনৌতি। কিন্তু এখন অনেকে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। চাঁপাই নাবাবগঞ্জের রোহনপুর নামক রেল স্টেশনের কাছে নওদা বলে একটা জায়গা আছে। জায়গাটা দেখলে মনে হয় এককালে এখানে একটা শহর ছিল। জায়গাটা বেশ উঁচু। এখানে প্রচুর পাতলা ইট ছড়িয়ে ছিটায়ে থাকতে দেখা যায়। জায়গাটা খনন করলে পুরান একটা শহরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। অনেকে এখন মনে করেন, বিন বখতিয়ার আসলে নদীয়া দখল করেননি। করেছিলেন নওদা দখল। যা লাখনৌতি থেকে খুব দূরে অবস্থিত নয়। রোহনপুরের কাছ দিয়ে বয়ে গিয়েছে পুনর্ভবা নদী। যা পরে মিলিত হয়েছে মহানন্দা নদীর সঙ্গে।

বিন বখতিয়ার অধিকৃৎ অঞ্চলে তাঁর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ইখতাদার বা শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি মেচ জাতির একজন সর্দারকে ইসলামে দিক্ষিত করেন। এই সর্দারের মুসলিম নাম হয় আলী। আলী মেচ পরে গৌড় এর অধিপতি হন। সে সময় লখনৌতি বা গৌড় ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেচ, কোচ এবং থারু নামে তিনটি জাতি বাস করতো। এরা সকলেই ছিল মঙ্গোলীয় মানবধারাভুক্ত। এদের মধ্যথেকেই লোকে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে তাই অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গোলীয় ধারার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিন বখতিয়ার সর্ম্পকে আমরা অনেক কথা জানতে পারি মিনহাজ-ই-সিরাজ লিখিত, তাব্বাকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটি ফারসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন H.G.Raverty, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে।* অনেকে তুর্কী মুসলমানদের পাঠান হিসাবে উল্লেখ করেন। কারণ, এরা এসেছিলেন আফগাস্তিানের পাঠান অঞ্চল হয়ে। পাঠান বলতে বোঝায় পস্তুভাষী বিশেষ জাতিকে। বিন বখতিয়ার তুর্কী ছিলেন, পাঠান ছিলেন না। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের মানুষ তুর্কী ভাষায় কথা বলে। পস্তু ভাষায়

---

* তাবাকাৎ-ই-নাসিরির যে সব হাতে লেখা কপি পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে চারটিতে নামটি লেখা হয়েছে, ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজি। আরবে এবং মধ্যএশিয়ায় পিতার নামের সঙ্গে"বিন" অথবা "ইবন" যোগ করে পুত্রের নাম রাখা হলো খুব সাধারণ রীতি। যেমন, ওসামা বিন লাদেন। তাই নামটা আসলেই হবে ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজি। H.G. Raverty-র অনুবাদে "বখতিয়ার," এর আগে "বিন" আছে।

www.pathagar.com

নয়।

তুর্কী মুসলমানগণ এদেশে বয়ে আনেন একটা ভিন্ন সভ্যতার ধারা। সে সময় মধ্য এশিয়ার বুখারা এবং সমরকন্দ ছিল দুটি বিখ্যাত শহর। এই দুটি শহরকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল এক বৈশিষ্ট্যময় মুসলিম সংস্কৃতি। এই মুসলিম সংস্কৃতির নানা উপাদান ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কী বিজয়ের পর থেকে বাংলায় এসে পৌঁছাতে থাকে। আমাদের দেশে আমরা মুসলিম সংস্কৃতি বলতে বুঝি, মধ্যএশিয়া এবং ইরান থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর আগত সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ। আমাদের প্রেক্ষিতে এর ধর্মীয় অভিধা ছাড়াও একটা বর্ধিত অর্থ আছে। মুসলিম বলতে আমরা বুঝি আমাদের সংস্কৃতিতে আসা ফারসী-তুর্কী উপাদান। বাংলাদেশে ইসলামের বাণী যারা ব্যাপকভাবে বহন করে এনেছিলেন, তাঁরা প্রধানত ছিলেন সে সময়ের মধ্যএশিয়া ও ইরানের সংস্কৃতির উপাদনবাহক। খোদা, নামাজ, বেহেস্ত, দোজখ, সবই ফারসী শব্দ।

মধ্যএশিয়া থেকে তুর্কী মুসলমানরা প্রথম এই উপমহাদেশে নিয়ে আসেন প্রকৃত খিলান (true arch), গম্বুজ (dome) এবং মিনার তৈরির কৌশল। যা এদেশের স্থাপত্যকে প্রদান করে একটা ভিন্নরূপ। তাঁরা এদেশে বয়ে আনেন বহু নতুন কারুশিল্পের ধারা। আগে এদেশে কাগজ বানাবার কৌশল ছিল অজ্ঞাত। তুর্কী মুসলমানরাই প্রথম মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে নিয়ে আসেন কাগজ তৈরী করবার কৌশল। আগে এদেশে বইলেখা হতো তাল পাতায়। অথবা এক রকম গাছের (Betula edulis) ছালের উপর। যাকে বলা হতো ভূর্জপত্র। এই গাছ হয় হিমালয় অঞ্চলে। তবে ভূর্জপত্রের চাইতে তাল পাতার পুথিই ছিল বাংলাদেশে অধিক প্রচলিত। ধাতুর শলাকা দিয়ে সূক্ষ্ম রেখাঙ্কনের সাহায্যে তাল পাতায় লেখা হতো। কিন্তু মুসলমান আমলে আরম্ভ হয় কালি-কলমে লেখা। চল হয় সুন্দর করে চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা গ্রন্থের। বাংলা ভাষায় 'বই' শব্দটা এসেছে আরবী "বহী" শব্দ থেকে। বহী শব্দের আদি অর্থ হলো যাতে আল্লাহ্‌র "অহী" বা প্রত্যাদেশ লিখিত থাকে। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা বংলা গান রচনা করেছেন। যাকে বলা হয়, "চর্যাপদ"। এই চর্যাপদের বাংলা পড়ে এখন আর আমরা বুঝতে পারিনা। সুলতানী আমলে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘটে বাংলা ভাষা সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ। যে সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "হিস্টি অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। যে ভাষাকে নিয়ে আমরা এখন এত গর্ব করি, তার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে স্বাধীন সুলতানী আমলে। স্যার যদুনাথ সরকার তার "ইন্ডিয়া থ্রু এজেস" নামক বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন, "পুরাকালে যখন হিন্দুলেখকগণ তাঁদের লেখা সাধারণত লুকিয়ে রাখা পছন্দ করতেন, তখন পুস্তকের নকল ও প্রচার করে জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা করবার উদ্যোগের জন্যে আমরা মুসলমানদের কাছে ঋনী।" যদুনাথ অবশ্য সুলতানী আমলের চাইতে মুঘল আমলের সংস্কৃতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কিন্তু বাংলার ইতিহাস ব্যাখায় সুলতানী আমলের গুরুত্ব অধিক। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বাংলায় স্থাপিত হয় একটা পৃথক সালতানাত। সালতানাত-ই-বঙ্গালহ। এই সময় গড়ে উঠতে থাকে বাংলা ভাষা। এই সালতানাতের আমলে বাংলায় গড়ে ওঠে একটা বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্য রীতি। যাকে বলা চলে

www.pathagar.com

বাংলার মুসলিম স্থাপত্য রীতি। মধ্য যুগের বাংলার স্থাপত্যর উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় মুসলমান সুলতানদের নির্মিত মসজিদ ও সমাধিভবনে। যার নিদর্শন এখনও বেশ কিছু টিকে আছে। এই শিল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ এগুলি প্রধানতঃ ইটদিয়ে তৈরি। কোন কোন ক্ষেত্রে পাথরের স্তম্ভ ও প্রাচীরের বহিরাবরণের জন্যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ, বাংলাদেশে পাথর সহজলভ্য ছিল না। পাথর আনতে হতো রাজমহল থেকে। অবশ্য গৌড় থেকে রাজমহল পাহাড় খুব দূরে অবস্থিত নয়। নদী পথে কাঠের ভেলায় পাথর বয়ে আনা যেত এবং হতো।

বাংলাদেশে মানুষ সাধারণত বাঁশের খুঁটি ও খড়ের চাল দেওয়া ঘরে বাস করে। দোচালা এবং চার চালা, সাধারণত এই দুই শ্রেণীর ঘর এদেশে দেখতে পাওয়া যায়। ইট দিয়ে তৈরি ঘরেও পড়ছে এই বাঁশের ঘরের প্রভাব। সুলতানী আমলে মসজিদগুলি বানান হয়েছে প্রধানত চারচালা ঘরের মতো করে। ঘরের ছাদ করা হয়েছে খড়ের চারচালা ঘরের মত কিছুটা বাঁকা ভাবে। বাঁশের ঘরের চার কোণে চারটি বাঁশের খুঁটি দিয়ে যেমন মজবুত করা হয়, ইট দিয়ে তৈরি ঘরের ক্ষেত্রেও তেমনি চারকোণে চারটি ইটের স্তম্ভ অট্টালকের (Tower) মত নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদের উপর গোল গম্বুজের পাশে বাংলাদেশের খড়ের চারচালা ঘরের অনুকরণে গোল গম্বুজের পরিবর্তে চৌচালা গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মসজিদগুলি করা হয়েছে ঘরের মতো করে। কারণ, বৃষ্টির জন্যে বাইরে মসজিদের আঙ্গিনায় নামাজ পড়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে সে সময়ে নির্মিত অধিকাংশ মসজিদে মিনার করা হতো না, কারণ মিনারে বাজ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থ্যৎ এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থার একটা প্রভাব পড়েছে এই মুসলিম স্থাপত্যে। চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানায় অবস্থিত ছোট সোনা মসজিদ সুলতানী আমলের স্থাপত্যের একটি আদর্শ নিদর্শন। এই মসজিদ ইট দিয়ে তৈরী। কিন্তু বাইরের দেয়াল পুরোপুরি এবং ভিতরের দেয়াল আংশিকভাবে প্রস্তর মন্ডিত। এই মসজিদে পাথরের উপর বৈশিষ্ট্যময় নকসা খোদিত আছে। ছোট সোনা মসজিদের গম্বুজের মধ্যে ১২টি হলো অর্ধ-গোলক আকৃতির। আর তিনটি হলো চৌচালা ঘরের আকৃতির। সুলতানী আমলের সব মসজিদে মেয়েদের নামাজ পড়বার জন্য একটা পৃথক জায়গা থাকতো। যা কিছুটা উঁচু বেদিতে স্থাপিত। ছোট সোনা মসজিদেও এই ব্যবস্থা থাকতে দেখা যায়। ছোট সোনা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সুলতান হুসেন শাহের সময়(১৪৯৩-১৫১৮)। মসজিদটির নাম ছোট সোনা মসজিদ। কারণ এর গম্বুজগুলি একসময় সোনা দিয়ে গিলটি করা ছিল। রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৪০কিলোমিটার (২৫মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে বাঘা নামক স্থানে সুলতান নুসারাত শাহ কর্তৃক নির্মিত গৌড়ীয় শৈলীর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। মসজিদটি পুরোপুরি ইট দিয়ে তৈরী। কেবল ভিতরের কয়েকটি থাম পাথরের। এই মসজিদের নির্মাণ করা হয়েছে মাটি তুলে উঁচু জায়গার উপর। মসজিদের সামনে রয়েছে একটা বিরাট দিঘি। মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ৯৩০হিজরীতে (১৫৩৩ খ্রিঃ)। নুসারত শাহ এই সময় বাঘা পরিদর্শন করেন। নুসারাত শাহ গৌড়ে রাজত্ব করেন ৯২৫ থেকে ৯৩৯ হিজরী পর্যন্ত(১৫১৮-১৫৩২ খ্রিঃ)। বাঘা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সে সময় প্রসিদ্ধ ছিল। বাঘা মসজিদের পোড়া মাটির নকসা করা ইট উন্নত মানের। পোড়া

www.pathagar.com

মাটির ইটের নক্সা সুলতানী আমলে নির্মিত বহু মসজিদেই দেখা যায়। নক্সাকলা খুবই পরিমার্জিত।

নওগাঁ জেলার মান্দা থানার (রাজশাহীর মোহনপুর থানার গা ঘেঁষে) কুসুম্বা নামক স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে। এটিও গৌড়ীয় শৈলীর। ৯৬৬ হিজরীতে (১৫৫৮খ্রিঃ) সবর খান নামক একজন জমিদার মসজিদটি নির্মাণ করেন। সবর খান প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐ স্থানে সম্ভবত আগে আরএকটি মসজিদ ছিল। যেটি নির্মাণ করেন সুলতান হুসেন শাহ্ ৯১০ হিজরীতে (১৫০৩খ্রিঃ)। কারণ মসজিদের ভিতরে একটি শিলালিপিতে ঐ রকম একটি মসজিদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। শিলালিপিটি সম্ভবত আগের মসজিদের। কুসুম্বা মসজিদও ইট দিয়ে তৈরী, তবে দেয়ালের ভিতরে ও বাইরে পাথর দিয়ে মোড়া। এই মসজিদটিও একটা বিরাট দিঘির ধারে নির্মিত। মান্দা থানায় নাকি জন্ম হয়েছিল রাজু, ওরফে কালাপাহাড়-এর। রাজু ছিলেন ভাদুড়ি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। যে কারণেই হোক তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কুসুম্বা মসজিদে এখনও গ্রামের মেয়েরা কালার নাম করে দুধ ঢেলে মানত করে থাকে। রাজু গৌড়ের আফগান সুলতান, দাউদ করনীর সেনাপতি ছিলেন। রাজুর মুসলিম নাম ছিল মুহাম্মদ ফর্মুলি। তিনি বিহারে আকবরের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ হয়, তাতে যোগদান করেন এবং যুদ্ধে নিহত হন (১৫৮৩ খ্রিঃ)। রাজুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। তিনি বহু বহু হিন্দুকে হত্যা করেন এবং বহু হিন্দুদের মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন।

অনেকে বলেন, এদেশে কেবল নিম্নবর্ণের মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস এদের বক্তব্যকে সেভাবে সমর্থন করেনা। রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেছেন ভাদুড়ী ব্রাহ্মণ রাজু। ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কুসুম্বা মসজিদ যিনি বানিয়েছিলেন, সেই জমিদার সবর খান। তিনি চেয়ে ছিলেন হিন্দুধর্ম উৎখাত করতে। মূর্তি পূজার অবসান ঘটাতে।

শিল্প রীতির দিক থেকে বাংলার মধ্য যুগের হিন্দু মন্দিরগুলিকে প্রধানঃ দুভাগে ভাগ করা চলে ঃ

(১) রেখ-দেউল এবং

(২) কুটির-দেউল।

রেখ-দেউল হল রথের আকৃতিতে গড়া। আর কুটির-দেউল হলো বাংলাদেশের বাঁশের চারচালা এবং দোচালা ঘরের কাঠামোর অনুকরণে গড়া। বাংলায় রেখা-দেউল বিশেষ নেই, উড়িষ্যায় অনেক আছে। কুটির-দেউলের স্থাপত্যের উপর মধ্যযুগের বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কুটির-দেউলের যে সব নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে, তারা সকলেই খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালের। এই শতকে এবং তার আগেই বাংলায় বাঁশের ঘরের কাঠামোর অনুকরণে বহু মসজিদ ও মুসলিম স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের প্রবেশ-পথের খিলান,পোড়ামাটির ফলকের নকসাকলা, কার্নিসের

www.pathagar.com

বাঁকান কর্ণার,শিখর (অট্টালক), হ্রস্বাকৃতি স্থূল স্তম্ভ প্রভৃতি হিন্দু মন্দিরের উপর গৌড়ীয় মসজিদ স্থাপত্যের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেসব কুটির-দেউলের নয়টি চুড়া (৮+১=৯) থাকে তাকে বলা হয় নবরত্ন মন্দির। যাদের থাকে পাঁচটি চুড়া (৪+১=৫), তাদের বলা হয় পঞ্চরত্ন মন্দির। জেমস ফার্গুসেন, দিনাজপুরের বিখ্যাত কান্তজির নবরত্ন মন্দির সম্বন্ধে লিখতে যেয়ে বলেছেন, এই মন্দিরের শিখরগুলিতে আছে ইন্দো-মুসলিম মসজিদ স্থাপত্যের প্রভাব। James Ferguson এর বিখ্যাত বই, A History of Indian and Eastern Archetecture, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এতে কান্ত নগরের মন্দিরের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কান্তজির নবরত্ন মন্দিরের চূড়াগুলি এখন আর নেই। ভেঙ্গে পড়েছে। রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার বিখ্যাত পঞ্চরত্ন শিব মন্দির ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত। পুঠিয়ার পঞ্চরত্ন শিবমন্দির এবং পঞ্চরত্ন গোবিন্দ মন্দিরের খিলানে গৌড়ী মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পুঠিয়ার বড় ও ছোট গোবিন্দ, এবং ছোট আহ্নিক মন্দিরে পোড়া মাটির ফলক (Terra-cota plaque) ব্যবহার করা হয়েছে। ফলকগুলির অলঙ্করণের বিষয়বস্তু যেমন হিন্দুদের বিভিন্ন দেব-দেবী, কিন্নর-কিন্নরী, অবতার, যোদ্ধা, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, গোপ-গোপীদের নৃত্য উৎসব প্রভৃতি, তেমনি তাতে আবার স্থান পেয়েছে মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহৃত জ্যামিতিক এবং ফুল ও পেঁচান লতাপাতার নক্সা। পুঠিয়ার মন্দিরসমূহের অভ্যন্তরভাগের উপরিস্থিত অর্ধগোলাকৃতির গম্বুজসমূহের করণকৌশল গৌড়ীয়, মুসলিম স্থাপত্যেরই অনুরূপ। এসব মন্দিরে যে ধরনের খিলান নির্মিত হয়েছে, তাও হলো গৌড়ীয় মুসলিম স্থাপত্যর।

বাংলাদেশে মসজিদ স্থাপত্যে অবনতি ঘটে মুঘল আমলে। মসজিদ থেকে বাদ পড়ে পোড়ামাটির ফলক। কিন্তু হিন্দু মন্দিরে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার প্রচলিত থাকে। মন্দিরের গড়নে বজায় থাকে বাঁশের ঘরের বৈশিষ্ট্য। তাই অনেকের কাছে মনে হয় মন্দির স্থাপত্য থেকে উদ্ভব ঘটেছিল গৌড়ীয় মুসলিম স্থাপত্যর।

বাংলার পোড়া মাটির ইটের নক্সা ও ভাস্কর্য খুব বিখ্যাত। এসব ইট বানান হতো কাঠের ছাঁচে। পরে তা পোড়ান হতো বিশেষভাবে। অনেকে বলেন, ইটে খোদাই করা নক্সা। কিন্তু নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে খোদাই কথাটা বলা উচিত নয়। বাংলাদেশে পোড়ামাটির নক্সা ও মূর্তি সংবলিত ইট প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছে বৌদ্ধ স্তূপে। মুসলমান আমলে এই ইটের নক্সা হয়ে ওঠে অনেক মার্জিত। মসজিদে যে সব নক্সা করা ইট ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কেবল থেকেছে ফুল,লতা,পাতা এবং জ্যামিতিক আকার-আকৃতি। কিন্তু হিন্দু মন্দিরের পোড়া মাটির ইটে দেব-দেবীর নতোন্নত (bas-relief) স্থান পেয়েছে। ধর্মীয় কারণেই এই পার্থক্যের উদ্ভব হতে পেরেছে। মুসলমান ধর্মে মানুষের এবং জীবজন্তুর ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া নিষিদ্ধ। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের পার্থক্যের একটি বড় কারণ হলো ধর্মবিশ্বাস। মসুলমানরা মসজিদে বহু মানুষ একত্রে নামাজ পড়েন। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মে এরকম সমবেত প্রার্থনা নেই। ব্রাহ্মণ পূজারী মন্দিরে পূজা দেন। মন্দিরের মূল কক্ষ বা গর্ভ গৃহ হয় ছোট। তাই মসজিদ ও মন্দির কাঠামোগতভাবে এক হতে পারে না। বড় রকমের অনেক পার্থক্য থেকেই গিয়েছে।

www.pathagar.com

যদিও উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যাপারে সৃষ্টি হতে পেরেছে সাদৃশ্য।

বাংলাদেশে মুঘল আমলে বড় বড় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের চল হয়। মসজিদে পোড়া মাটির নক্সা করা ইটের বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে চুন-সুড়কির পলেস্তরা। মুঘল আমলে তৈরি অনেক মন্দিরে মসজিদের মতো করে বড় গম্বুজ যুক্ত হয়েছে। গম্বুজের গোড়ায় মসজিদের অনুকরণে করা হয়েছে পদ্মের পাঁপড়ির নক্সা। বিচ্ছিন্ন পাঁপড়িদের পর পর সাজান হয়েছে। যেমন সাজান হয়েছে মসজিদের গম্বুজের গোড়ায়। মুঘল আমলের মসজিদের খিলানের তলদেশ সমান নয়। ছোট ছোট ঢেউয়ের ভঙ্গীতে পল কাটা (cusp)। হিন্দু মন্দিরের অনেক খিলানেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

মধ্য যুগে বয়ন শিল্পের খুব উন্নতি ঘটতে থাকে। তন্তুবায়দের ফারসীতে বলে জুলহা। মুসলমান আমলে মধ্য এশিয়া ও ইরান থেকে বেশ কিছু সংখক মুসলিম তন্তুবায় এসেছিলেন এই দেশে। স্থাপত্যের পরেই মুসলিম বিশ্বে বয়ন শিল্প লাভ করে ছিল বিশেষ প্রকর্ষ। আর এই প্রকর্ষের প্রভাব এসে পড়েছিল বাংলার বয়ন শিল্পে।

যাকে আমরা এখন উল্লেখ করে থাকি বৃহত্তর রাজশাহী হিসাবে, তাতে মুঘল আমলের চারটি সরকারের অংশ পড়ে। এই চারটি সরকার হলো ঃ ঘোড়াঘাট, বরবকাবাদ, পিঞ্জরো এবং বাজুহা। আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে বলেছেন, সরকার ঘোড়াঘাট রেশম ও পাটের কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত। এখানে অনেক পাহাড়ি টাট্টু ঘোড়া কিনতে পাওয়া যায়। বরবকাবাদ সরকারে "গঙ্গাজলী" নামে এক প্রকার সুন্দর বস্ত্র তৈরি হয়। সরকার বাজুহাতে আছে ঘন বনভূমি। এই অরণ্যের কাঠ মূল্যবান। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের আগে যমুনা ছিল একটা খুব ছোট নদী। আবুল ফজলের বর্ণিত সরকার বাজুহার মধ্যে ঢাকার কাছের মধুপুর গড় অঞ্চল পড়ত। অর্থাৎ বাজুহা সরকার ছিল উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের কিছুটা অংশ নিয়ে। সরকার পিঞ্জরার কোন বিবরণ আবুল ফজল দেননি।

আইন-ই-আকবরীর বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুঘল আমলের শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজশাহী অঞ্চলে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হতো। উৎপন্ন হতো রেশম। রাজশাহী অঞ্চল এক সময় রেশম উৎপাদনের জন্য খুবই বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বিদেশী ইউরোপীয় বণিকেরা এখানে প্রথম আসতে শুরু করে রেশম ব্যবসারই আকর্ষণে।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
রাজশাহীতে রেশম ও নীল

১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্তুগীজ নাবিক ভাসকো দা গামা ইউরোপ থেকে সমুদ্রপথে ভারতে আসবার পথ আবিষ্কার করেন। পর্তুগীজরা বাংলায় আসে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে। চট্টগ্রামে তারা গড়ে একটা বিরাট বন্দর। তারা আর একটি বড় ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তোলে পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে। পর্তুগীজদের পরে ইউরোপ থেকে এদেশে ব্যবসা করতে আসে ওলন্দাজরা (Dutch)। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে। এরা এদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে হুগলির চুচুড়াতে। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে পর্তুগীজরা মুঘল সৈন্যদের হাতে পরাজিত হয়। যার ফলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পর্তুগীজদের ব্যবসার ক্ষতি হবার পর ওলন্দাজদের ব্যবসা বৃদ্ধি পায়। রাজশাহীতে পর্তুগীজরা কখনও ব্যবসা করতে আসেনি। কিন্তু ওলন্দাজরা এসেছে। করেছে রেশমের ব্যবসা। বস্তুত তাদের এই রেশম ব্যবসার কারণেই হয় রাজশাহী শহরের সূত্রপাত। ওলন্দাজরা এখানে স্থাপন করে বিরাট কুঠি। যা এখনও কিছুটা টিকে আছে। যাকে বলা হয় "বড়-কুঠি"। আসলে এটা ছিল একটা ছোট খাট দুর্গ। কেবলই ব্যবসা কেন্দ্র নয়। কুঠি বলতে বোঝায় ব্যবসায়ীর কার্য্যালয় বা বাসস্থান। ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে বাণিজ্যের ফরমান লাভ করায় পরবর্তী দুই দশকে বিপুল বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়। অষ্টম শতাব্দীর অষ্টম পাদে বাংলায় ওলন্দাজ বা ডাচদের ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠে এবং এর পর পড়তে আরম্ভ করে। চুচুড়া কিছুদিন বাটাভিয়া গর্ভামেন্টের অধীনে ছিল। বাটাভিয়ার বর্তমান নাম, জাকার্তা। ইন্দোনেশিয়া এ সময় ওলন্দাজরা অধিকার করে নিয়ে ছিল। বাটাভিয়া হয় রাজধানী। বাটাভিয়া থেকে কতগুলি ওলন্দাজ রণতরী চুচুড়াতে আসে। ইংরাজরা তাদের বাধা প্রদান করে। ওলন্দাজ রণতরীসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। চুচুড়ার পতন ঘটে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরাজরা বাংলায় কার্যকর ক্ষমতা দখল করে। ওলন্দাজরা চায় মিরজাফর-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইংরাজদের ক্ষমতা খর্ব করতে। কিন্তু তাদের সে অভিলাষ সফল হতে পারেনা। ইংরাজদের হাতে পরাজয় ঘটে তাদের। কিন্তু এভাবে পরাজিত হবার পরেও রাজশাহী অঞ্চলে তারা কিছু দিন রেশম ব্যবসা করে। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে ওলন্দাজরা সুমাত্রার পরিবর্তে ইংরাজদের চুচুড়া ছেড়ে দেয়। রাজশাহীতে ওলন্দাজদের বড়-কুঠি ক্রয় করে ইংরাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি বাস করতে আরম্ভ করেন বড়-কুঠিতে। কোম্পানীর আর একজন প্রতিনিধি থাকতেন সরদহতে। যাঁর তত্ত্বাবধানে সেখান থেকে রেশম ক্রয় করা হতো। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী অঞ্চল থেকে তাদের ব্যবসা উঠিয়ে নেয়। এর পর রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী রাজশাহী ও সরদহের কুঠিবাড়ি কিনে নেয়। আরম্ভ করে রেশম ও নীলের ব্যবসা। রেশম ও নীল ব্যবসাকে নির্ভর করে রাজশাহী হয়ে ওঠে একটা সমৃদ্ধ নদী বন্দরে। এখান থেকে প্রচুর রেশম ও নীল বিদেশে চালান যেতে থাকে।

রেশম চাষের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। রেশম শব্দটি ফারসী। রেশমকে সংস্কৃততে

www.pathagar.com

বলে "পত্রোর্ণ"। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায় (৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ)। অর্থ শাস্ত্রে বলা হয়েছে মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও পুন্ড্র অঞ্চলে পত্রোর্ণ থেকে বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। সুলতানী আমলে বাংলার রেশম বস্ত্র প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দে মা-হুয়ান নামক একজন চীনা মুসলমান পর্যটক তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন যে, এই অঞ্চলে রেশম উৎপাদনের জন্যে ব্যাপকভাবে তুঁত গাছের আবাদ করা হয়। সুলতানী আমলের পর মুঘল আমলে রেশম চাষ আরো ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। রেশম দিয়ে কারুকার্য খচিত বস্ত্র প্রস্তুত হতে থাকে। জরি দিয়ে ফুল তোলা নক্সা করা এক রকম রেশমী কাপড়কে বলা হতো কিংখাব। মুর্শিদাবাদে তৈরি কিংখাব খুব বিখ্যাত ছিল।

বাংলার প্রথম মানচিত্র অঙ্কিত করান চুচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর ফন ডেন ব্রোক (Van Den Broke), ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে। এই মানচিত্রে বর্তমান রাজশাহী শহরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ দেখান হয়েছে পাবনা, বগুড়া এবং রংপুর অঞ্চলের। রাস্তাটা রংপুর হয়ে ঠেকেছে আসাম সীমান্তের কাছে। এই সড়কটি ছিল বাণিজ্যিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে নীলের চাষও অনেক দিন আগে থেকে হতো। নীল রং তৈরি হতো সীম জাতীয় এক রকম গাছের (Indigofera sumatrana) পাতা থেকে। এই গাছের পাতায় ইন্ডিক্যান (Indican) নামক এক প্রকার বর্ণহীন পদার্থ থাকে। নীল-গাছের পাতাকে কুচি-কুচি করে কেটে দশ-বারো ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে ঝাঁকালে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে ইন্ডিক্যানের বিক্রিয়া ঘটে নীল রং তৈরি হতো। বিশ্বের বাজারে এই নীল রং-এর যথেষ্ট চাহিদা ছিল। আগে আমাদের দেশে নীল তৈরি ছিল একটা কুটিরশিল্প। কিন্তু ইংরাজরা নীল তৈরিকে একটা কারখানা শিল্পে পরিণত করে। নীল কুঠির সাহেবরা, যাদেরকে সাধারণত বলা হয় নীলকর সাহেব, জোর করে কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করতো। কৃষকদের ঝি-বৌদের দিয়ে সারারাত ধরে নীল ভিজান বিরাট বিরাট কড়াইকে ঝাঁকাতে বাধ্য করতো। নীল কুঠি হয়ে উঠেছিল এক একটা অত্যাচারের ঘাঁটি। নারী ধর্ষণ ছিল এখানে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। নীল কুঠিতে অবাধ্য কৃষকদের ধরে এনে পিটান হতো "শ্যামা চাঁদ" দিয়ে। শ্যামাচাঁদ বলতে বোঝাত, বেতের উপর চামড়া দিয়ে মোড়া এক রকম লাঠি। নীল কর সাহেবদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একসময় এদেশের কৃষকরা বিরাট বিদ্রোহ করে মধ্য এবং উত্তর বাংলায়। যা ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে (১৮৫৯- ১৮৬০ খ্রিঃ)। রাজশাহী অঞ্চলে ১৫০টি নীল কুঠি ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নীল চাষ খুব লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চলে।

রাজশাহীতে সাহেবগঞ্জ বলে একটি জায়গায় ছিল রেশম ও নীল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অনেক সাহেবের বাস। এক সময় এই সাহেবগঞ্জে প্রায় পাঁচশত সাহেব বাস করতো। সাহেবগঞ্জের অধিকাংশটাই এখন পদ্মায় ভেঙ্গে গিয়েছে। সামান্য কিছুটা অংশ টিকে আছে। যা বহন করছে সেই অতীত সাহেবগঞ্জের স্মৃতি। নীল চাষ উঠে যাবার জন্যে সাহেবরা রাজশাহী ত্যাগ করতে থাকে। রাজশাহীতে রেশম ব্যবসাও আর আগের মত লাভজনক হয়ে

www.pathagar.com

ছিলনা। এর একটা কারণ হলো পেব্রিন নামক এক প্রকার রোগ। যাতে রেশম পোকার মৃত্যু হতে থাকে। তা ছাড়া এ সময় ইউরোপে রেশম চাষের বিস্তৃতি ঘটে। ইউরোপের চাহিদা মতো সস্তায় রেশম সুতা ফ্রান্সে উৎপন্ন হতে থাকে।

রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীর কাছ থেকে বড়কুঠি ও তার সংলগ্ন সম্পত্তি কিনে নেয় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী। এই জমিদারী কোম্পানীও ছিল ইংরাজদের। এই কোম্পানী শহরের মধ্যে যে বাজার বসায় তা সাহেব বাজার নামে খ্যাত হয়ে আছে। রাজশাহীতে সাহেবদের দুটি কবরস্তান ছিল। একটি ছিল এবং এখনও আছে জেলখানার কাছে। আর একটি ছিল বড়কুঠির পশ্চিমধারে। বড়কুঠির সামনে অনেকটা জায়গা ছিল, যার মধ্যে ছিল একটা বিরাট কাটবাদামের গাছ (Terminalia catappa)। গাছটা খুব ঝাঁকড়া ছিল। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর কুঠিবাড়ির কাছে যেতে ভয় পেতাম আমরা। গল্প প্রচলিত ছিল, ঐ গাছে নাকি সাহেব ভূত থাকে। পরে বড়কুঠির সঙ্গে আমার অন্য রকম পরিচয় হয়। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বড়কুঠিতে স্থাপিত হয় ভাইস-চ্যান্সেলর এর অস্থায়ী অফিস। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী নেবার পর নানা কাজে অনেকবার আমাকে যেতে হয়েছে সেখানে।

রাজশাহী শহরে সবচেয়ে পুরান ইমারত হলো বড়কুঠি। বাড়িটা এখনও টিকে আছে। এ বাড়ির অনেকবার সংস্কার করা হয়েছে। তাই আজও টিকে আছে। বড়কুঠিতে ঘরের সংখ্যা হলো ১২। বাড়িটি দোতালা। এক সময় নীচের ঘরগুলিতে আলো ঢুকবার ব্যবস্থা ছিল কম। ঘরগুলি ছিল অন্ধকারাছন্ন। ওলন্দাজদের সময় এসব ঘরে রাখা হতো গোলাবারুদ। ওয়াটসন কোম্পানীর আমলে এসব ঘরকে ব্যবহার করা হতো বন্দিশালা হিসাবে। বহু মানুষকে এনে খুন করা হয়েছে এখানে। বহু নারী এখানে হয়েছে ধর্ষিতা। ওলন্দাজদের সময় বড়কুঠির আঙ্গিনায় বসান ছিল অনেকগুলি ছোট ছোট কামান। যা পরে এখানথেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। বাড়িটার দুইপাশে আছে দোতলার ছাদে যাবার ঘোরান সিঁড়ি। সিঁড়ি ঘর দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে বাড়িটিকে। সিঁড়ি ঘরের দেওয়ালে নির্দিষ্ট দূরে দূরে আছে ফোকর। যার মধ্যে দিয়ে গুলি ছোঁড়া সম্ভব।

আজকাল বলা হচ্ছে, দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে বিদেশী পুঁজি লগ্নি হওয়া প্রয়োজন। অতীতে এদেশে বিদেশীরা ব্যবসা/বাণিজ্য করেছে। পুঁজি লগ্নি করেছে। কিন্তু তা থেকে বিদেশীরা যে হারে যে ভাবে লাভবান হয়েছে, এদেশের মানুষ তা হতে পারেনি। রাজশাহীতে একসময় সবচেয়ে লাভজনকভাবে ব্যবসা করে রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী। রাজশাহী অঞ্চলে এসময় ৮ থেকে ৯ হাজার মানুষ বসবাস করত। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। রেশম ব্যবসার দালালী করে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি কেবল কিছুটা ধনী হতে পেরেছিলেন। বিদেশী পুঁজি মানেই দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান নয়। অতীতে বিদেশী পুঁজি হাতে গোনা কয়েকজন কম্প্রাডর সৃষ্টি করেছিল মাত্র।

www.pathagar.com

রাজশাহীতে রেশম ও নীল কুঠির সাহেবরা প্রতি বছর ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতো। এতে বাজি ধরবার ব্যবস্থা ছিল। অনেক দূর দূর থেকে মানুষ আসত ঘোড়দৌড় দেখতে ও বাজি ধরতে। যে ময়দানে এই ঘোড়দৌড় হতো সেখানে এখন স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রীয় উদ্যান। আগে সেটাকে বলা হতো রেসকোর্স ময়দান।

রাজশাহীর কাজলাতে একটা খুব বড় নীলকুঠি ছিল। এই কুঠির মূল ভবনে প্রথম রাজশাহী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। নীলকর সাহেবদের আর একটি কুঠিবাড়ি পড়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। যা এখন ইউ.ও.টি.সির কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে Heumann খুব সস্তায় কয়লা থেকে নীল তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেন। এরপর নীল গাছের পাতা থেকে নীল রং তৈরী আর লাভজনক থাকে না। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজশাহীর চর অঞ্চলে যথেষ্ট নীল চাষ হবার কথা জানা আছে। এরপর বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে নীলের কারখানাসমূহ। উঠে যায় নীলের চাষ।

ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসীরা এসেছে রাজশাহীতে ব্যবসা করতে। ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ওলন্দাজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী, হল্যান্ডে। প্রথমে কেবল ওলন্দাজরা আসে রামপুর-বোয়ালিয়াতে রেশম ব্যবসা করতে। এর পরে আসে ইংরাজরা। সবশেষে ফরাসীরাও এখানে রেশম ব্যবসা করতে এসেছিল। কাজলার কাছে ছিল ফরাসী লুই পেন কোম্পানীর কুঠি। ফরাসী ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী (Compagnie des Indes Orientales) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু এই কোম্পানি ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানির সঙ্গে পেরে উঠেনি। পঞ্চদশ থেকে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের একাধিক দেশের মানুষ চেয়েছে নতুন দেশ আবিষ্কার করতে। অজানা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করতে। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য নৌপথ আবিষ্কার করতে। আমাদের মধ্যে এ ধরনের কোন অনুপ্রেরণা ছিল না। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের অনেক দেশে, বিশেষ করে ইংলান্ডে, আবিষ্কৃত হয় অনেক কলকব্জা। আরম্ভ হয় বাষ্প-শক্তির ব্যবহার। যা তাদের অর্থনীতিতে ঘটায় বিরাট পরিবর্তন। এরকম কিছু ঘটতে পারেনি আমাদের দেশে। কেবল আমাদের দেশে নয়, বিরাট চীন দেশেও কলকারখানার বিপ্লব সে সময় ঘটতে পারেনি। যদিও চীনে কয়লা এবং লোহা ছিল খুবই সহজলভ্য। কয়লা ও লোহার ব্যবহারের বিশেষ সাফল্য ইউরোপকে দান করে এশিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের শক্তি।

ইংরাজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা মুঘল বাদশাহের কাছ থেকে পেয়েছিল মুক্ত বাণিজ্যের ফরমান। কিন্তু পরে অধিকার করে বসে শাসন ক্ষমতা। বিদেশ থেকে মানুষ আগেও বহুবার এসে এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু এরা সবাই এসেছে স্থলপথে। এভাবে নৌপথে নয়। বিদেশ থেকে আগে যারা এসেছে, তারা এদেশে বসতি করেছে। ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে এদেশেরই লোক। কিন্তু ইংরাজ এদেশে বসতি গড়বার কথা চিন্তা করেনি। আগে যারা এসেছে, সরাসরি তারা সকলেই এসেছে যোদ্ধা বেশে। বণিক হিসাবে নয়। কিন্তু ব্যবসা করতে এসে শেষে রাজশক্তিতে

www.pathagar.com

পরিণত হয় ইংরাজরা। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কোম্পানী কর্তৃক এরকম সাম্রাজ্য স্থাপন ছিল এই প্রথম। পরে ওলন্দাজ কোম্পানী ক্ষমতা দখল করে ইন্দোনেশিয়াতে। ফরাসী কোম্পানী ভিয়েতনামে। ইংরাজরা ব্যবসা করতে আসলেও তারা ছিল একটা নতুন সভ্যতার ও দৃষ্টিভঙ্গীর বাহক। বিলাতে জন্মেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মত নাট্যকার (১৫৬৪-১৬১৬), ফ্রান্সিস বেকন এর মত দার্শনিক (১৫৬১-১৬২৬), আইজাক নিউটন-এর মতো বৈজ্ঞানিক ও গনিতজ্ঞ (১৬৪২-১৭২৭)। এর একটা প্রভাব ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের উপর পড়তে পেরেছিল। কিন্তু ইংরাজের ব্যবসাগত দিকটি ছিল, বিশেষ করে প্রথম দিকে, বলতে গেলে লুটেরই মতো। বাণিজ্যের নামে এই যে লুটপাট চলেছিল সে ইতিহাসও ভুলে যাবার মত নয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
সাবেক রাজশাহী জেলার জমিদারবৃন্দ

জমি আমাদের আয়ের প্রধান উৎস। ভূমি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেছে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আর এই কাঠামোর উপর নির্ভর করেছে দেশের সমাজজীবন। এমনকি ভাবনা-চিন্তার জগতও তার উপর প্রভূতভাবে নির্ভর করেছে।

সেন রাজা, বল্লাল সেনের রাজত্বকালে তখনকার বাংলাদেশ পাঁচটি "ভুক্তিতে" বিভক্ত ছিল (সেনরা গোটা বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন না। পূর্ববঙ্গে ভিন্ন রাজা ছিল)। ভূক্তিগুলি বিভক্ত ছিল "মন্ডলে" এবং প্রতিটি মন্ডল আবার বিভক্ত ছিল "বিষয়ে"। বিষয় যারা পরিচালনা করতেন, তাদের বলা হতো বিষয়ী। এরা ছিলেন কতকটা সামন্ত রাজা এবং জমিদারদের মতো। প্রজার কাছ থেকে এরা যে খাজনা আদায় করতেন, তার একটা অংশ পেতেন দেশের মূল রাজা। সুলতানী আমলে এ ধরনের ব্যবস্থা মোটামুটি বজায় থাকে। এর সঙ্গে আর একটি ব্যবস্থা যুক্ত হয়। যাকে বলা হয় জায়গীরদারী। জায়গীর থেকে জায়গীরদাররা খাজনা তুলতেন স্বাধীনভাবে। তারা এইসব জায়গীর থেকে খাজনা তুলে নিজেদের ভরণ-পোষণ করতেন এবং সেনাবাহিনীর খরচ চালাতেন। জায়গীরদার যে খাজনা তুলতেন, তা সুলতানী রাজ-কোষে যেতনা। তাহেরপুর রাজশাহীর একটি সমৃদ্ধ জনপদ। তাহেরপুরের নাম এসেছে তাহের উল্লাহ নামক জনৈক জায়গীর দারের নাম অনুসারে। তাহের উল্লাহ ছিলেন একজন বড় জায়গীরদার। তাঁর ছিল একটা বড় সেনাবাহিনী। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক জায়গীরদারকে সুলতানের হয়ে যুদ্ধ করতে হতো। জায়গীর আসলে ভোগ করতেন সেনাপতিরা। রাজশাহীর আর একজন বড় জায়গীরদার ছিলেন লস্কর খাঁ। তাঁর নাম অনুসারে হয়েছে লস্করপুরের নাম।

মুঘল আমলে মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। প্রথম হলো, খালিসা শরিফা, এসব জমি হলো প্রত্যক্ষভাবে বাদশাহ্‌র অধীন। দ্বিতীয় প্রকার জমি হলো কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে। এদের বলা হত জায়গীর। আর তৃতীয় প্রকার হলো প্রাচীন সামন্ত রাজা বা জমিদারদের জমি। যারা বাদশাকে খাজনা দিতেন না। দিতেন বছরে একবার করে পেশকশ (Tribute)।

সুলতানী আমলে "বঙ্গালহ" রাজ্য অনেকগুলি রাজস্ব অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে বলা হতো "মহল"। কতকগুলি "মহল" নিয়ে গঠিত হত "শিক"। "শিকদার" নামক কর্মচারীরা এদের ভারপ্রাপ্ত হতেন। মুঘল আসলে শিকগুলিকে বলা হতে থাকে পরগনা।

মুঘল আমলে তিন শ্রেণীর জমিদার ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর জমিদার ছিলেন প্রায়

www.pathagar.com

স্বাধীন। এদের বলা হতো পেশকাশী জমিদার। এঁরা বছরে একবার সম্রাটকে পেশকশ বা নজরানা (Tribute) দিতেন। এরা বিশেষ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করতেন। আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ এলাকায় শান্তিরক্ষা, বিচার করা প্রভৃতি অনেক ক্ষমতা তাঁদের ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল মাল ওয়াজির বা মধ্যবর্তী জমিদার। এদের রাজস্ব জমি জরিপ করে ধার্য করা হতো। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল খিদমতী জমিদার। এরা রাজস্ব সংগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য কাজে সরকারের খিদমত বা সেবা সাহায্য করতো। এর বিনিময়ে নানা সুযোগ সুবিধা পেত। এদের উপাধি ছিল চৌধুরী, মুকাদ্দম, কানুনগো প্রভৃতি।

মুঘল আমলে মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। প্রথম হলো, খালিসা শরিফা, এসব জমি হলো প্রত্যক্ষভাবে বাদশাহ্‌র অধীন। দ্বিতীয় প্রকার জমি হলো কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের জন্যে। এদের বলা হতো জয়গীর। আর তৃতীয় হলো প্রাচীন সামন্ত রাজা বা জমিদারদের জমি। এঁরা সম্রাটকে দেওয়ানের মাধ্যমে পেশকশ দিতেন।

খালিসা জমির খাজনা কখনো কখনো সরকারী কর্মচারীরা আদায় করতো। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদায় করতো ইজারাদাররা।

নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবার অঙ্গীকার করে এই সব ইজারাদাররা এক একটা পরগনা ইজারা নিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কতকটা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আর কতকটা চাকরানা জমির মতো কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হতো। চাকরান বলতে বোঝাত বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত জমি।

যারা জমি ইজারা নিত, তারা যদি ঠিক মতো খাজনা আদায় করে দিত, তবে জমি তারাই বছর বছর ইজারা পেত। এভাবে ইজারাদারী অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছিল বংশগত। এই সব ইজারাদারকেই এক পর্যায়ে বলা হতে থাকে "জমিদার"। জমিদার শব্দটা ফারসী। "দার" শব্দের মানে অধিকারী। কিন্তু এইসব জমিদার আসলে জমির মালিক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ইজারাদার, কেবলমাত্র চুক্তি অনুসারে খাজনা তুলে দেবার অধিকারী।

মুর্শিদ-কুলী খাঁ সুবে বাঙ্গলায় প্রথমবার আসেন দেওয়ান বা সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে। পরেরবার (১৭১৭ খ্রিঃ) আসেন একই সঙ্গে দেওয়ান এবং সুবেদার বা নবাব হিসাবে। মুর্শিদ-কুলী-খাঁ অনেক নতুন ইজারাদার নিযুক্ত করেন। এর ফলে প্রাচীন জমিদাররা অনেকেই বিলুপ্ত হন।

ইংরাজ আমলে লর্ড কর্ন-ওয়ালীসের সময় যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় (১৭৯৩ খ্রিঃ) তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব ইজারাদারদের বংশধররাই অনেকে জমিদার হিসাবে

www.pathagar.com

স্বীকৃতি পান। রাজশাহী অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা অনেকে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমরা রাজশাহী জমিদারদের কথা আলোচনা করছি, কিশোর মিত্র লিখিত Rajas of Rajshahi নামক প্রবন্ধে দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়ে ছিল ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, Calcutta Review পত্রিকার CXI সংখ্যায়। রাজশাহীর জমিদারদের সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে এই প্রবন্ধটিকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয়।

রাজশাহীর একটি প্রাচীন জমিদার বংশ ছিল পুঠিয়ার জমিদাররা। এই বংশের পূর্বপুরুষ বৎসাচার্য ছিলেন একজন তান্ত্রিক ধর্ম সাধক। তিনি খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুঠিয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রামে ধর্ম সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতি (স্ত্রীর ভ্রাতা) মানসিংহ যখন বাংলায় আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে আসেন, তখন তিনি বৎসাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তার বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হন। তিনি পরাজিত পাঠান জায়গীরদার লস্কর খাঁ-র জায়গীর তাকে জমিদারী হিসাবে প্রদান করতে চান। রাজশাহীর একটা বিরাট অংশ ছিল পাঠান জায়গীরদার লস্কর খাঁ-র নিয়ন্ত্রণে। লস্করপুর নাম এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। বৎসাচার্য জমিদারী গ্রহণ করেত চান না। বলেন, তিনি ধর্ম সাধক। জমিদার হবার প্রয়োজন তার নেই। মানসিংহ তখন পরাজিত পাঠান জায়গীরদার লস্কর খার ভূ-সম্পত্তি বৎসাচার্যের পুত্র পিতাম্বরকে প্রদান করেন। এভাবেই উদ্ভব হয় পুঠিয়ার জমিদারী।

নাটোরের জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন রঘুনন্দন এবং রামজীবন। এরা ছিলেন দুই ভাই। রামজীবন বড় এবং রঘুনন্দন ছোট। এঁদের পিতা চাকরী করতেন পুঠিয়ার রাজবাড়িতে। এরা শুরুতে ছিলেন খুব দরিদ্র বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ। কিন্তু রঘুনন্দন ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। তিনি জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে লাভ করেন বিশেষ পারদর্শিতা। পুঠিয়ার রাজা তাকে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ-র দরবারে পুঠিয়ার উকিল নিযুক্ত করেন। রঘুনন্দন হয়ে ওঠেন মুর্শিদ কুলী খাঁ-র খুবই প্রিয় পাত্র। তিনি জাল কাগজ ও হিসাব পত্র তৈরিতে মুর্শিদ কুলী খাঁ কে সাহায্য করেন। যার ফলে মুর্শিদ কুলী বাদশাহকে প্রতারণা করতে সক্ষম হন। মুর্শিদ কুলী খাঁ এক পর্যায়ে রঘুনন্দনকে তাঁর দেওয়ান বা অর্থমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। রঘুনন্দন তাঁর বড়ভাই রাম জীবনকে নানা অসুদুপায়ে নবাব কর্তৃক বরখাস্ত অন্য জমিদারদের জমিদারী পাইয়ে দিতে আরম্ভ করেন। রাজশাহী চাকলার জমিদার উদিত নারায়ণের সঙ্গে মুর্শিদ কুলী খাঁর বিবাদ বাধে। এক পর্যায়ে উদিত নারায়ণের সঙ্গে মুর্শিদ কুলীর সৈন্যের খন্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উদিত নারায়ণ পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। উদিত নারায়ণ-এর বিরাট জমিদারী, যথা সময়ে খাজনা পরিশোধ করবার অঙ্গীকারে রামজীবন এবং আর এক জমিদারের মধ্যে নবাব ভাগ করে দেন। রামজীবন তাঁর জমিদারীর মূল কেন্দ্রনাটোরে প্রতিষ্ঠিত করেন। এসময় থেকে রামজীবন রাজশাহীর জমিদার হিসাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করেন। এভাবেই রাজশাহী নামটা নাটোরে এসে যায়। নাটোরের জমিদার হয়ে ওঠেন রাজশাহীর জমিদার আর সেই সঙ্গে একটা বিরাট অঞ্চল রাজশাহী হিসাবে পরিচিত হতে

www.pathagar.com

থাকে। যশোরে (এখন মাগুরা জেলায়) সিতারাম রায় বলে একজন খুব বড় জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারীর কেন্দ্র ছিল মামুদপুর। তিনি এক পর্যায়ে স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। নবাবকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ-র হয়ে রামজীবন সিতারামের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সিতারাম এই যুদ্ধে পরাজিত হন। তাকে মুর্শিদাবাদে বন্দি করে এনে ফাঁসী দেওয়া হয়। সিতারাম রাজার জমিদারীও রাম জীবনকে প্রদান করা হয় (১৭১২ খ্রিষ্টাব্দ, আনুমানিক)। রামজীবন সিতারাম রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জেতেন তাঁর কর্মচারী দয়ারাম রায়-এর পরিকল্পনার জন্য। রামজীবন দয়ারামকে অনেক ভূ-সম্পত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এভাবেই দিঘাপতিয়ার জমিদারীর উদ্ভব হয়। দয়ারাম রায় ছিলেন তিলি। তিলিরা নিম্নবর্ণের হিন্দু। কিন্তু আপন দক্ষতার কারণে হতে পেরেছিলেন রামজীবনের প্রিয়পাত্র। আর সেই সুবাদে জমিদার। রামজীবন নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি রামাকান্তকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। রামাকান্ত মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী ভবানী নাটোরের জমিদারী লাভ করেন। প্রায় ৫৮ বছর ধরে তিনি জমিদারী করেন। খ্যাতি লাভ করেন রাণী ভবানী হিসাবে। তাঁর এই খ্যাতির মূলে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রচার। তিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১০০,০০০ বিঘা জমিদান করে ছিলেন নিস্কর ভাবে। তিনি বারানসীতে (কাশী) বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মাণ করান ৩৮০টি বিরাট মন্দির।

পি. এ. নাজীর তাঁর স্মৃতিকথায় নাটোর প্রসঙ্গে লিখতে যেয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "সারা মহকুমায় কোথাও রাণী ভবানীর জনকল্যাণ মূলক কোন প্রতিষ্ঠান নজরে পড়েনি আমার। এমনকি চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। দুএকটা পুকুর এবং শহরের একটা দীঘি ছাড়া আর কোন কিছুই দেখতে পাইনি। সংখ্যাগুরু প্রজাকুল মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, তাঁর নিজের স্বজাতির কল্যাণেও দীঘি ছাড়া কেউ আর কিছু খুঁজে পাবেনা। নাটোর রাজাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক দানের নজীর হচ্ছে রাজা-রাণীরা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে নাটোর স্টেশনে এসে সেখান থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে রাজবাড়ীতে যেতেন। তখন রাস্তার দুধারে উচা বাজার, নিচা বাজারের বেশ্যারা কলসি কাঁখে দাঁড়িয়ে উলুধ্বনি দিত। এইটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই শহরে। কোন মুসলমান কখনও ছাতা মাথায় দিয়ে বা জুতো পরে রাজবাড়ী এলাকায় রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারতোনা। করলে শাস্তি হয় মৃত্যুদন্ড নয়ত চরম পীড়ন। অবস্থাপন্ন বাবুদের বাড়ীর দাওয়ায় মুসলমানদের জুতো খুলে উঠতে আমি নিজেই দেখেছি এবং শহরে বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে গল্পগুজব করবার সময় তাঁরা প্রায়ই আত্মতৃপ্তি জাহির করতেন এই বলে যে, পাকিস্তান হবার পর এখন ছাতা মাথায় দিয়ে সকল এলাকায় হাঁটা-চলা করা যায়।" (স্মৃতির পাতা থেকে। পি.এ. নাজির)

পি.এ. নাজির পাকিস্তান হবার ছয় বছর পর নাটোরে এস.ডি.ও হয়ে আসেন। নাটোরে কোন কলেজ ছিলোনা। পি.এ. নাজির প্রথম নাটোরে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা-র নামে একটা কলেজ স্থাপন করেন। কলেজটি এখন একটি সরকারী কলেজে পরিণত হয়েছে। কলেজের নাম কেন তিনি সিরাজুদ্দৌল্লা রাখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন, "নবাব সিরাজুদ্দৌল্লাই রাণী ভবানীকে এই জমিদারী দান করে

www.pathagar.com

ছিলেন। কৃতজ্ঞতা বশতঃ রাণী নবাবকে তাঁর কন্যা উপঢৌকন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা নবাব দরবারে গৃহীত হয়নি।" পি.এ. নাজির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স এবং পরে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তানে যোগদেন। সরকারী চাকরী জীবনে নাটোরে প্রথম এস.ডি.ও হয়ে আসেন। পরে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাজশাহীতে ডি.সি. হয়ে আসেন। তার স্মৃতিকথা খুব সুখপাঠ্য এবং তা থেকে সামাজিক ইতিহাস রচনার যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত হতে পারে।

পুরান দিনের নাটোর সম্বন্ধে পি.এ. নাজির বেশ কিছু তথ্য অবগত হতে পেরেছিলেন, নাটোরের রাজার পিসিমা-র কাছ থেকে। যিনি পাকিস্তান হবার পরও নাটোরে পিতৃগৃহে বৈধব্যের জীবন যাপন করছিলেন, চাকর আর মন্দিরের সেবাইতদের করুণার উপর নির্ভর করে। রাজশাহীতে ডিসি হয়ে আসবার পর তিনি নাটোর রাজার এই পিসির জন্যে একটা মাসিক ভাতালাভের ব্যবস্থা করে দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ "..... বাইরের কোন কাজে যাব মনে করে বেরুচ্ছি এমন সময় নাটোরের রাজবাড়ীর মন্দিরের সেই সেবাইত এলেন। বললেন, 'হুজুর, রাজার পিসিমা আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর বয়স আশির ওপর, শরীরও খারাপ তাই তিনি নিজে আসতে পারলেন না, আমাকে পাঠিয়েছেন।' এই আমন্ত্রণের জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না। কাজ বাতিল করে সাইকেল হাঁকিয়ে গেলাম রাজার পিসিমার কাছে। রাজবাড়ীর ভেতর একটা টিনের চালা ঘরে একটা পুরানো খাটে ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন। বিছানার পাশে একটা জরাজীর্ণ কাঠের চেয়ার আর আলনা, একটা ময়না পাখি, আর একটি বিড়াল দেখলাম ঘরটিতে। যেতেই বৃদ্ধা উঠে বসলেন এবং হাসিমুখে আমাকে বসতে বললেন চেয়ারটিতে। মাথার চুলগুলো সোনালী রং-এর, পরনে বিধবাদের পাড়হীন ধুতি, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। এত সুন্দর ইংরেজী কোন বাঙালীর মুখে শুনিনি আগে। তাঁর বাচনভঙ্গি ও ভাষার প্রশংসা করায় বললেন 'আমি আমার টিউটরের কাছে পড়েছি, কোন স্কুলে কলেজে পড়িনি।' দেখলে মায়া লাগে। বললাম, 'আপনি এরকম একা নিঃসঙ্গ এখানে আছেন অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয় ?' জবাবে বললেন, 'আমার বাপের ভিটায় মরতে চাই। সে জন্যই আছি!' চা খাবার জন্য খুব সাধাসাধি করলেন। মাফ চাইলাম। খুব তেজদীপ্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন, 'বাবা আমি তোমার কাজকর্ম সম্বন্ধে যা শুনছি তাতে তোমাকে একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল .....।' 'আপনার চলে কিভাবে ?' জানতে চাইলাম। জানালেন, 'ভগবান চালায়।' আমার মনে হল রাজার গোষ্ঠী আদতে পাষন্ড, নচেৎ এই অসহায় বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলে তাঁর দেখা-শুনার কোন প্রকার ব্যবস্থা না করে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছে। এখন এই সেবাইতগুলো ছাড়া বৃদ্ধার আর কেউ নেই দেখা-শুনা করবার। যা হোক, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলাম সব কথা। রেভিনিউ আইনে জেলা কালেক্টর রাজার পরিত্যাক্ত মন্দিরের সেবাইত। তিনি ইচ্ছা করলে একজন স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। প্রস্তাব করলাম রাজার পরিবারের এই বৃদ্ধাকে এজেন্ট নিয়োগ করে সহজেই মাসে ৩/৪ শত টাকা মাসোহারা দেওয়া যেতে পারে। এতে এ অসহায় মহিলার একটু উপায় হবে। এর

www.pathagar.com

কোন উত্তর আসেনি। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার ডেপুটি কমিশনার হয়ে কাজে যোগদেবার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম বৃদ্ধা তখনও বেঁচে আছেন এবং নিজের ছয় বছর আগে দেওয়া প্রস্তাব নিজেই বাস্তবায়ন করলাম।" (স্মৃতির পাতা থেকে। পি.এ. নাজির)

দিঘাপতীয়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দয়ারাম রায়। দয়ারাম রায় প্রথমে রামজীবনের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি রামজীবনের আদেশে অনেক সৈন্য নিয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ-র পক্ষে হয়ে মাগুরার সীতারাম রায়কে দমন করতে যান। সীতারাম ছিলেন একজন বড় জমিদার। পরে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর বশ্যতা অস্বীকার করে স্বাধীন রাজা হতে চান। সীতারাম রায় যুদ্ধে হেরে যাবার পর তার জমিদারী রামজীবন লাভ করেন। রামজীবন প্রীত হয়ে রাজশাহী ও যশোরের (বর্তমান মাগুরার) অনেক সম্পত্তি দয়ারামকে দান করেন। দিঘাপতীয়ার জমিদারীর সূচনা হয়। নাটোর ও দিঘাপতীয়ার ইজারাদারদের বংশধররা লর্ড কর্ন ওয়ালিস-এর সময় স্থায়ী জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পান। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করেন। এর আগে খাজনা আদায়ের অধিকার নিলাম ডাকে ১ বছর, পরে ৫ বছর এবং শেষ ১০ বছর মেয়াদি হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। যে সবচেয়ে বেশী খাজনা আদায় করে দিতে পারবে বলে নিলাম ডাকে ইজারা নিত, সেই খাজনা আদায় করতো। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন ইজারাদাররাই নিলামে খাজনা আদায়ের অধিকার কিনতে পারছিল। কিন্তু এখন থেকে ঠিক হলো, প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তারা গর্ভমেন্টকে দেবে এবং খাজনা আদায়ের অধিকার তারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করবে, যদি না তারা সরকারকে প্রদেয় নির্দিষ্ট খাজনা খেলাপী হয়। এই ভাবে নতুন এক প্রকার জমিদারের সৃষ্টি হতে পারলো। জমিদাররা সব সময় কর্মচারী রেখে যে খাজনা আদায় করতেন, তা নয়। খাজনা আদায়ের অধিকার তাঁরা তালুকদারদের কাছে বিক্রি করে দিতেন। তালুকদাররা জমিদারদের প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে খাজনা আদায়ের অধিকার কিনে নিতেন। তালুকদাররা একইভাবে আবার খাজনা আদায়ের অধিকার হাওলাদারকে কাছে এবং হাওলাদার জোতদারের কাছে বিক্রি করতেন। এইরকমভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধান জমিদার ও কৃষকের মধ্যে মধ্যবর্তী স্বত্ব ভোগীর (অর্থাৎ তালুকদার, জোতদার ইত্যাদির) সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ২০ জন। এরা খাজনা ছাড়াও কৃষকের কাছে থেকে অনেক রকম ভাবে টাকা নিতেন। যেমন, আবওয়াব ও নজরানা। কৃষকের উপর এর ফলে চাপে বিরাট করের বোঝা। জমিদারদের মধ্যে অনেকে শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত চর্চা করেছেন। কিন্তু জমিদারদের অত্যাচারের কথাও বিশেষ ভাবে মনে রাখবার মতো। অনেকেই এঁরা থেকেছেন কেবল ভোগ বিলাসে মত্ত। প্রজার উপর অত্যাচার অবশ্য এদেশে নতুন কিছু ছিল না। দ্বিজ হরিরাম মুধ্যযুগে তাঁর চন্ডি কাব্যে লিখেছেনঃ

লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায়
আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপতে বেচায় দুধের ছাওয়াল।

ইংরাজ আমলে জমিদারগণ প্রজাদের উপর কিরকম নৃশংস অত্যাচার করতেন,

www.pathagar.com

সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণ থেকে তা যথেষ্ট অবগত হওয়া যায়। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা-র মন্তব্য ছিল এই রকমঃ

"ভিন্ন ভিন্ন ভূ-স্বামী যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছল করিয়া প্রজা নিপীড়ন করেন, তাহা গণনা করা দুষ্কর। তাঁহারা স্বাধীকারস্থ সমুদয় প্রজার সমুদয় বস্তুই আত্মবস্তু জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কাহার অবিদিত আছে যে, প্রজাদিগের ফলমূল বৃক্ষ পর্যন্ত ভূ-স্বামীর সর্বগ্রাসক লোভের নিকট রক্ষা পায়না? কোন নিরাশ্রয় দুঃখী প্রজা কোন ফল-বৃক্ষ রোপন পূর্বক যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাকে রক্ষিত ও বর্ধিত করিয়াছে, এবং বহু বৎসর পর তাহার শাখা সকল ফল ভারে অবনত দেখিয়া মনে মনে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে, ইতিমধ্যে যদি তাহার উপর ভূম্যধিকারির ক্রুর দৃষ্টি পতিত হয়, তবে আর তাহা রক্ষা করে কাহার সাধ্য ? যখন সে অনাথ ব্যক্তি তাঁহার নিদারুণ অনুমতি শ্রবণ করিলেক, তখন নিশ্চই জানিলেক, ভস্মতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আমার এত বৎসরের পরিশ্রম অদ্য বিফল হইল। কি বিষম নৈরাশ্য! কি অসহ্য যন্ত্রনা। ..... সম্প্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন ভূ-স্বামী ও তাঁহাদের কর্মচারিদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহাদিগের শরীরও আপনার অধিকার ভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহাদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপন ক্রিত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাহাদের এই প্রকার অখণ্ড অনুমতি আছে যে বিনামূল্যে বিনা বেতনে তাঁহাদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিত ক্ষৌর করিবেক, যানবাহকে বহন করিবেক, চর্মকার চর্ম পাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাদিগে সেবা করিবেক।"

রাজশাহী অঞ্চলের জমিদারদের সম্পর্কে এরকম কোন বর্ণনা না পাওয়া গেলেও প্রজাদের অধিকার যে ছিল সামান্যই তা অনুমান করা চলে।

শেরশাহ কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ খাজনা হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছিলেন। আকবর বলেছিলেন এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করতে। হেসটিংস প্রবর্তন করেছিলেন অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। এ সময় যে সবচেয়ে বেশী টাকা রাজস্ব হিসাবে আদায় করে দিতে পারবে বলে চুক্তি করত তাকেই দেওয়া হতো খাজনা আদায়ের অস্থায়ী ভার। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই ব্যবস্থা রদ করে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই প্রথা অনুসারে ভূমিরাজস্ব চিরদিনের জন্যে ঠিক করে দেওয়া হয়। ঠিক করে দেওয়া হয়, জমিদারারকে কি হারে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করতে হবে। জমিদারকে করা হয় জমির মালিক। বংশ পরম্পরায় তারা সে মালিকানা ভোগ করতে পারবে, যদি তারা স্থিরিকৃত হারে যথাসময়ে সরকারকে দেয়খাজনা পরিশোধ করতে পারে। তারা জমিদারী অপরের কাছে বিক্রি করতে পারবে। মধ্যবর্তী স্বত্ব ভোগীর কাছে খাজনা আদায়ের অধিকার হস্তান্তর করতে পারবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে চিরদিনের জন্যে কত খাজনা জমিদারদের দিতে হবে তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল বলে সরকার খাজনা বাড়াতে পারতোনা। ১৯৩০ দশকে জমিদাররা, একটি হিসাব অনুসারে, খাজনা আদায় করতো প্রায় ১৮ কোটি টাকা। কিন্তু সরকার তাদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে সে সময় রাজস্ব পেত মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৮-১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারী প্রথার ভালমন্দ দিক বিচার করবার জন্যে স্যার ফ্রানসিস্ ফ্লাউডকে সভাপতি করে সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটি এ বিষয় সবরকম তথ্য অনুসন্ধান করে জমিদারী প্রথা তুলে দিতে বলে। বৃটিশ ভারতে সর্বত্র একই ভাবে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হতোনা। অনেক প্রদেশে ছিল "মহলওয়ারী" প্রথা। এক্ষেত্রে ৩০ বছর অন্তর অন্তর খাজনা আদায়ের ইজারা যুক্তি নবায়ন করা হতো। এক্ষেত্রে সরকার রাজস্ব বাড়াতে পারতো। অনেক প্রদেশে সরকার সরকারী কর্মচারীদের মারফত ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো রায়ত ওয়ারী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে ভাল। এদের জমিদারের অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়নি।

কৃষকেরা অনেক সময় জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। নওগাঁর ধুবলহাটির জমিদার বংশ ছিল যথেষ্ট প্রাচীন। ধুবলহাটির এক জমিদার, রাজা হরনাথ, চান কৃষকদের উপর খাজনার হার খুব বাড়াতে। কিন্তু বর্ধিত হারে খাজনা দিতে অস্বীকার করে কৃষকরা। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ধুবলহাটিতে ঘটে প্রজা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন আস্তান মোল্লা। এই বিদ্রোহ চলেছিল প্রায় সাত বছর ধরে। এক পর্যায়ে জমিদার রাজা হরনাথ বাধ্য হন কৃষকদের দাবী মেনে নিতে।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে মুসলমানরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরোধীতা করেছেন। অধিকাংশ জমিদার, বিশেষ করে বড় বড় জমিদার, হিন্দু ছিলেন বলে নয়, তাঁরা একে সাধারণভাবেই সমর্থনীয় মনে করেননি। মীর মশাররফ হোসেন ১৮৭৩ সালে লেখেন "জমিদার দর্পণ" নামে একটি নাটক, যার বিষয়বস্তু হলো এক মুসলমান জমিদারের প্রজাপীড়ন। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে প্রজাপীড়নের বিরোধিতা করেছেন। যা সেসময় কোন হিন্দু লেখক করেননি।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ সরকার পাশ করে Land Revenue and Tenancy Act। যার ফলে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

রাজশাহী অঞ্চলের জমিদারগণের মধ্যে দিঘাপতিয়ার জমিদার সবচেয়ে বড় জমিদারে পরিণত হন। দিঘাপতিয়ার জমিদারীর উত্তরাধিকারীরা রাজশাহী শহরে অনেক কিছু করেছেন। এঁরা রাজশাহী কলেজ ও হাসপাতালের জন্যে প্রদান করেছেন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ। মেয়েদের জন্য স্থাপন করেছেন একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গড়েছেন উল্লেখযোগ্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম। দিঘাপতীয়ার জমিদারীর ইতিহাস তাই বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। এই ইতিহাস এই ভাবে বর্ণনা করা চলে।

www.pathagar.com

দয়ারাম রায়	(দিঘাপতিয়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা)
জগন্নাথ রায়	
প্রাণনাথ রায়	(লর্ড ডালহাউসি একে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।)
প্রসন্ননাথ রায়	
রাজা প্রমথনাথ রায় (দত্তক পুত্র)	(ইনি ১৮৭১ খ্রিঃ রাজাবাহাদুর হিসাবে ভূষিত হন। ১৮৮৩ খ্রিঃ মারা যান।)

প্রমথনাথ রায় জনহিতকর কাজে অনেক অর্থ প্রদান করেন এবং ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাকরেন "রাজশাহী এসোসিয়েশন"। রাজা প্রমথনাথ রায়ের চার পুত্রঃ প্রমদা নাথ রায়, বসন্ত কুমার রায়, শরৎ কুমার রায় ও হেমেন্ত কুমার রায় এবং এক কন্য ইন্দুপ্রভা। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদানাথ রায় দিঘাপতিয়ার জমিদার হন। তিনিও রাজা বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। প্রমথনাথ যে সব জমিদারী খরিদ করেন, তা তিনি তার অপর তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে যান। পূর্ব বড়াল নদীর তীরে নন্দকুজা নামক স্থানে এই তিন পুত্র রাজবাড়ি নির্মাণ করে বাস করতে আরম্ভ করেন। নন্দকুজার নতুন নামকরণ হয়, দয়ারামপুর। দিঘাপতিয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের নামে এই নতুন নামকরণ করা হয়। পুঠিয়ার এবং নাটোরের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। রাজশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ। কিন্তু দিঘাপতিয়ার রাজারা হলেন, আমরা আগে বলেছি, "তিলি"। হিন্দুদের মধ্যে তিলিরা নিম্নবর্ণের বলে পরিচিত। তাই খুব বড় রকমের জমিদার হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সমাজে এঁদের সামাজিক মর্যাদা ঠিক অন্যদের মতো ছিল না।

বড় বড় জমিদারগণ নবাবী আমলে এবং ইংরাজ আমলে "রাজা", "রাজা বাহাদুর" ইত্যাদি খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু এদের কারোরই কোন সার্বভৌমত্ব ছিল না। এঁরা ছিলেন নবাবের অধীন ইজারাদার মাত্র। ইংরাজ আমলে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ আমলেও অনেকে পেয়েছেন রাজা উপাধি। কিন্তু এহলো উপাধি মাত্র। অবশ্য প্রজাদের উপর এদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। প্রত্যেক জমিদারের ছিল লাঠিয়াল বাহিনী। আর প্রজাদের কাছ থেকে এরা খাজনা আদায় করতেন অনেক চড়া হারে এবং লাঠির জোরে। গ্রহণ করতেন আবওয়া ও নজরানা। না দিলে করতেন লাঠি পেটা।

পুঠিয়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া ছাড়া রাজশাহীর আর একটি প্রাচীন নাম করা জমিদার বংশ ছিল তাহেরপুরের জমিদার বংশ। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বারো ভূঞাদের একজন ভূঞা। পরে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করে একজন বড় জমিদারে পরিণত হন। সুলতানী আমল থেকেই তাহেরপুর বেশ পরিচিত স্থান। তাহেরপুরের একজন খুব বড় সামন্ত ছিলেন, কংশ নারায়ণ। একে আর রাজা গনেশকে এক সময় ঐতিহাসিকরা এক করে দেখতেন। কিন্তু এখন আর এই দুই ব্যক্তিকে এক বলে মনে করা হয় না। তাহেরপুরের জমিদার বংশের সঙ্গে কংশ নারায়ণের কোন যোগসূত্রও নেই। আগে মনে করা হতো কংশ নারায়ণ এবং গনেশ হলেন একই ব্যক্তি আর এঁর রাজত্বকালে এঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা ভাষায়

www.pathagar.com

রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু এখন অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে কৃত্তিবাস ওঝা রোকন-উদ-দীন বার বাক শাহ-র সময় বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন এবং তাঁর দ্বারা যথেষ্ট সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। কংশ নারায়ণের দ্বারা নয়। রোকন-উদ-দীনের রাজত্বকাল হলো ৮৬০ থেকে ৮৮১ হিজরী (১৪৫৫-২৪৭৬ খ্রিঃ)। কংশ নারায়ণ আর এক কারণে বিখ্যাত। কংশ নারায়ণ, কথিত আছে, সে আমলে নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করে দুর্গাপুজা করেন। তাহেরপুরের রাজপুরোহিত রমেশ শাস্ত্রী এসময় দুর্গাপুজার যে পদ্ধতি রচনা করেন, তাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। বাংঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে দুর্গা ও কালি পূজা হলো প্রধান পুজা। দুর্গাপুজা এবং কালীপুজা প্রধান্য লাভ করেছে মধ্যযুগ থেকে। এর আগে, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্রের মতে, দুর্গা এবং কালী পুজা এত ঘটা করে করা হতো না। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে দুর্গাপুজা হয়, চতুর্দশ শতাব্দী বা তার কিছু পূর্বে এর সূত্রপাত হয়। রাজশাহীর জমিদারগণ পুজা পার্বণে বহু অর্থ ব্যয় করতেন আর মুসলমান কৃষক প্রজাদের বহনে করতে হতো এর বিপুল ব্যয়ভার। ফারায়জীরা প্রথম এর বিপক্ষে বিশেষ প্রতিবাদ ওঠান। ফারায়জীদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ
জমিদারী পর্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি

জমিদারগণ গ্রামের সাধারণ কৃষক প্রজাদের কথা সেভাবে ভাবেননি, যেভাবে ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু জমিদারদের মধ্যে সকলে না হলেও কেউ কেউ গ্রামে না হলেও শহরে গড়তে চেয়েছেন অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। যেমন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। করেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা। যার ফলে ঘটতে পেরেছে ভাষা হিসাবে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি। সাধারণভাবে জমিদাররা ইংরাজ আমলে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটা অবকাশ-রঞ্জনী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কারণ, তাঁদের ছিল না অন্ন চিন্তা। আর হাতে ছিল সংস্কৃতি চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সময়।

ইংরাজ আমলে তখনকার বাংলায় যতগুলি কলেজ ছিল, তাদের মধ্যে রাজশাহী কলেজ ছিল বিশেষ ভাবে নামকরা। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এল. এস. এস. ওম্যালি রাজশাহী জেলার গেজেটিয়ারে লিখেছেন, এই কলেজে প্রায় বাইশটি জেলা থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে। এর মধ্যে রাজশাহী জেলার ছাত্র হলো চার-ভাগের একভাগ, পাবনা জেলার ছাত্র হলো ছয়-ভাগের একভাগ, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর জেলার হলো চার-ভাগের এক ভাগ। রাজশাহী কলেজ ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে হলো বাংলার তৃতীয় কলেজ। ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ঢাকা কলেজের পরেই হলো রাজশাহী কলেজের স্থান।

এই বিখ্যাত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল বরেন্দ্র অঞ্চলের জমিদারদেরই উদ্যোগে। রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে । প্রথমে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে ধুবলহাটির জমিদার কিছু টাকা প্রদান করেন। পরে দিঘাপতিয়ার জমিদার প্রদান করেন অনেক টাকা। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে রাজশাহী কলেজকে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিনত করবার সুপারিশ করা হয়। পরে এবিষয় আমরা আলোচনা করবো।

রাজশাহীতে দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায়ের উদ্যোগে এবং অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় বরেন্দ্র জাদুঘর (১৯১৪) এবং অনুসন্ধান সমিতি (V.R.S)। বাংলায় কলকাতার বাইরে এরকম সংগ্রহশালা এবং অনুসন্ধান সমিতি আর একটিও ছিল না। শরৎ কুমারকে বরেন্দ্র মিউজিয়াম ও অনুসন্ধান সমিতি স্থাপনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এবং রমা প্রসাদ চন্দ।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০) জন্মে ছিলেন নদিয়ার সিমলা নামক গ্রামে। তাঁর পিতা কুমারখালি ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। পরে সরকারী কাজের সূত্রে আসেন রাজশাহী। অক্ষয় কুমার বাল্যে কুমারখালি ও পরে রাজশাহীতে (রামপুর-বোয়ালিয়া)

www.pathagar.com

শিক্ষা লাভ করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করে রাজশাহীতেই ওকালতি আরম্ভ করেন। আইন ব্যবসা করেও তিনি সময় করে নিতে পেরে ছিলেন ইতিহাস চর্চার। তাঁর লেখা বই "সিরাজদৌলা" (১৮৯৮) "মীর কাসিম" (১৯০৬) এবং "গৌড় লেখ মালা" (১৯১২) বিখাত। এছাড়া তিনি ইতিহাসের বহু বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চান বরেন্দ্র ভূমির শিল্পকলার সঙ্গে যবদ্বীপের শিল্পকলার সাদৃশ্য আছে। যবদ্বীপের শিল্পকলা বরেন্দ্রর শিল্পকলার দ্বারা অতীতে প্রভাবিত হয়েছিল। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এদেশে তিনিই প্রথম মাটি খুঁড়ে বিভিন্ন প্রমাণ আবিষ্কার করে তার উপর ভিত্তি করে ইতিহাস গ্রন্থ রচনার পথ প্রদর্শন করেন। গৌড় ও মাগধী শিল্পকলার আলোচনায় প্রতিমাতত্ত্বের বিভিন্ন দিকে নতুন তথ্য আবিষ্কারের মূল সূত্রও তিনিই প্রথম নির্দেশ করেন। অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (O. C. Ganguli) তাঁর "ভারত শিল্প ও আমার কথা" নামক স্মৃতি গ্রন্থে এবিষয়ে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের অবদানের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘরের আমন্ত্রণে কলকাতা থেকে দুইবার বক্তৃতা করতে আসেন। তাঁর একবারের বক্তৃতার বিষয় ছিল "মুঘল চিত্রকলা"। এই বক্তৃতা দিতে এসেই তাঁর সঙ্গে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় ঘটে। তাঁর মতে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কার বর্জিত বুদ্ধিতে ইতিহাস আলোচনা বাংলাদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন মৈত্রেয় মহাশয়।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের চিন্তাধারা সারাদেশের ঐতিহাসিকবৃন্দকে তখন প্রভাবিত করেছিল। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের "গৌড় লেখ মালা" গ্রন্থ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রকাশ করে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই প্রকাশনা ছিল খুবই গুরুত্ববহ। এর উপর নির্ভর করে পরে অন্য ঐতিহাসিকগণ অনুসন্ধানে ব্রতী হতে পারেন।

রমা প্রসাদ চন্দ(১৮৭৩-১৯৪২) ছিলেন ঢাকা জেলার অধিবাসী। তিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী (রামপুর বোয়ালিয়া) আসেন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হয়ে এবং ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত ঐ স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। তিনি রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন। তিনি ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত বই লেখেন। তাঁর ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ "গৌড় রাজ মালা" এবং পরে তাঁর লেখা নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'The Indo-Aryan Races' বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯১৬)। তাঁর লেখা নৃতত্ত্ব বিষয়ক বই, এ সময় নৃতত্ত্ববিদ (Anthoropologist) মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ তিনি তখনকার দিনের নামকরা বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক স্যার হার্বার্ট রিজলে-র মত কে ভুল প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। রিজলে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের জনসমষ্টির উৎপত্তির কথা বলতে যেয়ে বলেছিলেন, এই অঞ্চলের মানুষের মাথা সাধারণত গোলাকৃতি। কিন্তু নাক মঙ্গোল মানবধারার মানুষের মত নয়। বরং দ্রাবিড়দের, যথা, সাঁওতালদের মতো। রিজলে সাঁওতালদের মনে করতেন বিশুদ্ধ দ্রাবিড়। তাঁর মতে বাংলায় দ্রাবিড় জাতির মানুষ এসেছে পশ্চিম দিক থেকে, আর মঙ্গোল জাতির মানুষ এসেছে উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব দিক থেকে। এই দুই ধারার মানবের মিশ্রণ ঘটেছে বাংলায়। বাংলার মানুষ হলো মঙ্গোল দ্রাবিড়। এদের মাথা

www.pathagar.com

হলো মঙ্গোলদের মতো গোল কিন্তু নাক দ্রাবিড়দের অনুরূপ। রমা প্রসাদ এই মতের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, গোল-মাথা কেবল মঙ্গোল মানব ধারা ভুক্ত মানুষের মধ্যেই যে দেখা যায়, তা নয়। যাদের বলে আলপাইন, তারাও হলো গোল মাথা মানুষ । ইউরোপের আল্পস অঞ্চলে গোল মাথা মানুষ যথেষ্ট দেখা যায়। এরকম গোল মাথা মানুষ মধ্যএশিয়ার পামীর অঞ্চলও আছে। পামীর অঞ্চলের গাল্‌চা ও তাজিকদের মাথা গোল। কিন্তু এসব মানুষ মঙ্গোলীয় মানব ধারাভুক্ত নয়। এদের ফেলতে হয় আলপাইন মানবধারায়। প্রাচীন কালে পামীর অঞ্চল থেকে গোল মাথা ওয়ালা আলপাইন মানুষ বাংলায় এসেছিল। সব আর্য ভাষাভাষী মানুষের মাথা যে লম্বা ছিল এরকম ভাববারও কোন কারণ নেই। যারা আর্য ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষায় কথা বলে, তাদের মধ্যে গোল (যেমন, আল পাইন) এবং লম্বা মাথা (যেমন, নর্ডিক) মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মানুষ আর্য ভাষা পরিবারভুক্ত ভাষায় কথা বলে। বাংলার গোল মাথা মানুষকে বলা যায় আলপাইন। কিন্তু এরা ইউরোপের আল্পস পাহাড় অঞ্চল থেকে আসেনি। এসেছে মধ্য এশিয়ার পামীর অঞ্চল থেকে। এই হলো রমা প্রসাদ চন্দের অভিমত।

হনলেও গ্রীয়ারসন-এর মতে এই উপমহাদেশের আর্য ভাষাকে দুটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়। এদের একটিকে তাঁরা বলেছেন "মধ্যদেশিক আর্য" (Inner Aryan), আর অপরটিকে বলেছেন, "প্রান্তিক আর্য" (Outer Aryan)। মধ্যদেশিক আর্য ভাষায় যেখানে "স" উচ্চারণ করা হয়, প্রান্তিক আর্য ভাষায় সেখানে উচ্চারণ করতে দেখা যায় "হ"। এঁরা বলেন, প্রথমে এই উপমহাদেশে আসে প্রান্তিক আর্য ভাষীরা। পরে আসে মধ্যদেশিক আর্যরা। মধ্যদেশিক আর্যরা প্রান্তিক আর্যদের এই উপমহাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে বিতাড়িত করে। গোল মাথা মানুষ বেশি দেখা যায় গুজরাটে। দেখা যায় বাংলায়। রমা প্রসাদ চন্দ বলেন, প্রান্তিক আর্য ভাষীদের মাথা ছিল গোল। আমরা সাধারণ বাংলাভাষায় যেখানে বলি "সকল", ঢাকার বাংলায় সেখানে বলে "হকল"। এই হকল এর "হ" হলো প্রান্তিক আর্য ভাষার ঐতিহ্যবহ। রমা প্রসাদ চন্দ প্রমাণ করতে চান, আর্য-ভাষীরা সকলে একরকম দেখতে ছিলনা। একরকম ছিল, লম্বা মাথা, "নর্ডিক"। আর এক রকম ছিল, গোল-মাথা "আলপাইন"। বাংলার মানুষ প্রধানত "আলপাইন"। রমা প্রসাদ চন্দের তত্ত্বকে সমর্থন দেন বিলাতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা নৃতাত্ত্বিক, A.C.Haddon। রাজশাহীর মতো শহরে বসে সেসময় The Indo-Aryan Races-এর মত একটা বই লেখা এবং প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। অবশ্য নৃতত্ত্বে আর্যতত্ত্ব নিয়ে এখন আর আগের মতো মাথা ঘামান হয় না। "আর্য" মতবাদ এখন সেকেলে হয়েই পড়েছে।

আর্য মতবাদ উদ্ভুত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস (Sir William Jones) ঘোষণা করেন, লাতিন, গ্রীক, জার্মান, কেলটিক আর সংস্কৃত হলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভাষা। তিনি বলেন, যারা এসব ভাষায় কথা বলে তাদের আদি পূর্বপুরুষ ছিল এক। তাই এই ভাষাগুলির মধ্যে থাকতে দেখা যায় এরকম মিল। কিন্তু এখন ভাবা হয়, ভাষা একদল মানুষ আর একদল মানুষের কাছ থেকে শিখে নিতে পারে।

www.pathagar.com

তাই ভাষার ঐক্য থেকে মানুষের জন্মগত ঐক্য প্রমাণ করা কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন নিগ্রোরা সাদা মানুষের মতই ইংরাজি বলে। কিন্তু তারা যে জন্মসূত্রে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত নয়, তা আমরা সবাই জানি। আর্য, দ্রাবিড়, প্রভৃতি শব্দ জন্মগত জাতিগত এবং আবার ভাষা পরিবার বাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হবার ফলে নৃতত্ত্বে অনেক জটিলতারই সৃষ্টি হয়েছে। এক সময় প্রমাণ করবার চেষ্টা হতো, আর্য ভাষাভাষীরা সকলে জন্মগত ভাবেই এক এবং তারা অন্য সব জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাই এদেশে সবাই চাইতো নিজেদের খাঁটি আর্য বলে প্রমাণ করতে। উইলিয়াম জোনস ইংরাজ আমলে এসেছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশের ভাষা ও মানুষ নিয়ে গবেষণা। তিনিই কলকাতায় স্থাপন করেন "এশিয়াটিক সোসাইটি"। জোনস-এর চিন্তাধারা বহু গবেষককে প্রভাবিত করে। রমা প্রসাদ চন্দ ও অন্যান্যরাও তার আর্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, বিশেষ করে বাংলাভাষী হিন্দুরা, হলো আর্য। যদিও গোল-মাথা। তারা জাতি হিসাবে অধম নন। ইংরাজরা সাদা আর তারা কাল। কিন্তু সেটা বড় নয়। আসলে তারা তাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি।

এ সময় রাজশাহীতে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং সাহিত্য চর্চার একটা বিশেষ পরিমল গড়ে উঠেছিল। রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) সারা বাংলাতেই কবি হিসাবে সুখ্যাতি পান। তিনি ভক্তি এবং দেশপ্রেমমূলক অনেক গান বেঁধে ছিলেন এবং তাতে সুর যোজনা করেছিলেন। কবিতার চাইতে গান রচনার প্রতিভাই তাঁকে খ্যাত করে তুলেছিল। তাঁর গানের মধ্যে তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী "শ্যামধরণী সয়সা" খুব প্রসিদ্ধি পায়। প্রিয় পুত্রের বিয়োগে রজনী কান্ত আরএকটি প্রসিদ্ধ গান রচনা করেন, "তোমারি দেওয়াল প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ।" কিন্তু যে গানটি তাঁকে সারা দেশে বিশেষভাবে পরিচিত করে তুলেছিল, সেটা ছিল একটা স্বদেশী গান, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়"। একজন মন্তব্য করেছেন, "এই গান রচনার ফলে রাজশাহীর পল্লী কবি রজনীকান্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় কবি-কান্ত কবি রজনী কান্ত হইয়া উঠিলেন"। (সুবল মিত্র) রজনীকান্ত সিরাজগঞ্জের ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে জন্মে ছিলেন। কিন্তু সাহিত্য সাধনা করেছিলেন রাজশাহীতে। গানের ভণিতায় রজনীকান্ত সেন নিজেকে কান্ত বলে লিখতেন। তাই তাঁকে সাধারণভাবে বলা হতো "কান্ত কবি রজনী কান্ত"। প্রমথনাথ বিশী রজনীকান্তের গান ও কাব্যের সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন। সঙ্কলনের ভূমিকাতে তিনি "কান্ত" কবির মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, রজনীকান্তের হাসির গানের মূল্য আজ আর বিশেষ নেই। কারণ, মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাঁর ভক্তিমূলক গান এখনও যথেষ্ট আবেদনবহ। বহু বিষয়ে গান বেঁধেছিলেন রজনীকান্ত। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়েও একটি গান আছে তাঁরঃ

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু-নয়ান।
আজ, এক করসে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরান!
থাকি একই মায়ের কোলে, করি

www.pathagar.com

একই মায়ের দুগ্ধ পান।
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবেশী,
দুই গোলারই একই ধান।
এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ !

রজনীকান্ত 'বাণী', 'কল্যাণী', 'আনন্দময়ী', 'সদ্ভাব কুসুম', 'অমৃত', 'বিশ্রাম', 'অভয়া'-এই সাতটি গান ও কবিতার বই লেখেন। এর মধ্যে বাণী এবং কল্যাণী হলো বিশেষভাবেই গানের বই। এসবই রাজশাহীতে বসে রচনা।

রাজশাহীর সাহিত্য পরিমন্ডল নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে আর একজন সাহিত্যিকের কথাও কিছুটা আসে। তিনি হলেন দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)। ইনি ছিলেন মেহেরপুরের লোক। রাজশাহী শহরে তিনি আসেন চাকুরি করতে। রাজশাহী কালেক্টরেটে চাকরি পান তিনি। তিনি প্রথমে রজনীকান্ত সেনের উৎসাহে একটি ফরাসী উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বন করে একটা রহস্য উপন্যাস লেখেন। পরে তিনি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন সারাদেশে। দীনেন্দ্র কুমার রায় রাজশাহী ছেড়ে যান ১৮৯৮ সালে। এখান থেকে তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের বাংলা শিক্ষক হিসাবে বরন্দায় গমন করেন। বরন্দা থেকে ফিরে তিনি কলকাতায় সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। দীনেন্দ্র কুমারের স্মৃতিকথা থেকে সে সময়ের রাজশাহীর অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কান্ত কবি রজনী কান্ত এবং পরে দীনেন্দ্র কুমার রায়কে সাহিত্য সাধনায় বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে ছিলেন।

রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার একসময় সারা বাংলায় প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। সুভাসচন্দ্র এই পাঠাগারের অটোগ্রাফ খাতায় লিখেছেন ঃ I have no hesitation in saying that there are few public libraries of this type out side Calcutta–আমার বলতে দ্বিধা নেই যে কলকাতার বাইরে এরকম লাইব্রেরি খুব কমই আছে। আরো অনেকেই সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন এই লাইব্রেরী সম্পর্কে। মহাত্মা গান্ধী এবং সরজিনি নাইডুর সাক্ষরও আছে এই লাইব্রেরির মন্তব্যের পুরান খাতায়।

একটা কথা এখানে বলা দরকার। সবার জন্য এই পাঠাগার উন্মুক্ত ছিল না। যদিও এর নাম ছিল সাধারণ পাঠাগার (Public Liabrary)। এই বিখ্যাত সাধারন পাঠাগারে এক সময় কেবল মাত্র হিন্দুরাই সদস্য হতে পারতেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ রা ফেব্রুয়ারী মৌলভী আমিনুল হক উকিল এই লাইব্রেরিতে সদস্য হতে চাইলে প্রধান করণিক তাঁকে সদস্য করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে তাঁকে সদস্য করা হয়। এই সময় থেকেই এই পাঠাগার মুসলমানদের জন্যেও উন্মুক্ত হতে পারে। এর আগে নয়।

রাজশাহী থেকে "হিন্দু রঞ্জিকা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। পত্রিকাটি

www.pathagar.com

১৮৬৬ সালে শ্রী দিননাথ সিংহ রায়ের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। এর দু'বছর পর পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিবাদ ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম প্রচার ছিল এর প্রধান কর্তব্য। বাংলার পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে হিন্দু রঞ্জিকা বিশেষভাবে খ্যাত হয়ে আছে।

রাজশাহী থেকে আরো অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৭ সালে রাজশাহী শহর থেকে প্রকাশিত হয় "উৎসাহ" নামে একটি মাসিক পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন সুরেশ চন্দ্র সাহা। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা লেখকের লেখা এতে প্রকাশিত হয়ে ছিল।

১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে "মানসী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ (১৮৬৮-১৯২৬) এর সম্পাদক হন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে "মর্মবাণী" নামে আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার তিনি যুগ্ম সম্পাদক হন। পরে এই দুইটি পত্রিকা একত্রিত হয়ে "মানসী ও মর্মবাণী" নামে প্রকাশিত হতে থাকে। জগদিন্দ্র নাথ হন এর সম্পাদক। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত থাকায় পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও বরেন্দ্র গ্রুপের পত্রিকা হিসাবে পরিচিতি পায়। জগদিন্দ্র নাথ "সন্ধ্যাতারা" এবং "নুরজাহান" নামে দুইটি বই লেখেন। তিনি সুকবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে সেসময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গ্রন্থ তাঁর নামে উৎসর্গ করে ছিলেন।

১৯৪০-এর দশকে ঋত্বিক ঘটক রাজশাহী থেকে "অভিধারা" নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু মাত্র দু-এক সংখ্যা প্রকাশের পর তাঁর পক্ষে আর পত্রিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এর একটা কারণ, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল হয়ে ওঠা। ১৯৪৭-এর পরেও ঋত্বিক ঘটক কয়েক বছর রাজশাহী ছিলেন। পরে ভারতে চলে যান। পরে তিনি বোম্বাইতে সিনেমা প্রযোজক হয়ে সারা ভারতে খ্যাতি লাভ করেন।

ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮) জন্মেছিলেন নাটোরের সিংড়া থানার করচমারী গ্রামে। কিন্তু তাঁর বাল্য ও কিশোরকাল কাটে রাজশাহী শহরে। রাজশাহী শহরের রানীবাজারে ছিল তাঁদের বাড়ি। যা 'সরকার বাড়ি' নামে খ্যাত ছিল। যদুনাথ ক্লাস ফাইভ থেকে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে এবং তারপর দুই বছর রাজশাহী কলেজে লেখাপড়া করেন।

যদুনাথ সরকার ছিলেন খুব মেধাবী ছাত্র। তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেন ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং রাজশাহী কলেজ থেকে এফ, এ পাস করেন দশম স্থান অধিকার করে। এরপর তিনি ভর্তি হন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাসে অনার্স সহ বি,এ, পাস করেন (১৮৯১)। এর পরের

www.pathagar.com

বছর ইংরাজি সাহিত্যে এম,এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। আরম্ভ করেন ইংরাজি সাহিত্যে অধ্যাপনা। কিন্তু পরে তিনি পাটনা কলেজে গ্রহণ করেন ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ। পাটনায় অধ্যাপনা করবার সময় তিনি বাকীপুরে "অরিয়েন্টাল লাইব্রেরি"-তে পড়াশুনা করবার সুযোগ পান। এই লাইব্রেরিটি স্থাপন করে যান খোদা বক্স সাহেবের পিতা। খোদা বক্স এই লাইব্রেরিটির আরো উন্নতি বিধান করেন। খোদা বক্স-এর লিখিত Islamic Civilization খুব বিখ্যাত বই। খোদা বক্স একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা জানতেন। তিনি জার্মান বিশেষজ্ঞ Von Kremer-এর ইসলাম সংক্রান্ত বই ইংরাজি ও উর্দুতে অনুবাদ করেন। যদুনাথ সরকার বাকীপুর অরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে এমন কতগুলি হাতে লেখা ফারসী বই পড়বার সুযোগ পান, যার উপর ভিত্তি করে তিনি লেখেন তার বিখ্যাত, Mughal Administriation এবং Studies in Mughal India গ্রন্থ। যা তাঁকে ঐতিহাসিক খ্যাতি প্রদান করে। যদুনাথ সরকারের লেখা একটি চটি বই, India Through Ages খুবই সুখ পাঠ্য। এই বই থেকে এই উপমহাদেশের উত্তরাংশের সংস্কৃতির ধারা সম্পর্কে অল্প কথায় একটি ধারণা পাওয়া যায়। বইটি তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে যেয়ে যে সব বক্তৃতা করেন তার সমষ্টি। কিন্তু এতে তিনি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা সম্পর্ক বিশেষ কিছু বলেননি। কারণ, দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি কখনও কোন গবেষণা করেননি। বক্তৃতাগুলি তামিল শ্রোতাদের কতটা ভাল লেগেছিল, বলা যায় না। তামিলরা আর্য সভ্যতার জয় গান পছন্দ করে না। যদুনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত The History of Bengal-এর দ্বিতীয় খন্ড সম্পাদনা করেন। এর একটা বড় অংশই তাঁর নিজের লেখা। ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের দান অনেক। তবে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয়, বারে বারে কেবল বাইরে থেকে মানুষ এসে এই উপমহাদেশে গড়েছে সভ্যতা। এই বিরাট উপমহাদেশের ভিতর থেকেও যে একাধিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, তা তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন বৃটিশ ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে।

যদুনাথরা হলেন কায়স্থ। তারা ছিলেন নাটোরের সিংড়া থানার করচমারিয়া নামক জায়গার জমিদার। তাঁর পিতা রাজকুমার সরকার রাজশাহী শহরে থাকতেন। কখনও কখনও করচমারিয়া যেতেন। যদুনাথের পিতা ছিলেন বৈষ্ণব। করচমারিয়ার সঙ্গে লাগোয়া হলো নওগাঁর পতিসর। যা হলো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত জমিদারী। রবীন্দনাথের প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে পতিসর (পরগণে, কালিগ্রাম) জমিদারী ক্রয় করেন। দ্বারকানাথের জমিদারীর মধ্যে এইটি ছিল সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ।

রাজকুমার সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল ব্যক্তিগত সখ্যতা। তাই রাজকুমার সরকার বৈষ্ণব হিন্দু হওয়া সত্ত্বে রাজশাহীতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্টি গঠনের সময় রাজকুমার সরকারকে করেন তার একজন সদস্য। একসময় রাজশাহীতে আদি ব্রাহ্ম সমাজের যথেষ্ট তৎপরতা ছিল। এখানে ছিল একটা ব্রাহ্ম মন্দির। যদুনাথ সরকারের সাহিত্য ও শিল্প বোধ ছিল। এক সময় তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর বেশ কিছু

www.pathagar.com

প্রবন্ধ লেখেন। এর ফলে যদুনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও গড়ে ওঠে বিশেষ হৃদ্যতা। রবীন্দ্রনাথ যদুনাথ সরকারের নামে একটি বই উৎসর্গ করেন।

যদুনাথ সরকারের পিতা রাজকুমার সরকার যথেষ্ট পড়াশুনা করতেন। রাজশাহীর সরকার বাড়িতে ছিল একটা বিরাট লাইব্রেরি। সারা বাংলায় সে সময়, শুনেছি, এরকম লাইব্রেরি খুব কম বাড়িতেই ছিল। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় কোন কারণে একবার সরকার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে অত বই দেখে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, অত বই পড়া কি কখনও সম্ভব ! পরে একজন বই পড়ুয়া লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি আমাকে বলেন, সব বইয়ের সব অংশ পড়বার দরকার পড়েনা। কারণ, একই কথা লেখা থাকে অনেক বইতে। বই পড়বার সময়, কোন বইতে যে নতুন কথাটুকু থাকে, তা বেছে নিয়ে পড়লেই পড়া হয়। অনেক জমিদার বাড়িতে বই থাকে কেবল জাঁক দেখাবার জন্যে। এটা হলো একটা বাহ্য আড়ম্বরের নির্দশন (Conspicuous Consumption)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজশাহীতে এসেছেন একাধিকবার। কখনো কেবল বেড়াতে, কখনো বা তাঁর জমিদারী সংক্রান্ত কাজে। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার আসেন রাজশাহীতে। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩১ বৎসর। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত তখন সম্ভবত ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি গ্রহণ করেন তাঁর আতিথ্য। রাজশাহী এসোসিয়েশনের সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন তাঁর "শিক্ষার হেরফের" নামক প্রবন্ধ। এ সময় তিনি তার "পঞ্চভূতের ডায়রী" নামক বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা রচনা করেন। বইটি পরে তিনি উৎসর্গ করেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র নাথকে। রবীন্দ্রনাথ রামপুর-বোয়ালিয়াতে বসে লেখেন তাঁর "সুখ" নামক বিখ্যাত কবিতাঃ

আজি মেঘ মুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধুর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে .....

কবিতাটি যথেষ্ট বড়। কবি এই কবিতায় সিদ্ধান্তে এসেছেনঃ

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা। মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু-আননের

www.pathagar.com

হাসির মতন, পরিব্যাপ্ত, বিকশিত,
উন্মুখ অধর ধরি চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে বাক্যহীন
শৈশব বিশ্বাসে চির রাত্রি চিরদিন।

গোটা কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে কবি মনের একটা ভাবনা বিহীন প্রশান্ত মনের সহজ অনুভব। রাজশাহী পরিবেশ সে সময় ছিল খুবই শান্ত। এই শান্ত পরিবেশই সম্ভবত কবিকে তাঁর 'সুখ' কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার রাজশাহী আসেন ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। এবারেও তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন বন্ধু লোকেন পালিতের। তিনি এবার রামপুর-বোয়ালিয়াতে বসে লেখেন তাঁর আর একটি বিখ্যাত কবিতা, "এবার ফিরাও মোরে"। কবিতাটি তিনি নাকি লিখেছিলেন পত্রিকায় আফ্রিকার 'জুলু'দের উপর সাদা মানুষের অত্যাচারের কথা পড়ে। এ দেশের মানুষের দুঃখের কথা ভেবে নয় ! রবীন্দ্রনাথ বরেন্দ্রর লোক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের দাদু দারকানাথ ঠাকুর কিনে যান উত্তরবঙ্গে বিস্তীর্ণ জমিদারী। এর একটি অংশ রবীন্দ্রনাথ পান উত্তরাধিকার সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ছিল নওগাঁর পতিসরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতে পতিসরে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেন। পতিসরের মহর্ষী হাই স্কুল নওগাঁ-র তৃতীয় হাই স্কুল। রবীন্দ্রনাথ পতিসরে "কৃষি ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাঙ্ক খোলেন তাঁর কিছু সুহৃদের কাছ থেকে শতকরা ৮ টাকা সুদে টাকা ধার করে। এই ব্যাঙ্ক থেকে কৃষক প্রজাদের টাকা ধার দেওয়া হতো শতকরা ১২ টাকা সুদে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের ১,০৮,০০০ টাকা এই ব্যাঙ্কে রাখেন শান্তি নিকেতন বিদ্যালয়ের নামে। শান্তি নিকেতন বিদ্যালয় এবং পরে বিশ্বভারতী এই ব্যাঙ্ক থেকে সুদ হিসাবে প্রতি বছর পেতে থাকে ৮ হাজার করে টাকা। রবীন্দ্রনাথ পতিসরে যে হাই স্কুল স্থাপন করেন, তার জন্য তিনি কৃষক প্রজাদের প্রতি টাকায় তিন পয়সা করে বাড়তি কর ধার্য করেন। সে সময় ৬৪ পয়সায় হতো এক টাকা। অর্থাৎ প্রজাদের শিক্ষা বাবদ রবীন্দ্রনাথ খাজনা বাড়িয়ে ছিলেন শতকরা ৪ দশমিক ৬৯ ভাগ। যা সে সময় আর কোন জমিদার করেছেন বলে জানি না। পতিসরে গরীব প্রজারাই যুগিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব ভ্রমণের খরচ। এক একবার পুণ্যাহ পালনের সময় কৃষক প্রজাদের অনেক নজরানা দিতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো পতিসর ভ্রমণ করেন এবং পুণ্যাহ পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছু দিন পতিসরে এসে বাস করেন। তিনি এর আগেও পতিসরে অনেকবার এসেছেন এবং দীর্ঘ সময় থেকেছেন। পিতার হয়ে জমিদারীর কাজকর্ম তদারক করেছেন। পতিসর ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের জমিদারী। শাহজাদপুর ছিল অবণীন্দ্রনাথের এবং শিলাইদহ ছিল গগনেন্দ্রনাথের জমিদারী। অবণীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের হয়ে রবীন্দ্রনাথ একসময় এই দুই জমিদারীও দেখাশুনা করতেন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ পতিসরে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিরাট ভবনের নামকরণ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নামে। এখানে বাণিজ্য অনুষদের ক্লাশ

www.pathagar.com

হয়। যুক্তি হিসাবে বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থারও পথিকৃৎ। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যায়, দেশে Rural Indebetedness আইন পাস হবার পর পতিসরের কৃষি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। কারণ, কৃষক-প্রজার কাছ থেকে আর আগের মতো ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব হয়না। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ মারা যায় পতিসরের কৃষি ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার ফলে। অর্থাৎ এই ব্যাঙ্কের ইতিহাস খুব গৌরবোজ্জল নয়। একে একটা আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যদিও এখন সেইরকমই একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা গান "আমার সোনার বাংলা" ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করা হয়েছে। গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের সময়। সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলতে যেয়ে মুজাফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথা "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি"- তে এক জায়গায় বলেছেন ঃ "পূর্ব বঙ্গের বড় বড় হিন্দু জমিদাররা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধ-আন্দোলনে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আন্দোলন জোরদার হওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। জমিদাররা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, মুসলিম কৃষক-প্রজা প্রধান পূর্ববঙ্গে না জমিদারী প্রথা বিলোপ হয়ে যায়।"

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর ভারতের তখনকার গর্ভনর লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে ভাগ করেন। যা "বঙ্গভঙ্গ" নামে পরিচিত। এর ফলে পূর্ববঙ্গের সব কটি জেল দার্জিলিং কে বাদ দিয়ে সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং তখনকার কমিশনার শাসিত আসাম নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি ভিন্ন প্রদেশ গঠিত হয়। এর বিরুদ্ধে বাঙ্গালী হিন্দুদের পক্ষ থেকে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়। বৃটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লী আসেন দরবার করতে। তিনি ১২ ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। রবীন্দ্রনাথ খুশী হয়ে লেখেন "জন গণ মনো অধিনায়ক জয় হে" গান। যা এখন ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত।

রবীন্দ্রনাথ পতিসরে বসে অনেক কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে একটিতে বলা হয়েছেঃ

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের তরে দীর্ঘশ্বাস!
হাসি মুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস ॥

কবিতাটি পড়ে সবারই মনে হতে পারে, এটা খুবই বিপ্লবী কবিতা। কিন্তু পতিসরের জমিদারীতে রায়তের কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারেও সুদ নেওয়া হতো। জমিদার রবীন্দ্রনাথ আর কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল আসমান-জমিন ফারাক।

বরেন্দ্র জমিদাররা এরকম কোন কবিতা না লিখলেও রায়তের সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তাঁরা করেছেন মানবিক ব্যবহার। পুঠিয়ার এক রাণী দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সবকটি গোলার সমস্ত ধানই রায়তের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন, বিনা মূল্যে। তুলনামূলকভাবে বরেন্দ্রভূমির জমিদাররা সে যুগে দেখিয়েছেন অনেক বেশী প্রজা হিতৈষণা। সাধারণভাবে তারা ছিলেন মাটির অনেক কাছাকাছি।

সংস্কৃতির একটা উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হলো সঙ্গীত। রাজশাহীতে জমিদারদের মধ্যে গান-বাজনার বেশ চর্চা ছিল। তানোরের জমিদার বাবু ব্রজেন্দ্র মোহন মৈত্রের পুত্র রাধিকা মোহন মৈত্র সরোদ বাজিয়ে সারাদেশেই খুব নাম করেন। রাজশাহী শহরে বিভিন্ন জমিদার বাড়ির ছেলেরা মিলে "আষাঢ়ে ক্লাব" নামে একটা চক্র গড়েন। প্রতিবছর আষাঢ় মাসে এই চক্রের পক্ষ থেকে একটা বড় রকমের গানের জলসা করা হতো। যাতে প্রাধান্য পেত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি। বাংলা গান বিশেষ করা হতো না। গানের ভাষা প্রধানত হতো হিন্দী। বাজনার মধ্যে প্রাধান্য পেত সেতার, সরোদ এবং এসরাজ। উত্তর ভারত এবং কলকাতা থেকে অনেক বড় বড় মুসলমান ওস্তাদ আসতেন আষাঢ়ে ক্লাবের আসরে। এঁদের ছিল বিশেষ কদর। বাংলাগান যা হতো, তাও ঐ যাকে বলে "রাগ-প্রধান", তাই দেশজ গানকে গান বলেই ধরা হতো না যেন ।

রাজশাহীর মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীত চর্চা একেবারেই ছিল না। এর একটা বড় কারণ হলো ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। পাড়াগাঁয়ে সাধারণ মুসলমানের মধ্যে পল্লী সঙ্গীতের বেশ কিছু প্রচলন ছিল। এদেশে মুসলমান সমাজে গানকে প্রথম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন আব্বাস উদ্দীন, ইসলামী গান গেয়ে। পরে তার গাওয়া পল্লী সঙ্গীত আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

আব্বাস উদ্দিন কয়েকবার রাজশাহী এসেছেন, গান শোনাতে। তাঁর গানের শ্রোতা প্রধানত ছিলেন মুসলিম মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনসমাজ। ছাত্র জীবনে আব্বাস উদ্দীন কয়েক মাস রাজশাহী সরকারী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ "রাজশাহী কলেজে চারমাস বি,এ, থার্ডইয়ারে পড়েছিলাম। ফুটবল খেলা, গানবাজনা, লেখাপড়া তিনই সমানভাবে চালিয়েছিলাম।.....

রাজশাহীতে জলবায়ু সইলোনা। গ্রীষ্মের বন্ধে এসে দীর্ঘ এক মাস রেমিটেন্ট ফিভারে ভুগলাম। আর আব্বা আমাকে রাজশাহী যেতে দিলেননা। ভর্তি হলাম আবার কুচবিহারে।" আব্বাসের গাওয়া পল্লী সঙ্গীত বাংলার অনেক অঞ্চলের মতো এক সময় রাজশাহীতেও পথে ঘাটে সাধারণ লেখকের মুখেমুখে ফিরতো ঃ

ওকি গাড়িওয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়ারে।
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর মুইরা রয় রে।
ওকি গাড়িওয়াল ভাই

www.pathagar.com

হাঁকাও গাড়ী চিলমারীর বন্দরে।

গানটা অবশ্য মেয়েরা গাইতোনা। গাইতো পুরুষ মানুষেই। যাদের মনে নারীর দুঃখের অনুভব থাকবার কথা নয়। কিন্তু গান, গান। এখন লোকসঙ্গীতকে যেভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়, তখন কিন্তু তা দেওয়া হতোনা। "ভদ্রলোকে" এরকম গানকে অবজ্ঞাই করতেন "চাষা-ভূষার" গান হিসাবে। আব্বাস প্রথম এই চাষা-ভূষার সঙ্গীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করে তোলেন।

ইংরাজ আমলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল সাহিত্য চর্চা। নাটোরের বড়াইগ্রাম থানার বিখ্যাত বিশী পরিবারের সন্তান প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লিখিত নাটক "ঋণংকৃত্বা" (১৯৩৫) এবং "ঘৃতং পিবেৎ" (১৯৩৬) নাম করেছিল। প্রমথনাথ বিশী লেখাপড়া করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্র সাহিত্যে ছিল তাঁর আগাধ পান্ডিত্য। তবে প্রমথ বিশী নাটোর অথবা রাজশাহীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কোন ভূমিকা পালন করেননি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্লনাথ বিশী থাকতেন রাজশাহীতে। ভ্রাতার সাহিত্য প্রতিভা তাঁর ছিলনা। কিন্তু তিনি মজলিশি গল্পের জন্যে রাজশাহীতে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি খুব চুটকি, হাসির গল্প বলে লোক হাসাতে পারতেন। তিনি পাকিস্তান আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিসার হিসাবে কাজ করতেন এবং জেলার একজন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। প্রমথ বিশীর নাটক অবশ্য রাজশাহীতে অভিনীত হয়েছিল।

ইংরাজ আমলে সাহিত্যচর্চা বলে রাজশাহীর মুসলমান সমাজে বিশেষকিছু ছিল না। এ সময় কেবল মির্জা মৌঃ মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯৩০) চমৎকার সাবলীল সাধু বাংলা গদ্য লিখেছেন। তিনি "ইসলাম তত্ত্ব" এবং "দুগ্ধ সরোব" নামে দুখানা বই লেখেন এবং বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইমাম আল্ গাজ্জালী-র "কিমিয়া-এ সাহাদত" ফারসী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন "সৌভাগ্যের স্পর্শমনি" নামে। তিনি কেবল ধর্ম বিষয়ে গ্রন্থরচনা করেছেন। মুসলমান সমাজ এ সময় তার আপন ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিকেই বিশেষভাবে জানতে চেয়েছে। ধর্মের মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে চেয়েছে আপন অস্তিত্বের অর্থ। রস সাহিত্য চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। ইউসুফ আলী সাহেব "নূর-উল-ইমাম" নামে একটি মাসিক পত্র (১৯০০) প্রকাশ করেছিলেন। যা চার সংখ্যা প্রকাশের পর তার পক্ষে আর প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইউসুফ আলী সাহেবের পুত্র, মির্জা ইয়াকুব আলী, "পল্লীবান্ধব" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯২৬)। পত্রিকাটি অনেকদিন চলেছিল। তবে এতে ভাল লেখা কিছু থাকতোনা। একটা বড় অংশ জুড়েই থাকতো কেবল নিলাম-ইসতেহার। যেমন থাকতো সে সময়ের হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকায়। মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেবের গদ্য কেমন ছিল, তার একটু নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে ঃ

".....বিশ্বজগৎ এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার সৃষ্টি। যে পদার্থকে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারেনা।

www.pathagar.com

.....যদি কেহ বহু চিন্তার পর এই কথা বলে যে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল, তবে সে নিশ্চয় ভুল করিবে। .....এক অন্ধ ব্যক্তির সহিত ঐ ব্যক্তির তুলনা করা যাইতে পারে। মনে কর, সে অন্ধ কোন এক গৃহে প্রবেশ করিল, তথায় দ্রব্যজাত বাস্তবিক পূর্বাবধি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজান আছে, তথাপী সে আপন অন্ধত্ব হেতু স্বীয় পথ দেখিতে না পাইয়া কোন পদার্থে আঘাত খাইয়া আছাড়াইয়া পড়িয়া গেল এবং কহিতে লাগিল– 'এ পদার্থ কেন রাস্তায় পড়িয়া আছে?' বাস্তবিক তথায় সকল দ্রব্য যথাযথ স্থানে ছিল, কিছুই পথের উপর ছিল না।....."

ইংরাজ আমলে বাংলার সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর। আসলে বাংলায় তখন বলতে গেলে কলকাতাই ছিল একমাত্র শহর। আর অন্য সব শহর, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, ছিল 'পাড়াগেঁয়ে শহর।' এসব পাড়াগেঁয়ে শহর থেকে কৃতিবানরা সকলেই যেয়ে ভীড় জমাতেন কলকাতায়। কলকাতার বাইরে যেসব শহরে ঐ সময় কিছুটা স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি চর্চার চেষ্টা চলেছে, তার মধ্যে রাজশাহী শহরের নাম নিশ্চয় করা যেতে পারে।

কারণ, রাজশাহী শহরে সে সময় স্থাপিত হতে পেরেছিল একটা বিখ্যাত কলেজ। কান্তকবি রজনীকান্ত রাজশাহীতে বাস করে বেঁধেছেন ও সুর দিয়েছেন গানে, যা একসময় সারাদেশেই হয়েছে গীত। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রাজশাহী থেকেই করেছেন খুব উন্নত মানের ইতিহাস গবেষণা। কুমার শরৎ কুমার রায় গড়ে তুলেছেন একটা উল্লেখযোগ্য পুরাতাত্ত্বিক জাদুঘর, যাতে পাল যুগের ভাস্কর্যের আছে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

ইংরাজ আমলে বিশেষভাবে গড়ে ওঠে বাংলা গদ্য। ভাষা বিকাশে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা অনেকেই হলেন জমিদার বাড়ির সন্তান। যেমন, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। অনেকে ছিলেন বড় চাকুরে, যেমন বঙ্কিম। ভাষা-সাহিত্য বিকাশে মুসলমানদের দান এই সময়ে হলো গৌণ। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, পরবর্তীকালে বাংলাভাষী মুসলমানরাই করেছেন "রাষ্ট্র-ভাষা" আন্দোলন। আর শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র; যার রাষ্ট্র ভাষা হয়েছে বাংলা। রাজশাহীতে এখন মুসলমানরাই বয়ে নিয়ে চলেছেন বিগত দিনের রাজশাহীতে উদ্ভুত সংস্কৃতির সদর্থক পরম্পরা।

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ
সে সময়ের রাজশাহীর সমাজ জীবন

শহর আর গ্রামের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য সব দেশেই আছে। বাংলার মুসলমান প্রধানত ছিলো পল্লীবাসী ও কৃষিজীবী। তাদের মধ্যে চাকুরিজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কার্যত ছিল অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে শহরে হিন্দুরাই অধিক হারে বাস করতো। তাঁরা ছিলো চাকুরিজীবী। সরকারী দফতরের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁরা সে কারণে ছিলো অধিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁদের পরিচিতি ছিল "ভদ্রলোক" হিসাবে। শহরে হিন্দুরাই ছিলো উকিল, মোক্তার, ডাক্তার বড় জমিদার অথবা ভূসম্পত্তির মালিক। শহরবাসী হিন্দুরা চাইতো সব কিছুতে কলকাতার অনুকরণ করতে। কলকাতার জীবন ছিল তাদের জীবনাদর্শ।

রাজশাহী একটা বড় শহর ছিল না। কিন্তু এই ছোট শহরেরও ছিল একাধিক গণিকাপল্লী। ঠিক শহরের মাঝখানেই ছিল একটা বড় গণিকালয়। এখন এলাকাটাকে বলে "গণকপাড়া"। গণকপাড়া সেই অতীতের গণিকাপাড়ার স্মৃতিবহন করছে। কলকাতায় যেমন একসময় চলেছিল, "নববাবু বিলাস" (১৮২৩),এখানেও তার কিছুটার উদ্ভব ঘটেছিল। "নববাবু বিলাস" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি উপন্যাস। একে ধরা হয় বাংলাভাষায় লিখিত উপন্যাস সমূহের মধ্যে দ্বিতীয়। এতে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ জীবনের কিছু বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। পাওয়া যায় যৌন বিশৃঙ্খলার বিশেষ নিদর্শন। হিন্দু সমাজে সে যুগে যারাই কিছুটা বিত্তবান হতেন এবং শহরে বাস করতেন, তাঁদেরই থাকতো রক্ষিতা। তাদের কাছে গণিকালয়ে গমন ছিল একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। অনেকে রক্ষিতা রাখা নিয়ে গৌরব করতেন এবং অন্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন। লাম্পাট্য সে সময় সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে ছিল শ্লাঘারই বিষয়।

সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "সেকালের স্মৃতি" বইতে রাজশাহী সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। যা পড়লে সেকালের রাজশাহী সম্বন্ধে বহু কিছু অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথার এক জায়গায় লিখেছেন ঃ "রাজশাহী বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজের প্রধান দূর্গ। ইহা বরেন্দ্রভূমির শীর্ষস্থান। যেস্থলে এত অধিক সংখ্যক খাঁটি হিন্দুর বাস, সেখানে বারঙ্গনার সংখ্যা কেন যে এত অধিক, তাহা কোন দিন বুঝিতে পারিনাই। সুরসিক রজনীবাবু (কান্ত কবি রজনীকান্ত) একদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "উহারা হিন্দু সমাজের সেফটি ভালব' ।..... "

সে যুগে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোককেও মদ খেয়ে পথে মাতলামী করতে দেখা যেত। এঁদের অনেকে মনে করতেন, মদ্যপান আদৌ খারাপ কিছু নয়। কারণ, যে ইংরেজ আমাদের শাসন করে চলেছে, তারাও মদ্যপান করে। শহরে একটি ভাল বিলাতি মদের

www.pathagar.com

দোকান ছিল। হিন্দু উকিলরা সাধারণত কমবেশী সকলেই পানাসক্ত ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, মদ উকিলী যুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তা করে। অনেকে গর্ব করতেন, মদ খেলেও তাঁরা মাতাল হন না। যথাযথভাবে আর্জি লিখতে পারেন। সওয়াল-জবাব করতে পারেন। রাজশাহী শহরে একাধিক গাঁজা এবং আফিম-এর দোকান ছিল। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে অফিম খাবার চল ছিল। আফিম সাধারণত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করা হতো। গাঁজা ছিল সাধক এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের নেশা। দুর্গাপুজার সময় অনেক হিন্দু বাড়িতে মেয়েরাও সিদ্ধির সরবত খেতো। পুজা-পার্বণে হিন্দু সমাজে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা।

কিন্তু হিন্দু সমাজে এর পাশাপাশি নব জাগরণেরও সূত্রপাত ঘটছিল। রাজশাহী হয়ে উঠেছিল রাজনীতির বিশেষ কেন্দ্র। এ শহরে যত হিন্দু তরুণ সে সময় রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেন, তার সংখ্যা দেশের অন্যান্য জেলা থেকে কম ছিল না। এক্ষেত্রে রাজশাহী বেশ কিছুটা গৌরব করতেই পারে।

রাজশাহী শহরে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথ নাথ ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে অর্থ প্রদান করেন। এরকম বালিকা বিদ্যালয় কম জেলাতেই ছিল। এর ফলে নারী শিক্ষার দিক থেকে রাজশাহীর যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়।

রাজশাহী সরকারী কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে । এই কলেজে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও পড়বার সুযোগ লাভ করে। প্রথমে মাত্র চারজন ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে দুইজন হিন্দু, একজন খ্রিষ্টান আর একজন মুসলমান। মুসলমান সমাজ থেকে এক জন মুসলমান মেয়ের ছেলেদের সঙ্গে পড়া নিয়ে বিরাট আপত্তি ওঠে। কিন্তু যেহেতু মেয়েটির পিতা এক সময় ছিলেন কোন বিদ্যালয়ের আরবী-ফারসীর শিক্ষক ও মৌলানা হিসাবে শ্রদ্ধেয়, তাই এই প্রতিবাদ মেয়েটির কলেজে পড়া বন্ধ করতে পারে না। সাধারণভাবে হিন্দু সমাজও যে এভাবে ছেলে-মেয়েদের একত্রে পড়বার পক্ষে ছিলো, তা নয়। সাধারণভাবেই মনে করা হতো, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে দুশ্চরিত্রা হয়। স্বামীকে অবজ্ঞা করতে শেখে। অবশ্য সব দেশেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এক সময় থেকেছে নানা প্রতিবন্ধকতা। বিলাতে প্রথম লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে মেয়েরা পড়বার সুযোগ পায় ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে । এর আগে বিলাতের কোন ইউনিভার্সিটিতেই মেয়েদের পড়বার অধিকার ছিল না। বিলাতের অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা সাতশত বছর মেয়েরা ঢোকার কোন অনুমতি পায়নি। রাজশাহী শহরে তাই কলেজে সহ-শিক্ষার (Co-Education) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াকে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে করার কিছুই নেই। কিন্তু এই বিরূপতা কলেজে মেয়েদের পড়া বন্ধ করতে পারেনি। তখন সারা শহরে ছিল একটাই কলেজ।

কলেজে ছাত্রীদের খুব নিয়ম মেনে চলতে হতো। তাদের আটকা থাকতে হতো মেয়েদের কমন রুমে। শিক্ষক তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন ক্লাশে। আবার ক্লাশ থেকে নিয়ে আসতেন মেয়েদের কমনরুমে। কোন মেয়ের কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলার অধিকার

www.pathagar.com

ছিলনা। রাজশাহী কলেজ দেশের মধ্যে একটা নামকরা কলেজ হতে পেরেছিল। এর অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল, এই কলেজে এসেছিলেন একাধিক সুযোগ্য সাহেব প্রিন্সিপাল। যেমন, এফ. টি. ডাউডিং (১৮৭৯), এ. সি. এডোয়ার্ড (১৮৮০-১৮৮৯), ডব্লু.বি.লিভিংস্টোন (১৮৮৭-১৮৯৭). টি. টি. উইলিয়ামস (১৯২৬-১৯৩০), ডাঃ ডাব্লু.এ.জেঙ্কিন্স (১৯৯৩২-১৯৩৩)। এঁরা গড়ে তুলেছিলেন কলেজকে। গড়ে তুলেছিলেন একটা সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। কলেজের অফিস ভবনটি দেখতে সুন্দর। এর স্থাপত্য বিলাতের। এক সময় ভবনটির ছাদে ছিল গ্রীক বিদ্যাদেবী মিনার্ভার মূর্তি। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে স্যাডলার কমিশন রাজশাহী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার সুপারিশ করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করবার দাবি প্রবল হয়ে ওঠায় ঢাকায় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। রাজশাহীর কথা চাপা পড়ে। পাকিস্তান হবার পর, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ডঃ ইতরাৎ হোসেন জুবেরী আসেন রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে। তিনি ছিলেন ভারতের উত্তর প্রদেশের লোক। উর্দু ভাষী। ইংরেজী ভাষাসাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। তিনি একসময় কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ)-এর প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ মহলে তাঁর একটা বড় রকমের প্রভাব ছিল। তিনি রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসবার পর রাজশাহীতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার দাবি ওঠান এবং সফল হন। প্রথমে রাজশাহী সরকারী কলেজকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কথা হয়। কিন্তু পরে একটা স্বতন্ত্র জায়গায় পৃথকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে রাজশাহী কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন করেছিল। এদেশে ছাত্র সমাজ নানা দাবি নিয়ে অনেক আন্দোলন করেছে। তারা আন্দোলন করেছে বলে অনেক কিছু হতে পেরেছে। এসেছে সমাজ জীবনে পরিবর্তন। রাজনীতিতে এসেছে নানা মতাদর্শ। এতে অনেকের পড়াশুনার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়েছে সামাজিকভাবে। অতীতে ছাত্ররাজনীতি ছিল আদর্শভিত্তিক। কেবলই ক্ষমতাকেন্দ্রিক, অথবা ক্ষমতা লাভের উচ্চাভিলাষভিত্তিক নয়। যেসব ছাত্র রাজনীতি করতো, তারা বিশ্বের নানা বিষয়ে খোঁজ রাখবার চেষ্টা করতো। বুঝবার চেষ্টা করত দেশ ও দশের সমস্যা ও প্রয়োজন ।

ইংরাজ আমলে রাজশাহী কলেজে বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক এসেছেন। রাজশাহী কলেজ কেবল শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেই দেশে খ্যাতিমান ছিলনা, সংস্কৃতি চর্চার জন্যেও পেতে পেরেছিল খ্যাতি। রাজশাহীবাসী এই সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ থেকে একসময় যথেষ্ট আনন্দলাভ করতে পেরেছে। এরফলে শহরের সংস্কৃতি চর্চার মানের হতে পেরেছিল যথেষ্ট উন্নতি। রাজশাহীর সমাজজীবন নিয়ে আলোচনা করতে হলে তাই রাজশাহী কলেজের কথা বিশেষভাবেই আসে। রাজশাহী শহরের ইতিহাস, রাজশাহী সরকারী কলেজের ইতিহাসের সঙ্গে নানাভাবেই গ্রথিত।

শহরে একাধিক নামকরা কবিরাজ ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে জানতেন গর্ভপাতের ঔষধ। এদের কাছে একারণে বহুলোকের ভীড় হতো। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ

www.pathagar.com

প্রচলিত ছিলনা। বিধবাদের অনেক কষ্টে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে বাস করতো হতো। কেউ কেউ হতো বিপথগামী। এ যুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু বিধবার দুঃখ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে সাধারণভাবে তা কার্যকরী হতে পারেনি। বিধবা-বিবাহ হিন্দু সমাজে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ থেকেই যায়। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এরকম বিবাহকে বলা হতো সাঙ্গা । নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মেয়েরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতো। কারণ, তারা খেটে খেতে পারতো। তাদের স্বাধীনতার একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল।

রাজশাহীতে একসময় শিক্ষিত হিন্দুদের একাংশের উপর ব্রাহ্মমতবাদের প্রভাব পড়ে। ব্রাহ্ম উপসনালয় স্থাপিত হয়। একটি ব্রাহ্ম মন্দির বা উপসনালয় ছিল আমাদের বাড়ির খুব সন্নিকটে। সেটা, কেন জানি না, পরে একটা পাঠশালায় পরিণত হয়। আমি কিছুদিন সেই পাঠশালায় পড়েছিলাম। সেখানে আমরা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়তাম। আমরা পড়তাম একটা বড় হলঘরের মধ্যে। ঐ হলঘরের উত্তরপাশে ছিল একটা বেদি। শুনেছিলাম সেখানে মোমাবাতি জ্বালিয়ে আধা অন্ধকার ঘরে পরম ব্রহ্মের ধ্যান করা হতো। মুসলমানদের ব্রাহ্মদের প্রতি বেশ কিছুটা শ্রদ্ধা ছিল। কারণ, ব্রাহ্মরা মুসলমানদের মতো একেশ্বরবাদী এবং মূর্তি পুজার বিরোধী।

কিন্তু গোঁড়া হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মদের নানাভাবেই সমালোচনা করা হতো। তার মধ্যে একটা বিষয় ছিল, ব্রাহ্মসমাজে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা। পছন্দ মতো বিয়ে করবার অধিকার। বলা হতো, ব্রাহ্মসমাজ এভাবে মেয়েদের অসতী করে তুলছে। সমাজ জীবনের মূল ভিত্তিকেই নষ্ট করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৯, ১৫ই চৈত্র ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে তাঁর "সোনারতরী" বইয়ের 'ঝুলন' নামক কবিতাটি নাকি আবৃত্তি করেন। যার কিছু অংশ এইরকমঃ

দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্।
এ মহাসাগরে তুফান তোল্।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার, ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয় রোল।
বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার কী হিল্লোল।
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কী কল্লোল !
উড়ে কুন্তল . উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল,
বাজে কঙ্কন বাজে কিঙ্কিনী - মত্তরোল !
দে দোল্ দোল ॥
আয়রে ঝঞ্ঝা পরান বধূর

www.pathagar.com

আবরণ রাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-বসন খোল।
দে দোল্ দোল্ ॥

এরকম কবিতাকে তখনকার দিনে খুব শ্লীল ভাবা সম্ভব ছিলনা। রাজশাহীর হিন্দু সমাজে ব্রাহ্ম মতবাদ যাতে বিস্তার লাভ করতে না পারে, সেজন্য বাংলা ১২৬৭ অব্দে বোয়ালিয়া ধর্মসভা থেকে প্রথমে "হিন্দু রঞ্জিকা" নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয় (১৮৬৬ খ্রিঃ) । পরে পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল, হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্ম মতবাদের বিস্তার রোধ করা। সাপ্তাহিক হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকার কণ্ঠে এই সংস্কৃত শ্লোকটি মুদ্রিত থাকতো ঃ

ধর্মেনৈব জগৎ সুরক্ষিত মিদং ধর্মো ধরা ধারকঃ!
ধর্মাবস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তেস্মৈ নমঃ ॥

ধর্মের দ্বারা জগৎ সুরক্ষিত। এই ধর্ম জগতকে ধারণ করে আছে। ধর্ম ছাড়া এই পৃথিবীতে মহৎ কোন জিনিস নেই। তাই ধর্মকে নমস্কার ।

পত্রিকাটি অনেকদিন চলেছিল। পরে এতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু গোঁড়া প্রবন্ধ ছাপা হতো আর ছাপা হতো নিলাম ইস্তেহার । পত্রিকাটির কোন মান আর ছিলনা। আধুনিকমনা হিন্দু তরুণরা হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকাকে ঠাট্টা করে বলত "হিন্দু গঞ্জিকা"। হিন্দু রঞ্জিকা পত্রিকা যে প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশিত হতো তার অর্থ প্রদান করেছিলেন নওগাঁর ধুবলহাটির জমিদার । প্রেসটির নাম ছিল "তমোঘ্ন"। অর্থাৎ, অন্ধকারের বিঘ্ন সরিয়ে আলোক প্রদানকারী।

বোয়ালিয়া ধর্মসভা এখনও আছে। তবে এখন একে বলে রাজশাহী ধর্মসভা। এই ধর্মসভা বাংলাদেশ হবার পর আবার অনেক সক্রিয় রূপধারণ করেছে। এর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, মনে হয়, স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে "হিন্দুত্বের" চেতনা বৃদ্ধি। এটি এখন কেবল ধর্মচর্চার কেন্দ্র হয়ে নেই। হয়ে উঠেছে, হিন্দু জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র।

ইংরাজ আমলে রাজশাহী শহরের সব ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো প্রধানত মাড়োয়াড়ীদের দ্বারা। বর্তমান ভারতের রাজস্থান প্রদেশের একটা অংশকে বলা হতো মাড়োয়াড়। মাড়োয়াড়ীরা হলো এই মাড়োয়াড় অঞ্চলের লোক। এরা জৈন ধর্মাবলম্বী। জৈন ধর্মে জমি চাষকরা নিষেধ। এরা তাই ব্যবসা, ও সুদের কারবার করে। বিখ্যাত জগৎশেঠ ছিলেন মাড়োয়াড়ী এবং জৈন ধর্মালম্বী । নবাবী আমল থেকেই মাড়োয়াড়ীরা এদেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রথমে ইংরেজ ও স্কচরা বাংলায় পাটের ব্যবসা আরম্ভ করে । কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পাটের ব্যবসা বিশেষভাবে চলে আসে মাড়োয়াড়ীদের হাতে। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে সাহারা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। রাজশাহীতে মহিনী সা বলে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এসেছিলেন ঢাকার সাভার অঞ্চল থেকে। কিন্তু

www.pathagar.com

অধিকাংশ হিন্দু ছিলেন ব্যবসাবিমুখ। তাঁরা চাকুরী করে কিম্বা ওকালতি করে টাকা করতে পারলে চাইতেন জমি কিনে জমিদার হতে। ব্যবসাকে তাঁরা মনে করতেন সম্মানের পরিপন্থী।

সেসময় রাজশাহীতে বসবাসকারী অনেক জমিদারের হাতি ছিল। হাতি ছিল সম্মানের প্রতীক। হাতির গায়ে পিতলের ঘন্টা বাঁধা থাকতো । হাতি পথ চলবার সময় টিনটিন করে বাজতো ঘন্টা। দুর থেকে শুনে বোঝা যেত, পথে কোন জমিদারের হাতি আসছে।

কান্ত কবি রজনীকান্ত তাঁর "জমিদার" নামক কবিতায় বলেছেন ঃ

করে প্রজার রক্ত শোষণ,
করি মোসাহেবের দল পোষণ :
আর প্রজার বিচার আমলারা করে,
কোথায় আপীল মোশন ?
করি হাতীতে চড়িয়া ভিক্ষে,
কেহ না দিলে পায় সে শিক্ষে,
তারা ভিক্ষে-খরচা দিতে জমি ছেড়ে
উঠেছে অন্তরীক্ষে।

রাজশাহীতে অনেক মিষ্টান্নের দোকান ছিল। এসব দোকান ছিল প্রধানত উড়ে (উড়িষ্যা থেকে আগত) ঠাকুরদের। এরা ছানার মিষ্টি খুব ভাল বানত। রসগোল্লা, পানতোয়া, চমচম,রাঘবসই। মিষ্টির মধ্যে রাজশাহীর রাঘবসই খুব বিখ্যাত ছিল। এখন যেমন মুসলমানরা শহরে ছানার মিষ্টি বানিয়ে বিক্রি করে, আগে তা ছিল না। এ বিষয় এসেছে একটা বড় রকমের পরিবর্তন। মুসলমানরা আগে ছানার মিষ্টি খেলেও খেতো কম। তাঁরা মিষ্টি বলতে বুঝতো নানা রকমের হালুয়া। অনেক রকমের হালুয়া খাবার চল ছিল মুসলমান সমাজে। যা ছিল হিন্দুদের কাছে অজ্ঞাত। হিন্দু এবং মুসলমানের খাদ্য সংস্কৃতিতে পার্থক্য ছিল। অবশ্য ভাত মাছ ছিল সবারই সাধারণ খাদ্য। কিন্তু মুসলমানরা মাংস বেশি খেতো। মাংস রান্নার বিবিধ রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে। হিন্দুরা পাঁঠার মাংস ছাড়া আর কোন মাংস খেতো না। খাসি ও মুরগির মাংস তখনও হিন্দু সমাজে ছিল অচল। মুসলমানরা রান্নায় পেঁয়াজ, রসুন ব্যবহার করতো। কিন্তু হিন্দুরা করতো না।

হিন্দু বিধবাদের জীবন ছিল খুবই কষ্টের। তাঁরা ভাল কিছু খাবার অধিকারিনী ছিলো না। তাঁদের সাধারণত খেতে হতো আতপ চালের ভাত এবং কাঁচকলা সিদ্ধ। অনেক সংস্কার প্রচলিত ছিল হিন্দু সমাজে। যা এখন অদ্ভুত মনে হয়। যেমন হিন্দু সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। রাজশাহীর এক বিশিষ্ট হিন্দু পরিবারের সন্তানের কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর পিতার অমতে বিলাতে যান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। এ কারণে, বহুদিন তিনি ছিলেন রাজশাহীর হিন্দু সমাজে একঘরে হয়ে। সেটা ১৯৩০ এর দশকের ঘটনা। আমার বয়স তখন বেশী নয়। আমদের বাসায় একদিন তিনি এসেছিলেন কোন কারণে। আমার পিতার কাছে গল্পটা

www.pathagar.com

শুনেছিলাম।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বহু বিষয় পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যের কারণ যেমন ছিল অর্থনৈতিক, তেমনি আবার ছিল ধর্মবিশ্বাসজনিত। হিন্দু-মুসলমান এক ভাষায় কথা বলেছে। পাশাপাশি বাস করেছে। কিন্তু তাদের চিন্তা চেতনা থেকেছে অনেক ভিন্ন। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে বিরাট সামাজিক দূরত্ব। মূল্যবোধের তফাৎ।

রাজশাহী শহরে মুসলমানরা খুব ঘটা করে মুহররম করতো। সুন্দর করে তাজিয়া বানতো। মুহররমের সময় কারবালার শোকের স্থলে সৃষ্টি হতো একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। মুহররমের সময় লোক লাঠি খেলত। সড়কি খেলত। তালোয়ার নিয়ে যুদ্ধের মহড়া করতো এবং নানা কসরৎ দেখাত। যার মধ্যে ফুটে উঠত যথেষ্ট বীরত্বব্যঞ্জনা। একটা যুদ্ধের ভাব। মুসলমান মহল্লা থেকে মুহররমের সময় রাতে মশাল জ্বালিয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে মিছিল বের হতো। মিছিলে মানুষ "হায় হোসেন, হায় হোসেন" বলে ধ্বনি দিত। তাদের কারো হাতে থাকতো লাঠি। কারো হাতে মশাল। দেখে মনে হতো তারা যুদ্ধযাত্রা করছে। রাজশাহীতে মুহররমের মিছিলসমূহ দুটি বড় দলে বিভক্ত ছিল। একদলের নাম ছিল "তুফানি" আর এক দলের নাম ছিল "মিয়াজান"। তুফানি দলভুক্ত মিছিলরা একত্রিত হতো এবং মিয়াজান দলভুক্ত মিছিলরা একত্রিত হতো। এরা আলাদা ভাবে বাজি পোড়াত। রণধ্বনি দিত। এই দুই দলের মধ্যে অনেক সময় মারামারি হতো। আর ঘটত রক্তপাত। ১৯৩০-এর দশকে একবার ভয়ঙ্কর মারামারি হয়ে ছিল তুফানি আর মিয়াজান পার্টির মধ্যে। লোকে এরকম মারামারিকে যেন উপভোগ করতো। কারণ, এর মধ্যে ফুটে উঠতো একটা রণউন্মাদনা।

মুহররমের সময় জারীগান ও নাচ হতো। এই নাচ নাচতো পুরুষ মানুষ নূপুর পায়ে দিয়ে, বিশেষভাবে গোল হয়ে। জারি গান করে নাচতো জারি গায়েনরা। জারী সাধারণত হলো শোক গাঁথা। কারবালার কাহিনী নিয়ে তা রচিত। কিন্তু এরমধ্যে কোথাও কোথাও থাকতে দেখা যায় বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধের বর্ণনা ঃ

দুই হাতে তালোয়ার বুকে পিঠে ঢাল
অঙ্গারের সম মর্দ দোনো আখ লাল
কলার বাগান মতো কাটিয়া চলিল
ছাগলের পালে যেন বাঘ সান্ধাইল।
কারো কাটে হস্ত পদ, কারো কাটে শির
ঘোড়ার পায়ের তলে মইল দশ হাজার কাফির।
বিল্যা ভূঁয়ে পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
এই মতো কাফিরের শির কাটে লাখে লাখে ॥

বাংলাদেশের লোক নৃত্যের বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো জারী। "জারী" আরবী শব্দ। শব্দগত অর্থে, ঘোষণা করা। এরকম নাচের ধারা বহু পুরাতন। সম্ভবত এই ধরনের নাচ আগেও এদেশে প্রচলিত ছিল। কারবালার কাহিনী এর সঙ্গে যুক্তহয়েছে পরে। এই নাচ এক

www.pathagar.com

সময় ছিল বীর রস প্রধান। পরে এতে এসেছে করুণ-রসের প্রাধান্য। এই রকমই অনুমান করেন অনেকে।

পাকিস্তান হবার কয়েকবছর পর "তুফানি" আর "মিয়াজান" পার্টি উঠে যায়। মুহররমে হৈ চৈ করা মন্দ বলে বিবেচিত হতে থাকে। বলা হয়, মুহররম একটা শোকের ব্যাপার। তাতে পটকা ফুটিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে, লাঠি খেলে উৎসব মুখর করে তোলা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু সে আমলে এরকম লাঠি খেলা, বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ মুসলমান সমাজকে লাঠির জোরে সুরক্ষিত হতে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

রাজশাহী শহরে আগে ঈদ-উল-ফিতর-এর চাঁদ দেখবার পর মিছিল বের করা হতো। ১৯৩০-এর দশকে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা গান গাওয়া আরম্ভ করেন। নজরুলের এই গানটা একসময় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে ঃ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ।
তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানী তাকিদ ॥
তোর সোনা দানা বালাখানা
সব রাহে লিল্লাহ্ ,
দে জাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ
ভাঙ্গাইতে নিদ ॥
তুই পড়বি ঈদের নামাজারে মন
সেই সে ঈদ গাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম
হয়েছে শহীদ ॥

ঈদ-উল-জুহা সময় ঈদ-উল-ফিতর -এর মতো অতটা আনন্দ করা হতো না। এই ঈদকে সাধারণভাবে বলা হতো বকরীদ। মানুষ এই ঈদে সাধারণত খাসি কোরবানী দিত। এখনকার মতো গরু কোরবানী দিত না। রাজশাহী শহরের বাজারে ১৯৪০-এর আগে গরুর গোস্ত বিক্রি হতো না। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশ্যে গরুর মাংস বিক্রি হতে থাকে। এর আগে হিন্দুরা এটা হতে দিত না। মুসলমান ভোট পাবার আশায় একজন হিন্দু চেয়ারম্যান, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র নাথ দাস, শহরে গরুর গোস্ত বেচা অনুমোদন করেন।

রাজশাহী শহরের আশেপাশে কিছু গ্রাম আছে, যেখানে গরুর মাংস আহারের ব্যাপারে কিছু কিছু বিশেষ নিয়মনীতি পালন করতে দেখা যায়। এসব গ্রামে মুসলমানরা ঘরের দাওয়ায় বসে গরুর গোস্ত দিয়ে ভাত খায় না। খায় উঠানের মধ্যে বসে। গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া হলে তাঁরা ভাল করে স্নান করে তারপর ঘরে ওঠে। তাঁদের ধারণা, এভাবে স্নান না করে ঘরে উঠলে তাদের উপর জ্বীন ভর করতে পারে ! এসব গ্রামে জ্বীনের ভয় খুব

www.pathagar.com

বেশী।

টেকনোলজির প্রভাবে সমাজ জীবনে নানা পরিবর্তন আসছে। পরিবর্তন আসছে, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে। রাজশাহীতে ঈদের জামাতে প্রথম মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয় ১৯৪০-এর দশকে। এ সময় কিছু সংখ্যক মওলানা ঈদের জামাতে মাইক্রোফোন ব্যবহারে আপত্তি তুলেছিলেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিলো ঐ যন্ত্রের ভিতর শয়তানে কথা বলে ! কিন্তু এখন এই ধারণা পুরোপুরিই বদলে গিয়েছে। সমাজে নতুন কিছুর প্রচলনে সবসময় কিছু না কিছু বিরোধিতার সৃষ্টি হতেই পারে। এটা হলো তার একটা দৃষ্টান্ত। বিলাতে প্রথম রেলগাড়ী চালু হবার সময় পার্লামেন্টে বিরোধীদল আপত্তি তুলেছিলো, এরকম একটি দ্রুত এবং ভারী যান চালু হতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে বহুলোক চাপা পড়ে মরবার সম্ভাবনা আছে !

রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসা একটি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হাজী মুহাম্মদ মহসীন-এর নাম বিশেষভাবে জড়িত। হাজী মুহাম্মদ মহসীন ছিলেন হাজী ফয়জউল্লাহর সন্তান। তিনি ছিলেন হুগলী নিবাসী। হাজী মুহাম্মদ মহসীন উত্তরাধিকারসূত্রে তার নিঃসন্তান সৎ বোন মনুজানের বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। হাজী মুহাম্মদ মহসীন এক দানপত্রের মাধ্যমে তাঁর ভগ্নির সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারী হুগলী ইমাম বাড়াকে (হাজী মুহাম্মদ মহসীন শিয়া ছিলেন) দিয়ে যান। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত সম্পত্তি পরিচালনায় ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং বোর্ড অব রেভিনিউ এই সম্পত্তি পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই সম্পত্তির উদ্বৃত্ত আয় থেকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশে বিখ্যাত শিক্ষানুরাগী নবাব আব্দুল লতিফের (১৮২৮-১৮৯৩) প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এক সরকারী সিদ্ধান্ত বলে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে তিনটি সরকারী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসা সিনিয়র মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। কিন্তু ছাত্র-স্বল্পতা হেতু ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আবার জুনিয়র মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। ১৯২৮সালে তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার সহ-সভাপতি খান বাহাদুর ইমাদ উদ্দিন সাহেবের তৎপরতায় এখানে সপ্তম শ্রেণী খোলা হয়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানকে হাই মাদ্রাসায় পরিণত করা হয় এবং অবিভক্ত বাংলার ডি.পি.আই-এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

এই মাদ্রাসাটির একটা বিশেষ প্রভাব পড়তে পেরেছিল রাজশাহীর মুসলিম সমাজ জীবনের উপর। এখানকার অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন উদারপন্থী। তাঁরা অনেকেই চেষ্টা করতেন ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেবার। প্রতি বছর মাদ্রাসায় একটি বড় রকমের সভা করা হতো। যাতে মুসলিম বিশ্বের সমকালীন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো। রাজশাহী সরকারী মাদ্রাসার মাঠে সেসময় ঈদের সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হতো। এতে প্রথম মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয় এবং মাইক্রোফোন ব্যবহার যে ইসলাম বিরোধী নয় সেটা বুঝিয়ে বলাহয়। বলা হয়, যন্ত্রের মধ্যে শয়তান কথা বলছে না । কারণ, শয়তানের পক্ষে আর যাই করা সম্ভব হোক, কোরানশরীফ পড়া সম্ভব নয়। যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষেরই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে বড় করে।

www.pathagar.com

রাজশাহীবাসীর ভাগ্য বলতে হবে, দেশের একটি সরকারী উচ্চ মাদ্রাসা এখানে স্থাপিত হতেপেরেছিলো। নবাব আব্দুল লতিফ ছিলেন ফরিদপুর অঞ্চলের লোক। কিন্তু তিনি সেখানে উচ্চ সরকারী মাদ্রাসা স্থাপন করবার কথা না ভেবে স্থাপন করেছিলেন রাজশাহীতে। বাংলার মুসলিম জাগরণে নবাব আব্দুল লতিফের দান বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। তিনি ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় গঠন করেন "মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি"। এর লক্ষ্য ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের মানসিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ সময় অভিজাত মুসলমান সমাজে ইংরাজি ও বাংলা ভাষার প্রতি ছিল বিশেষ বিরূপতা আর ফারসী ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ। তাই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। ব্যবস্থা ছিল না গণিত শিক্ষার। লতিফের চেষ্টায় মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও গণিত শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। কলকাতায় সরকারি অর্থে পরিচালিত হিন্দু কলেজে প্রবেশাধিকার কেবল হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। লতিফের চেষ্টায় হিন্দু কলেজে প্রেসিডেনসি কলেজ নামান্তরিত হয় এবং সকল ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের সেখানে প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত এ নিয়ে যখন বিশেষ বিতর্ক সৃষ্টি হয়, তখন লতিফ বলেছিলেন যে, সাধারণ বাঙালী মুসলমানের জন্যে বাংলাই হলো উপযোগী, তবে এই বাংলা খুব সংস্কৃত ঘেঁষা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

তিনি ছিলেন দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে লতিফ ছিলেণ তখনকার খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার শাসক। তিনি এ সময় চাষীদের জমিতে ইংরাজ নীলকরদের বে-আইনী অনুপ্রবেশের বিপক্ষে একটি পরোয়ানা জারি করেন। এ রকম পারোয়ানা জারী সে সময় ছিল খুবই সাহসের কাজ। লতিফ চাকরী না হারালেও খুলনার তখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালিস ইডেন তাকে সাতক্ষীরা থেকে বদলির সুপারিশ করেন। কোন হিন্দু রাজকর্মচারী সে যুগে এরকম সাহস দেখিয়েছেন বলে শোনা যায় না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নাম রাখা হয়েছে নবাব আব্দুল লতিফ হল।

হিন্দু সমাজের অনেক সমস্যা ছিল, যা মুসলমান সমাজে ছিল না। যেমন সতীদাহ প্রথা। হিন্দু সমাজে কুলিন ব্রাহ্মণরা একসঙ্গে অনেক বিবাহ করতেন। এক এক জন কুলিনের ৫০, ৬০ বা তারও অধিক স্ত্রী থাকতো। হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন, অনূড়া স্ত্রীলোক মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে পারেনা। এ জন্য অনেক সময় মুমূর্ষ কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসি, ভাইঝি প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০/১২ টি কন্যার একত্রে বিবাহ হয়েছে এবং ১০ থেকে ৫০ বা তদূর্ধ বয়সের এই সকল স্ত্রী কয়েক দিনের মধ্যেই একসঙ্গে বিধবা হয়েছে, এরকম নজীর সে সময়কার হিন্দু সমাজ ইতিহাস থেকে অনেক পাওয়া যায়। সতীদাহ প্রথা ইংরাজ সরকার রহিত করে (১৮২৯)। মধ্যযুগে অনেক মুসলমান নৃপতি চেষ্টা করেও এ বিষয় কৃতকার্য হতে পারেননি। ইংরাজ শাসক এদিক থেকে হিন্দুদের জন্যে সুফল বয়ে এনে ছিল। বাংলাদেশে এই উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সতীদাহ অনেক বেশী হতো। আমি ছেলেবেলায় একজন হিন্দু বৃদ্ধের কাছে সতীদাহের একটি করুণ বৃত্তান্তের কথা শ্রবণ করেছিলাম। আইন পাস হবার পরেও গোপনে রাজশাহী অঞ্চলে কিছু কিছু সতীদাহ হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজে বিধবা-

www.pathagar.com

বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পর হিন্দু সমাজেও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের স্বপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয়। আইনও হয়। কিন্তু এই আইন বাস্তবে কার্যকর হয় না। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমার এক হিন্দু বন্ধুর মা অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর কষ্ট দেখে আমার মনে খুব কষ্ট হতো। অথচ সেই মাতারই বৃদ্ধ পিতা তাঁর কন্যার চেয়ে কমবয়সি এক মেয়েকে বিবাহ করেন, বৃদ্ধা স্ত্রী মারা যাবার পরে। সে সময়ের হিন্দু সমাজ, আর বর্তমান হিন্দু সমাজ, এক হয়ে নেই।

আমাদের বাড়ির লাগোয়া ছিল হিন্দুদের বাস। হিন্দু সমাজ জীবনের অনেক কিছুই তাই নজরে পড়েছে। রাজশাহীতে সাধারণত হিন্দু পাড়ায় মুসলমানদের বাড়ি বিক্রি করা হতো না। এমন কি অনেক জমি বিক্রয়ের দলিলে লেখা হতো, "মুসলমানকে জমি বিক্রয় করা চলিবে না"। আমার ওয়ালেদ খুব বেশী টাকা দিয়ে হিন্দু পাড়ায় বাড়ি কিনেছিলেন। কারণ, জায়গাটার অবস্থান ছিল ভাল। আজো সেই একই পাড়ায় আছি। তবে হিন্দু প্রতিবেশীরা এখন আর বিশেষ কেউ নেই। সবাই চলে গিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অথবা অন্য কোথাও। সেদিনের রাজশাহীর সঙ্গে তুলনা করলে নানা দিক থেকেই এই শহরকে, শহরের সমাজজীবনকে, ভিন্ন বলে মনে হয়। মনে হয় অন্য আর এক দুনিয়ায় এসে পড়েছি আমরা। মুসলিম সমাজ জীবনেও এসেছে বহু পরিবর্তন। যার কথা আমরা পরে আরো বলবো।

অনেকে বলেন, আগের দিনগুলি ছিল সুবর্ণ দিন। সেসময় সমাজ ছিল অনেক উন্নত। বর্তমানে আমরা চলেছি অবক্ষয়ের (Decadence) পথে। কিন্তু আমি আমার পুরাতন স্মৃতি থেকে এর সমর্থন খুঁজে পাইনা। কোন কোন ক্ষেত্রে আজ যা ঘটছে, তাকে সমর্থন জানাতে না পারলেও, আমরা সমগ্রভাবে চলেছি অবনতির পথে, এমন সিদ্ধান্তে আসবার কোন কারণ দেখি না আমি।

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ
বৈষ্ণবদের খেতুর মেলা

সারা বাংলায় এক সময় শ্রী চৈতন্যর বৈষ্ণব ধর্ম চিন্তা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হিন্দু ধর্মে সবচেয়ে বেশী পূজিত হন দুইজন দেবতা, বিষ্ণু এবং শিব। যাঁরা বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁরা হলেন বৈষ্ণব। আর যারা শিবের পূজা করেন, তাঁরা হলেন শৈব। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণকে বলেন বিষ্ণুর অবতার। আর শ্রীরাধাকে মনেকরেন তাঁর ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মধ্যেকার প্রেম হলো ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ভালবাসার মতো। পরমাত্মার সঙ্গে জীব আত্মার মিলনের আকুতির মতো। বাংলার বৈষ্ণবদের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা এবং তিনিই চরম সত্ত্বা, পরম উপেয়। সাধারণত হিন্দু দর্শনে চার রকম প্রমাণের কথা স্বীকার করা হয় ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। কিন্তু বৈষ্ণবরা কেবলমাত্র শব্দ প্রমাণকেই স্বীকার করেন। তাঁরা মনেকরেন গুরুর কথাই চরম সত্য। তাঁরা হলেন গুরুবাদী। গুরুবাদ অবশ্য সাধারণ ভাবেই এদেশের ধর্ম সাধনার একটা খুব প্রাচীন উপাদান। প্রাচীন বাংলার সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই নতুন বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব হয় মুসলিম শাসনআমলে। এই বৈষ্ণবরা সঙ্গীতকে তাঁদের ধর্ম সাধনার অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে এদের চিন্তার মিল দেখতে পাওয়া যায় জামাল-আল্-দীন আল্-রুমীর চিন্তাধারার সঙ্গে। সুফী সাধকরা যেমন "সামা"-র কথা বলেন বৈষ্ণব সাধকরাও তেমনি সঙ্গীতের মাধ্যমে আত্মার বিশেষ "দশা"-র কথা বলেন। বৈষ্ণবরা অনেক সময় গান করতে করতে নাচেন। যার তুলনা করা চলে দরবেশদের গোল হয়ে নাচবার সঙ্গে। রুমীর দরবেশবাদ ও বৈষ্ণবদের ধর্মীয় ক্রিয়া-কান্ডের মধ্যে বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া চলে। তবে অনেক পার্থক্যও আছে।

প্রথম দিকে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে হিন্দুরা মনে করেছেন হিন্দুধর্মের পরিপন্থী। তারা তাই নবদ্বীপের কাজির কাছে যেয়ে নালিশ করেন, বলেন, শ্রী চৈতন্যকে (নিমাইকে) ধর্ম প্রচারে বাধা দিতে। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা হয়েছেঃ

হেনকালে পাষন্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচন্ডী বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ ॥
পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পন্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি কি খাইয়া মত্ত হৈয়া নাচে গায়।

www.pathagar.com

হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই---করি জাগরণ ॥
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবার বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কৈল পাষন্ডী সঞ্চারি ॥
কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোকে শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥

সে আমলে শব্দ দূষণের কোন ধারণা ছিলনা। কিন্তু তথাপি বহু লোকে ভেবেছেন, বৈষ্ণবদের উচ্চস্বরে নামকীর্তন অমঙ্গল ঘটাতে পারে। বৃন্দাবন দাস বলেছেন ঃ

নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥
কেহ বলে, যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলোরে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে ॥

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর বহুল পাঠিত India Through The Ages বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের যে সময়টাকে সাধারণত উল্লেখ করা হয় পাঠান আমল হিসাবে (১২০০ থেকে ১৫০০খ্রিঃ), তা হলো অন্ধকারাছন্ন সময় (Dark age of North)। কিন্তু বাংলায় শ্রী চৈতন্য জন্মেছিলেন এবং সক্রিয় ছিলেন এই সময়েরই মধ্যে (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রিঃ)। এ সময়টাকে মোটেও অন্ধকারের যুগ বলা যায় না। এই সময়ের মধ্যে রচিত হয়েছে চৈতন্য ভগবত (১৫৩৭)। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি পুস্তক ও মোটামুটি রচিত হয়েছে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত (১৪৭৫ খ্রিঃ) হবার আগে। মুঘল আমলের আগের সময়কে তাই অন্ধকার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করবার কারণ নেই। এই আমলের আগেই ঘটতে পেরেছে বাংলায় রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। বাংলায় রামায়ণ অনুবাদের বিরোধিতা করেছেন, গোঁড়া হিন্দুরা। শ্রী চৈতন্যের ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধতা বিশেষভাবে করেছেন গোঁড়া হিন্দুরাই।

আমরা উপরে উদ্ধৃত চৈতন্য চরিতামৃতের অংশ থেকে দেখতে পাচ্ছি শ্রী চৈতন্য কৃষ্ণের কীর্তন করছেন সকলের সঙ্গে একত্রে। মানছেন না উঁচু নিচুর নীচের ব্যবধান। এই যে সমতাবাদী চেতনা-র আবির্ভাব তা চৈতন্যের মধ্যে ঘটতে দেখা যাচ্ছে পাঠান আমলেই। পাঠান আমলকে তাই চিন্তা-চেতনার দিক থেকে অতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাববার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

এ সময়ে একটা নতুন মানসিক পরিমন্ডল সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান ছিল। আর সেটা সৃষ্টি হতে পরেছিল মুসলিম শাসনের ফলে।

রাজশাহী শহর থেকে ২১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে খেতুর বলে একটি জায়গা আছে। এখানে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। প্রথম যৌবনেই তিনি সাংসারিক সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে যান। সেখানে শ্রী চৈতন্যের শিষ্য লোকনাথ গোস্বামীর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হন। বৃন্দাবন সেসময় কেবলমাত্র একটি ধর্ম কেন্দ্র ছিলনা, ছিল সঙ্গীত চর্চার বিশেষ কেন্দ্র। স্বামী হরিদাস, স্বামী কৃষ্ণদাস প্রমুখ সাধক সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে একসময় নরোত্তম খেতুরে ফিরে আসেন এবং সেখানে চৈতন্য-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। খেতুর ছিল গবানহাটি পরগনার মধ্যে। নরোত্তম যে কীর্তন গানের বিশেষ ধারা খেতুরে প্রবর্তন করেন, তা গবানহাটি কীর্তন হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে। বিলম্বিত লয়ে এই কীর্তন গীত হয়। এই সঙ্গীত রাগ, তাল এবং বিলম্বিত লয় সমন্বিত। এই কীর্তনের দুইটি অংশ । প্রথম অংশ হলো আলপ্তি বা আলাপ। অর্থাৎ কীর্তনের কথা বর্জিত শুধু সঙ্গীতের স্বরবিন্যাস। কীর্তনের এই অংশে ছন্দ বা তাল নেই। কীর্তনের দ্বিতীয় অংশ হলো নিবন্ধ। এই অংশে পদ বা কথার সঙ্গে যুক্ত হয় সুর এবং তাল। সুরের গঠনে বিভিন্ন রাগকে অবলম্বন করা হয়। যদিও কীর্তনের রাগ রূপায়ণে অনেক ক্ষেত্রে রাগ সঙ্গীতের নিয়ম মানা হয় না।

১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে খেতুরে নরোত্তম চৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন করেন। খেতুর হয়ে ওঠে বাংলার বৈষ্ণবদের বিশেষ তীর্থ। এই তীর্থ উপলক্ষে সেখানে অনেক লোকের সমাগম হতে আরম্ভ করে। পরে খেতুরে নরোত্তম ঠাকুরের তিরোধান উপলক্ষে মাঘ মাসের শেষ সাতদিন মেলা বসতে থাকে। কাঠের আসবাব,বাঁশ ও বেতের হস্তশিল্পজাত নানাদ্রব্য, সুন্দর নকসা করা সখের হাঁড়ি এই মেলায় কিনতে পাওয়া যেত। যারা বৈষ্ণব নয়, তারাও যেত মেলা থেকে এইসব জিনিস কিনতে। বাংলাদেশে একসময় যত মেলা হতো তার মধ্যে খেতুরের মেলা ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। এ মেলায় প্রতি বছর পঁচিশ-ত্রিশ হাজার লোকের সমাগম হতো। এই মেলা এই সময় কার্যত হয়ে উঠতো একটা বড় অস্থায়ী ব্যবসা কেন্দ্র।

খেতুর মেলায় লোক সমাগম হবার অন্য আর একটি কারণও ছিল। এই মেলায় বৈষ্ণব মেয়েরা (বোষ্টমী) গা-মাথা চাদরে ঢেকে কেবল এক হাত বাইরে বের করে বসে থাকতো।এদের এই হাতে কিছু অর্থ দিলে এরা যেকোন লোকের যৌন-সঙ্গী হতো। এই প্রথাও হয়ে উঠেছিল যেন কিছুটা বৈষ্ণব ধর্ম সাধনারই অঙ্গ।

বৈষ্ণব মতে ঃ

দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গাঁর চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

www.pathagar.com

আমি কখনো খেতুর মেলায় যাইনি। তবে বাড়ির সামনের পথ দিয়ে বহু লোককে খেতুর মেলায় যেতে দেখেছি। খেতুর মেলায় অনেক সময় কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিত। যার একটা প্রভাব এসে পৌছাত রাজশাহী শহরেও। খেতুরের মেলা হতো খেতুরে। খেতুরের কাছেই আছে প্রেমতলী বলে একটা জায়গা। সেখানেও বসত মেলা। এর পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে পদ্মা। পদ্মা নদীর পানি কলেরা জীবাণু বয়ে আনত রাজশাহী শহরেও। আর রাজশাহীতেও দেখা দিত কলেরা। একবার আমার বাড়ির সামনে খেতুর থেকে ফেরার পথে এক বালক মারাযায় কলেরায়। সে তার মায়ের সঙ্গে খেতুরে তীর্থ করতে গিয়েছিল। পুত্রের মৃত্যুতে তার মা বিলাপ করতে থাকেন। বলেন, "হে গৌরাঙ্গ তুমি আমার একি করলে? কেন আমি ছেলেকে সঙ্গে এনেছিলাম এই তীর্থ দর্শনে!" সে সময় ঐ বিরাট মেলাতে কোন স্বাস্থ্য বিধি মানা হতোনা। আর সে সময় কলেরার এখনকার মতো কোন ভাল সহজ চিকিৎসা পদ্ধতিও জানা ছিল না। বৈষ্ণবরা বলেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর"। কিন্তু কেবল ধর্ম বিশ্বাস দিয়ে কলেরা মহামারী রোধ করা যেতনা। বহু লোক মারা যেত।

রাজশাহী শহরে এক সময় অনেক বৈরাগী ছিলো। এই সব বৈষ্ণব ভিক্ষুরা অনেক সময় পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে ঢুগ ঢুগি ও গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান করে ভিক্ষা করতো। তখন রাজশাহী শহরে পথের ধারে অনেক বট আর অশ্বথ গাছ ছিল। আমদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপাশে একটা বড় অশ্বথ গাছের গোড়ায় বসে একজন বৈরাগী গান করতো ঃ 'দিন ফুরাল, হরি হরি বলো.....'। শীর্ণকায় সেই বৈরাগীর চেহারা আমার আজো মনে পড়ে। তার গানের সুরে একটা শূন্যতা আর বিষাদের রেশ ধরা পড়তো। যা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে চায়। আমি ভাবতাম, ভিক্ষা করাটা মানুষের ধর্ম সাধনার অঙ্গ হবে কেন ? একদিন এক বৈষ্ণবী আমাদের পাশের বাড়ি এসে ভিক্ষা চেয়েছিল । আমার এক বন্ধু তাকে বলল, 'তুমিতো ভগ্ন স্বাস্থ্য নও। ভিক্ষা না করে কাজ করে খেতে পার।' মেয়েটা চটে যেয়ে বলেছিল, 'যাদের বাপের জমিদারী আছে, তারা ও রকম কথা সহজেই বলতে পারে। আমাদের পেশা ভিক্ষা করা।'

বৈষ্ণব ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে স্যার যদুনাথ তাঁর "ইন্ডিয়া থ্রু এজেস" বইতে বলেছেন, এই ধর্ম বিশ্বাসের মূলে আছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। বৈষ্ণবরা বুদ্ধের অহিংসাবাদ অনেক পরিমাণে মেনে নিয়েছিল। বৈরাগীদের তুলনা করা চলে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের শ্রমনদের সঙ্গে। বৌদ্ধ শ্রমনদের মতই বৈরাগীরা পরে হলুদ রঙে রঞ্জিত বস্ত্র। শেষ দিকে হিন্দুরা মনে করতে আরম্ভ করে, গৌতম বুদ্ধ হলেন বিষ্ণুর অবতার। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজার সভা কবি জয়দেব বলেছেনঃ বুদ্ধ হলেন বিষ্ণুর অবতার। তিনি করুণার প্রতিভূ। তিনি জীবহত্যায় হন দুঃখিত। যদিও জীব হত্যা বেদ সম্মত।

বাংলাদেশ থেকে, যদুনাথ সরকারের মতে, বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হবার অন্যতম কারণ হলো বৌদ্ধদের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ ।

www.pathagar.com

বৈষ্ণব ধর্ম চিন্তায় ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন আসে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে থাকে প্রাচীন বাংলার সহজিয়া বৌদ্ধ ভাবধারা এবং তান্ত্রিক মতবাদ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "ইহারা (বৈষ্ণবরা) প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের ধার ধারিত না। বিভিন্ন পথে মুক্তি লাভের সন্ধান করিত। ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়া প্রেম অর্থাৎ বর্তমান যুগের ভাষায় পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। বর্তমান কালের রুচির অমর্যাদা না করিয়া ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড)। খেতুর মেলায় অনেক কিছু ঘটতো, যার কথা বর্তমান কালের রুচির অমর্যাদা না করে বর্ণনা করা যায় না। অনেক ভদ্র বাড়ির ছেলেদেরই তাই খেতুরের মেলায় যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। চৈতন্য বলেছিলেন, প্রেমের মাধ্যমে বিষ্ণুকে লাভ করা যায়। পরবর্তীকালে চৈতন্য ভক্তরা বলতে থাকেন, প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মাধমেই এই ভগবত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। যেহেতু নিজের স্ত্রীর চাইতে অপরের স্ত্রীর উপর আসক্তিই প্রবল হয়, তাই পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ও দৈহিক মিলন ভগবত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির সহায়তা করে। কেউ কেউ বলেন, মানুষের মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হলে মন শান্ত হয়। ফলে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া সহজসাধ্য হয়। এইভাবে বৈষ্ণব ভাবধারা শিথিল যৌন জীবনের পথ উন্মুক্ত করে। তবে ইতিহাস আলোচনা করলে মনেহয়, পরকীয়া প্রেমের মাধ্যমে ভগবত প্রেমের পথে অগ্রসর হবার ধারণা যথেষ্ট প্রাচীন এবং তা বহু আগে থেকেই বৈষ্ণব চিন্তার অঙ্গীভূত ছিল। পাহাড়পুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের মন্দির গাত্র থেকে একটি প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেখা যায়, একজন পুরুষ বিশেষভাবে একজন নারীর হাত ধরে আছেন। মনে করা হয় এখানে নারী মূর্তিতে রাধাকে ও নর মূর্তিতে কৃষ্ণকে বোঝান হয়েছে। ফলকটিতে আসলে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। ফলকটির বয়স অনেকে অনুমান করেন, কম পক্ষে দেড় হাজার বছর। যা থেকে অনুমান করা চলে বৈষ্ণব মতবাদ শ্রী চৈতন্য জন্মের বহু যুগ আগে থেকে ছিল।মনে করা হয় প্রস্তর ফলকটি অন্য কোন মন্দিরের গাত্রে ছিল। পরে তা পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের মন্দিরে লাগান হয়েছিল। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বর্তমান নওগাঁ জেলার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। মনেকরা যেতে পারে পরকীয়া প্রেমের মতবাদ উত্তরবঙ্গ থেকেই অন্যত্র ছড়াতে পেরেছিল।

রাজশাহীর জীবনে খেতুর মেলা ছিল একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাই খেতুর মেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কেও কতগুলি মোটা কথা আলোচনা করা হলো। রাজশাহীর গ্রাম অঞ্চলে কিছু মুসলমান নিজেদের দাবী করেন "মারফতী" হিসাবে। এদের মধ্যেও পরকীয়া প্রেমের ধারণা কিছুটা থাকতে দেখা যায়। এদের চিন্তা-চেতনায় বৈষ্ণব প্রভাব পড়েছে বলেই মনে করা চলে।

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ
খ্রিষ্টান মিশনারীদের কথা

"মিশন" বলতে বোঝায় ধর্ম প্রচারের জন্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান, আর "মিশনারী" বলতে বোঝায় এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের সদস্য। ইংরাজ আমলে ইউরোপ থেকে অনেক মিশনারী খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্যে আমাদের দেশে আসতে থাকেন। ইংরাজ রাজত্বের আগে অবশ্য এসেছিলেন পর্তুগীজ খ্রিষ্টান মিশনারীরা। আমরা এখন ব্যবহার করি, খ্রিষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত এমন অনেক শব্দ, যা বাংলা ভাষায় এসেছে পর্তুগীজ ভাষা থেকে। যেমন, "পাদ্রি", "গীর্জা", "ক্রুশ" এবং "যীশু"। পর্তুগীজ মিশনারী, মানুয়েল-দা-আসুম্প সাওঁ, প্রথম খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্যে বাংলায় বই লেখেন। যা ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান বর্ণমালায় পর্তুগীজ ধারায় ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম Crepar Xaxtrer Orthbhed, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। বইটি বেশ প্রাঞ্জল ও সাবলীল সাধু বাংলা গদ্যে লেখা। পাদ্রি মানুয়েল বইটি লিখেছিলেন ঢাকার কাছে, ভাওয়ালগড়ে বসে। এরকম সাধু বাংলা সম্ভবত তিনি লিখতে শিখেছিলেন পূর্ববঙ্গে। যা থেকে প্রমাণিত হয়, বাংলা গদ্য ঠিক মিশনারীদের চেষ্টায় তৈরি হয়নি। এর একটা সাধু সাবলীল রূপ বিদেশী মিশনারীরা আসবার আগেই গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। অনেকে যেমন মনেকরেন, খ্রিষ্টান মিশনারীরাই বাংলা গদ্য লেখার সূচনা করেছেন, তাঁরা না আসলে বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটতো না, মানুয়েল-এর বইয়ের গদ্য থেকে তা প্রমাণিত হয় না। বাংলা গদ্যের কিছু ভিত্তি আগে থেকে না থাকলে, একজন বিদেশী মিশনারীর পক্ষে অত সুন্দর গদ্য লেখা সম্ভব হতো বলে মনে করবার কোন কারণ নেই।

রাজশাহীতে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার আরম্ভ হয় ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি থেকে। খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। ফিরকার অভাব নেই। রাজশাহীতে যাঁরা প্রথম খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারে উদ্যোগ নেন, তারা হলেন প্রটেস্ট্যান্ট, ইংলিশ প্রেসবিটিরিয়ান গীর্জাভুক্ত মিশনারী। প্রথমে যিনি এখানে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করতে আসেন, তিনি ছিলেন একজন দেশী খ্রিষ্টান মিশনারী। তাঁর নাম হলো রেভারেন্ড বিহারী লাল সিং। তিনি রাজশাহীতে একটি স্কুল এবং এতিমখানা খোলেন। রাজশাহীর প্রেসবিটিরিয়ান গীর্জাটা প্রথম স্থাপন করেন এক নীল কর সাহেব, তাঁর আপন প্রার্থনার প্রয়োজনে। কিন্তু পরে নীল কুঠির সাহেব তাঁর গীর্জাটি প্রেস বিটিরিয়ান মিশনারীদের দান করেন। নীল কুঠীর সাহেবদের সাধারণভাবে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে কোন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটেছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। রেভারেন্ড বিহারী লাল সিং-এর পরে আসেন রবার্ট মরিসন। তিনি ও পরে তাঁর পুত্র রাজশাহীতে একটি উন্নতমানের হাসপাতাল গড়ে তোলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসবিটিরিয়ান মিশনারীরা শহরের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার জন্যে স্থাপন করেন একটি প্রাইমারী স্কুল। এই স্কুলটি রাজশাহী শহরে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এতে বিশেষভাবে পড়েছে মুসলমান মেয়েরা। কিন্তু তারা তাই বলে কেউ খ্রিষ্টান হবার কথা ভাবতে পারেনি। তবে মুসলমানরা

www.pathagar.com

খ্রিষ্টান না হলেও এই স্কুল দ্বারা তাঁরা হতে পেরেছিলেন বিশেষভাবে উপকৃত। কারণ, মুসলমান মেয়েদের পড়বার যে সুযোগ মিশনারীরা দিয়েছিলেন তা অন্যরা দিতে চাননি। প্রেসবিটিরিয়ানদের খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার রাজশাহীতে সামান্যই সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও স্কুল সে সময় রাজশাহী শহরবাসীর জন্যে যথেষ্ট কল্যাণ বয়ে এনেছিল; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এল, এস, এস ওম্যানলি ১৯১৬ সালে রাজশাহী গেজেটিয়ারে লিখেছেন, সে সময় রাজশাহীতে দেশী খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২৩ জন। অর্থাৎ, খ্রিষ্ট ধর্ম এই অঞ্চলের মানুষ গ্রহণ করতে চায়নি । চেয়েছে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসবিটিরিয়ান মিশনারীরা কলেজের ছাত্রদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন একটি হোস্টেল। এর নাম ছিল "ওয়েস্ট মিনিস্টার হোস্টেল"। এই হোস্টেল-এর অধ্যক্ষ ছিলেন ইউয়াড নামে একজন সাহেব। তিনি ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই হোস্টেলটি খুব নাম করে।

হোস্টেলের ছিল একটি ভাল লাইব্রেরি এবং উন্নতমানের পাঠ কক্ষ। সর্বত্র বিরাজ করতো একটা পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলাবোধ। এই হোস্টেলে সব ধর্মের ছাত্ররাই থাকতে পারতো। কোন বাধা ছিলনা। তবে হিন্দু ছাত্ররা আলাদা খেতো এবং খ্রিষ্টান আর মুসলমান ছাত্ররা খেত একসঙ্গে। ইউয়াড সাহেব রাজশাহীতে দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন। দেশে ফিরে, শুনেছি, তিনি নিজের বাড়ির নাম রাখেন রাজশাহী। এই হোস্টেলটি এখন আর নেই । সেখানে স্থাপিত হয়েছে মিশন হাসপাতাল। মেয়েদের জন্য স্থাপিত প্রাইমারী মিশন স্কুলটিও আর নেই। আগে যা ছিল মিশন হাসপাতাল, সেখানে এখন হয়েছে একটি খ্রিষ্টান মিশনারী হাইস্কুল। ম্যাকলিয়ড বলে একজন প্রেসবিটিরিয়ান খ্রিষ্টান মিশনারী সাহেব ছিলেন। তিনি ভাল ফুটবল খেলতেন। তিনি রাজশাহী টাউন ক্লাবে বহুদিন ফুটবল খেলেছিলেন। পরে যান নওগাঁ। নওগাঁতেও প্রেসবিটিরিয়ান মিশন স্থাপন করে একটা ভাল হাসপাতাল। খ্রিষ্টান মিশনারীরা এই অঞ্চলে চিকিৎসা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তবে অনেকে যেমন মনে করেন, আগে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা বলে বিশেষ কিছুই ছিলনা, মিশনারীরা প্রথম বয়ে এনেছেন শিক্ষার আলো, সেটা ঠিক কথা নয়।

এদেশে আগে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল, তা আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি, ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান মিশনারী উইলিয়ম অ্যাডহামস-এর রিপোর্ট থেকে। লর্ড বেনটিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে বলেন। অ্যাডহামস্ প্রদত্ত প্রথম রিপোর্টে দেখা যায়, তখনকার বাংলা-বিহারে রয়েছে ১,০০,০০০ স্কুল। সে সময়ের বাংলা-বিহারে আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল ৪,০০,০০,০০০। অর্থাৎ প্রতি ৪০০ জনের জন্য ছিল একটি করে স্কুল। স্কুল বলতে তখন বোঝাত, একজন শিক্ষকের কাছে পড়তে পারে বা পড়ে, এমন ব্যবস্থা। এর পর অ্যাডহামস আর একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তিনি এটা প্রস্তুত করেন, তখনকার নাটোর থানার শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সে সময় নাটোর থানায় জনসংখ্যা ছিল ১,৯৫,২৯৬। এর মধ্যে, ১,২৯,৬৪০ জন ছিল মুসলমান এবং ৬৫,৬৫৬ জন ছিল হিন্দু। নাটোর থানায় গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪৮৫। অ্যাডহামস অনুসন্ধান

www.pathagar.com

করে জানতে পারেন, নাটোর থানায় প্রাথামিক স্কুলের সংখ্যা হলো ২৭। এখানে ছাত্ররা পড়তে, লিখতে এবং গুণতে শেখে। এসব স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা ১৬৭ জন। এদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা।

এছাড়া আছে ৪ টি ফারসী স্কুল। যার শিক্ষার মাধ্যম হলো ফারসী। ১১ টি স্কুল আছে, যাতে কেবল কুরানশরীফ পড়াতে শেখান হয়। ফারসী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা হলো ২৩ জন এবং কুরান স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হলো ৪২ জন। ২ টি স্কুলে বাংলা এবং ফারসী পড়ান হয়। হিন্দু ছাত্রদের জন্য আছে টোল। টোলে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পড়তে পারে। কিন্তু ফারসী স্কুলে মুসলমান ও যেকোন হিন্দু ছাত্র পড়তে পারে। কোন বাধা নেই। তিনি তার রিপোর্টে বলেছেন, নাটোর থানায় যত ছাত্র স্কুলে পড়ে, তার চাইতে নয়গুণ বেশি ছাত্র পড়ে বাড়িতে নিযুক্ত গৃহ শিক্ষকের কাছে। বাড়িতে শিক্ষা পেয়ে থাকে ১৫৮৮টি পরিবারের ২৩৪২ জন ব্যক্তি। অ্যাডহামস একজন ব্যাপটিস্ট মিশনারী ছিলেন। তাঁর রিপোর্টে থেকে অন্তত এইটুকু ধারণা করা যায়, শিক্ষার ব্যাপারে মানুষ সেই আমলে একেবারে উদাসীন ছিলনা। ইংরাজ আমলে এদেশে যত লোক লিখতে-পড়তে এবং গুণতে জানতো, বাদশাহী আমলে তারচেয়ে বেশি লোক লিখতে, পড়তে ও গুণতে জানতো।

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এডিনবুর্গ শহরে প্রেসবিটিরিয়ান উদ্যোগে একটি বিশ্ব মিশনারী সম্মেলন (World Missonary Conference) আহূত হয়। তাতে দাবি করা হয়, মিশনারীগণ ইউরোপীয় শক্তি শাসিত অঞ্চল সমূহের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। তাঁরা এইসব অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ (Higher-Values) জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। সৃষ্টি করতে পেরেছেন উন্নত আইন পাশের অনুকূল পরিবেশ। করেছেন স্থানীয় ভাষার উন্নতি বিধান। প্রদান করেছেন উন্নত মানের শিক্ষা। সুযোগ করে দিয়েছেন নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্র। দেশে দেশে হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে কেবল যে তাঁরা স্থানীয় লোকের চিকিৎসা লাভের উপায় করে দিতে পেরেছেন, তাই নয়, কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন ঝাড়-ফুঁকে (Magic) বিশ্বাস। তাঁদের এই দাবির মধ্যে বেশ কিছু সত্য আছে, আবার অতিরঞ্জনও আছে। এশিয়ার মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত দেশ হলো জাপান। জাপান সেদেশে ইউরোপীয় মিশনারী যাওয়া বন্ধ করে দেয়, ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। জাপান উন্নতি করেছে আত্ম প্রচেষ্টায়; কোন বাইরের মিশনারী সাহায্য ছাড়াই। মিশনারীরা কেবল ধর্ম প্রচার করেননি, করেছেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদেরও বিশেষ সহযোগিতা।

রাজশাহীতে প্রেসবিটিরিয়ান মিশনারীদের পর খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করতে আসেন ইটালিয়ান রোমান ক্যাথালিক (Latin Rite) মিশনারীরা। এরা ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে আঁধার কোঠা নামক স্থানে একটি ধর্ম পল্লী স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বৃটেন-এর সঙ্গে ইটালির যুদ্ধ চলছিল, তখন এই উপমহাদেশে যত ইটালিয়ান মিশনারী ছিলেন, বৃটিশ সরকার তাদের ধরে জেলে আটকে রাখেন। কারণ, তখনকার সরকার মনে করছিল, এই সব মিশনারী ইটালীর হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি

www.pathagar.com

করতে পারে এবং বৃটেন-এর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। খ্রিষ্টান বৃটেন, খ্রিষ্টান ইটালিয়ান পাদ্রিদের সে সময় আদৌ বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই ধরে রেখেছে জেলে। যুদ্ধ শেষে ইটালিয়ান পাদ্রিরা আবার ছাড়া পান।

বর্তমানে রাজশাহী অঞ্চল প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের চাইতে ক্যাথলিক ইটালিয়ান মিশনারীরাই রয়েছেন খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে অধিক তৎপর। প্রোটেস্ট্যান্টরা হাসপাতাল চালাচ্ছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন, কিন্তু ধর্ম প্রচারে তাঁরা আর আগের মতো অতটা তৎপর নন। যতটা তৎপর ক্যাথলিক মিশনারীগণ।

খ্রিষ্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারে বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছেন সাঁওতালদের মধ্যে। মিশনারীরা ধর্ম প্রচার করতে যেয়ে এদের দিচ্ছেন নানা আর্থিক সুযোগ সুবিধা। এদের এঁরা খ্রিষ্টান বানাচ্ছেন ধর্মের আদর্শের জোরে নয়, জড়বাদী বুদ্ধির জোরে। নানা প্রকার ঐহিক প্রলোভনের মাধ্যমে। ক্যাথালিক মিশনারীরা বাংলাদেশকে কতগুলি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে তাঁদের ধর্ম প্রচার প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন। রাজশাহী হলো একটি ধর্ম প্রদেশ।

ইংরাজ আমলে খ্রিষ্টান মিশনারীদের মনে একটা ভয় ছিল, তাঁরা ভাবতেন, ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে এদেশে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে, আর তার ফলে হতে পারে বৃটিশ রাজের পতন। কিন্তু এখন এরকম আর কোন ভয় নেই। বাংলাদেশে বিদেশী মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের নামে এখন অনেক কিছুই করতে পারছেন। এমন কি হস্তক্ষেপ করতে পারছেন এদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে।

আজ প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে, বিশ্বে খ্রিষ্টান ধর্ম হলো সবচেয়ে উদার ও উন্নত। কিন্তু ইতিহাস এই দাবির পক্ষে সমর্থন যোগায় না। ইটালিতে খ্রিষ্টানরা পৃথিবী সূর্যের চারধারে ঘোরে বলে প্রচার করবার জন্যে পুড়িয়ে মেরেছে ব্রুনকে। গ্যালিলিওর মতো বৈজ্ঞানিকের করেছে বিচার। দিয়েছে শাস্তি। ইংলান্ডের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, ১৮৩০ খ্রিষ্টব্দের আগে পর্যন্ত কোন রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান সে দেশের পার্লামেন্টের সদস্য হতে পারতেন না। ইহুদিরা পার্লামেন্টের সদস্য হবার অধিকার পান ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম নাস্তিকরা ইংলান্ডে পার্লামেন্টে সদস্য হবার সুযোগ লাভ করে। এখনও কোন ক্যাথালিক খ্রিষ্টান বিলাতের রাজা হবার অধিকারী নন। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি-নিষেধ খ্রিষ্টান বিশ্বে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাই খ্রিষ্টানরা নিজেদের যতটা উদার বলে দাবি করেন, আসলে তারা এখন পর্যন্ত তা নন।

আমরা বলেছি, খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে। প্রথমে যখন ইউরোপ থেকে এই অঞ্চলে খ্রিষ্টান মিশনারীরা আসতে থাকেন, তখন তারা বিশেষভাবে প্রচার করতে থাকেন নিজ নিজ সংস্থার খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসকে। ফলে প্রথম দিকে তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার নিয়ে সৃষ্টি হয় বিশেষ প্রতিযোগিতা। ১৯১০ খ্রিষ্টব্দে এরকম প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার জন্যে স্কটল্যান্ডে

www.pathagar.com

রাজধানী এডিনবুর্গে ডাকা হয় বিশ্ব মিশনারী সম্মেলন (World Missonary Conference)। এখন বাংলাদেশে প্রেসবিটিরিয়ান গীর্জাকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ গীর্জা (Church of Bangladesh)। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকরা এখনও এক হতে পারেনি। ক্যাথলিক মিশন আলাদাভাবেই প্রচার করে চলেছে ক্যাথলিক খ্রিষ্টীয় মতাদর্শ। খ্রিষ্টীয় বিশ্বে ধর্মীয় বিরোধ এখন পর্যন্ত মিটতে পারছেনা। যদিও এই বিরোধ মিটাবার চেষ্টা চলছে সেই ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে।

প্রমথনাথ বিশীর "কেরী সাহেবের মুন্সী" নামে একটা চমৎকার উপন্যাস আছে। এতে হিন্দু সমাজের উপর মিশনারীদের প্রভাবের একটা বেশ চিত্র পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হতে পেরেছিল মিশনারীদের প্রভাবে। হিন্দু সমাজ মিশনারীদের কাছে যথেষ্টভাবেই ঋণী।

কেরী সাহেবের জীবন ইতিহাস খুবই বিচিত্র। তিনি ধর্ম প্রচার করবার জন্য বাংলায় এসে পৌছান ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। হুগলিতে তার সব সহায়-সম্বল লুট হয়ে যায়। তিনি কিছুদিন কৃষি কাজ করেন সুন্দর বন অঞ্চলে। তারপর তখনকার মালদহ অঞ্চলে এক নীলকুঠিতে চাকরি করেন একটানা পাঁচ বছর। তিনি সেখানে নির্মাণ করেন একটি গীর্জা। চাকরির সঙ্গে প্রচার শুরু করেন ধর্ম। কিন্তু এ পর্যন্ত মালদহ অঞ্চলে যারা খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তারা প্রায় সকলেই সাঁওতাল। কেরী পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ও মারাঠি ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বাংলা শেখাবার জন্যে রচনা করেন বাংলা পাঠ্য পুস্তক, ব্যাকরণ ও অভিধান। প্রথম জীবনে কেরী ছিলেন একজন মুচি। পরে কিছু লেখাপড়া শিখে এদেশ আসেন ধর্ম প্রচার করতে, ব্যাপটিস্ট মিশনারী হিসাবে। তিনি কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্যে স্থাপন করেন এগ্রিকালচারাল সোসাইটি। তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ রক্স বার্গ-এর একটি বই সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন কলকাতা থেকে। ধর্ম প্রচারকের চাইতে কেরী তাঁর এসব কর্মের জন্যই আমাদের কাছে অধিক প্রশংসিত। কেরীকে মালদহ চাকরী পেতে সাহায্য করেন ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানীর মালদহ কুঠির বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক জর্জ উডনি। উডনি সাহেবের একজন মুনসি ছিলেন, গোলাম হোসায়ন সলীম জইদপুরী। তাঁকে উডনি বাংলার মুসলমান আমলের একটি ইতিহাস রচনা করতে বলেন। মুন্সি গোলাম হোসায়ন সলীম ফারসীতে রচনা করেন "রিয়াজ-উস-সালাতীন" নামক গ্রন্থ। যা থেকে আমরা বাংলার ইতিহাসের অনেক কথা অবগত হতে পারি। গোলাম হোসেন-এর বাড়ি ছিল, বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। উডনি কোম্পানীর চাকুরী করলেও এদেশ সম্বন্ধে জানতে ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে উৎসাহবোধ করতেন। তাই তিনি কেরীকে করেন চাকরী পেতে সাহায্য। সে সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মনে করত, কোম্পানীর উচিত হবে না, খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে কোন ভাবেই অংশ নেওয়া। সে সময় হুগলির শ্রীরামপুর ছিল ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে। কেরী মালদা থেকে সেখানে যেয়ে আরো দুজন মিশনারীর সহায়তায় স্থাপন করেন ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান মিশন। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে জোশুয়া মার্সম্যান-এর সম্পাদনায় ১৮১৮

www.pathagar.com

এদেশে মুসলামনরা খ্রিষ্টান হতে চাননি, তার কারণ এই নয় যে তাঁরা ছিলেন খুবই ধর্মান্ধ। তাঁরা খ্রিষ্টান হতে চাননি, কারণ খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস তাদের কাছে তেমন কোন উন্নত জীবন বিধান তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে, খ্রিষ্ট ধর্ম যথেষ্ট একেশ্বরবাদী নয়। খ্রিষ্টকে আল্লাহর পুত্র বলতে মুসলমানদের বেধেছে। যদিও একজন নবী হিসাবে হযরত ঈশাকে তাঁরা করেছেন শ্রদ্ধা।

মুসলমানরা হযরত ঈশার (আঃ) ক্রুশ বিদ্ধ হবার কাহিনীতে বিশ্বাস করেননা। এক কালে অনেক খ্রিষ্টানও এই কাহিনীতে বিশ্বাস করতেন না। হিন্দুরা ঈশা নবীর নাম জানতেন না, কিন্তু মুসলমানরা জানতেন। তাঁরা ভাবতেন, বর্তমান খ্রিষ্টানরা প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রিষ্টান নন। তাঁরা ঈশা নবীর (যীশু খ্রিষ্ট) শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। ঈঞ্জিল কেতাবকেও (বাইবেল) বিকৃত করে ফেলেছেন। তারা তাই ঈশাকে ভাবতে পারছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। বাংলাদেশে মুসলমানদের সঙ্গে মিশনারীদের অনেক সময় অনেক স্থানে ধর্মীয় বির্তক হয়েছে। তখন মুসলমানরা তাদের বিপক্ষে এসব অভিযোগই তুলে ধরতে চেয়েছেন। মুসলমানরা ছিলেন অনেক বেপরোয়া। তাঁরা বিদেশী খ্রিষ্টান মিশনারীদের ভয় পেতেন না। নির্ভীকভাবেই নিতেন বির্তকে (বাহাজে) অংশ। মুসলমানরা "সুধাকর" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি সম্পাদন করতেন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক পন্ডিত রেয়াজ্জুদীন আহ্‌মদ মাশহাদী। এই পত্রিকাটিতে মিশনারীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করে লেখা থাকতো।

রাজশাহীতে মীর্জা ইউসুফ আলী বেরকরেছিলেন নূর-অল্-ইমান নামে একটি পত্রিকা। এরও লক্ষ্য ছিল ইসলাম সম্বন্ধে মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধি। ইউসুফ সাহেব বলেন, অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। এরজন্যে ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে ইউসুফ সাহেব ডাকেন একটা বিরাট শিক্ষা সম্মেলন। যা ছিল রাজশাহীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের পরিকল্পনা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন মিশনারীরা। স্কচ প্রেসবিটিরিয়ান মিশনারী আলেকজেন্ডার ডাফ কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ (Scottish Church College) প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩০ খ্রিঃ)। বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর এই কলেজের বিশেষ প্রভাব পড়ে। ডাফ মধুসূদন দত্তকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ডাফ এর পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষভাবে স্থির করেন। এভাবে তিনি ইংরাজ আমলের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিলেন। যার ধারা আমরা এখন পর্যন্ত কিছুটা বহন করেই চলেছি। তবে শিক্ষার মাধ্যমে ডাফ-এর এদেশের মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্ম দীক্ষিত করবার সংকল্প সফল হয়নি।

খ্রিষ্টান মিশনারীরা ইউরোপ থেকে এই উপমহাদেশে যে কেবল খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসকেই বহন করে নিয়ে এসেছিলেন, তা নয়। তাঁরা বয়ে এনেছিলেন ইউরোপের আধুনিক

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দে "দিক দর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্র এবং "সমাচার দর্পণ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করা হয়। "দিক দর্শন" খুব অল্প দিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সমাচার দর্পণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সমাচার দর্পণকে গণ্য করা চলে বাংলার প্রথম সংবাদপত্র হিসাবে। এতে ধর্ম ছাড়াও বহু বিষয়ে সংবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হতো। বিলাতে একদল লোকের চেষ্টায় ভারতে ইংরাজ মিশনারীদের উপর ধর্ম প্রচারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে উঠে যায়।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার হিন্দুদের একটি অতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যে আসে মানসিক জাগরণ। যাকে বলা হয় বাংলার নব জাগরণ। এর মূলে মিশনারীদের একটা বিশেষ অবদান ছিল। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের ইতিহাস একখাতে প্রবাহিত হয়নি। এক সময় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলমানরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, তাকে বলা হতো "মুসলমানী বাংলা"। এই বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল, ফারসী এবং ফারসী মাধ্যমে প্রাপ্ত আরবী শব্দের বাহুল্য। এই বাংলায় একটা লিখিত সাহিত্যও ছিল। বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্যে বাইবেল সোসাইটির পক্ষ থেকে এই মুসলমানী বাংলায় একটি বাইবেল প্রকাশ করা হয় এবং বেভারেন্ড উইলিয়ম গোন্ডস্যাক নামক জনৈক মিশনারী সংকলন করেন মুসলমানী বাংলা-ইংরাজী শব্দ-কোষ। কিন্তু খুব কম মুসলমানই মিশনারীদের চেষ্টায় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তখনকার নদীয়া জেলার একজন মুসলমান যুবক, জমিরউদ্দীন, খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। খ্রিষ্টান হবার পর (১৮৮৭ খ্রিঃ) তাঁকে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে প্রথম কলকাতায় ও পরে এলাহাবাদে পাঠান হয়। এলাহাবাদ সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজে তিনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং শেষ পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে তিনি পাদ্রী হন। তিনি জন জমিরউদ্দীন নামে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। কিন্তু পরে তিনি আবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও মুন্সী জমিরউদ্দীন নামে খ্রিষ্ট ধর্ম বিরোধী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুন্সী জমীরউদ্দীন একবার রাজশাহী এসেছিলেন বক্তৃতা করতে। নদীয়া-যশোর অঞ্চলেই ইংরাজ আমলে সামান্য কিছু সংখ্যক মুসলমান খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সংখ্যা হলো খুবই নগণ্য। এখন খুব ঘটা করে মানবাধিকারের কথা বলা হচ্ছে। প্রমাণ করবার চেষ্টা হচ্ছে এর মূলে আছে খ্রিষ্টের নীতি চেতনা। কিন্তু ইসলামেও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ সবচেয়ে খুশী হন কৃতদাসকে মুক্ত করে দিলে আর সবচেয়ে দুঃখ পান স্ত্রীকে তালাক দিলে। ইসলামে মদ ও জুয়াকে হারাম করা হয়েছে বিশেষভাবে। বলা হয়েছে সৎ ও সংযত জীবন যাপন করতে। ফটকা বাজারীয় অর্থনীতির বিরোধিতা করে ইসলাম। ইসলামে জ্ঞান চর্চাকে ধর্মের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এক পর্যায়ে মুসলিম বিশ্বই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে। খ্রিষ্টধর্ম বলে, সীজারকে তার প্রাপ্য দিতে হবে। কিন্তু ইসলামে এরকম কিছু বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে। সব ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। ইসলামেরও একটা গণতান্ত্রিক, মানবিক ভিত্তি আছে। আর সেটা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের চাইতে খাটো নয়। কিন্তু এই কথাগুলি এখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে তেমন জোরালোভাবে বলা হচ্ছে না। তাই ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে এদেশে তরুণ মনে জাগছে বিভ্রান্তি।

www.pathagar.com

চিন্তাধারার অনেক কিছুকে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা ইউরোপের অগ্রগতিকেই এদেশে বয়ে এনেছেন। এর সঙ্গে তাদের ধর্ম চিন্তার কোন যোগাযোগই ছিলনা। এর অনেক কিছু ছিল বরং তাদের খ্রিষ্টীয় ধ্যান ধারণার বিশেষ পরিপন্থী। মিশনারী স্কুলে বাইবেল ছাড়া আর যে সব বিষয় পড়ান হয়েছে, তাতে থেকেছে ইউরোপীয় নবজাগরণেরই প্রভাব। সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে দৃষ্টিকোণ লাভ করি, তাকে বলা চলে সংশয়বাদী যুক্তিবাদ (Sceptical rationalism), এটা কোন খ্রিষ্টীয় চেতনার বিষয় নয়। এর উদ্ভব ঘটে ফ্রান্সে। পরে তা প্রভাবিত করে বিলাতকে। এই চিন্তা-পদ্ধতি আমাদের কাছে এসে পৌছায় ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে। পারি (Paris) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১১১০ থেকে ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) আবেলার (Abelard) বলেন, "কোন মতবাদকে (doctrine) গ্রহণ করতে হলে তা গ্রহণ করতে হবে তার অন্তরনিহিত যুক্তির ভিত্তিতে, বিধাতার প্রদত্ত নির্দেশ হিসাবে নয়।"এইটাই হলো ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তার অন্যতম সোপান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল হানটিংটন ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম "The Clash of Civilizations" সভ্যতার সংঘাত। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত Foreigen Affair পত্রিকায়। এতে বলা হয়, ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে বিভিন্ন সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী মানব সমষ্টির মধ্যে। যুদ্ধ হবে খ্রিষ্টান বিশ্বের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের। খ্রিষ্টান বিশ্ব বলতে তিনি বিশেষভাবে বোঝাতে চান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপকে। পরে তিনি ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি বই লেখেন। বইটি নাম, "The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order"। এতে তিনি বলতে চান, ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপ তাদের খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে সারা দুনিয়াকে রূপ দিতে চাইবে। এরফলে ঘটবে সভ্যতার সংঘাত। আমরা মিশনারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি; কারণ, বিশ্ব রাজনীতিতে ধর্ম ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সভ্যতার উপর এখন আবার নতুন করে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। আর সেটা আমরা দিচ্ছি না। দিচ্ছেন স্বনামখ্যাত মার্কিন অধ্যাপকেরা। খ্রিষ্টধর্মের পতাকাবাহীরা।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়বার পর একদল খ্রিষ্টান পন্ডিত এখন প্রমাণ করতে চাচ্ছেন, পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষেত্রে এখন ইসলামই হলো প্রধান বাধা। কিন্তু ধর্ম হিসাবে খ্রিষ্টান ধর্ম যে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে, এমন কথা বলা যায় না। খ্রিষ্টানদের বহু বিশ্বাসই গণতন্ত্র ও মানব অধিকারের পরিপন্থী। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টীয় মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা, জন কেলভিন (John Calvin, জঁ কালভ্যাঁ) মনে করতেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। মানুষের ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। তিনি তাঁর কর্তৃত্বাধীন এলাকায় সকলকে তাঁর মতবাদে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করেছিলেন। একজন বালক তার পিতাকে আঘাত করায়, তিনি দিয়েছিলেন তার প্রাণদন্ড। মানুষের মৃতদেহ কেটে গবেষণা করবার জন্যে তিনি একজন গবেষককেও আগুনে পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিয়েছিলেন। যাকে বলা প্রেসবিটিরিয়ান খ্রিষ্টীয় মতবাদ, তা হলো কেলভিন

www.pathagar.com

অনুপ্রাণীত। কেলভিন (১৫৩৬-১৫৬৪) জেনেভার (জনেভ) শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন। এই খ্রিষ্টান রাজ্যে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা বলে আদৌ কিছু ছিল না। আর ছিল না, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র। খাঁটি কেলভিনিস্টরা রঙিন জামা পরা ও নৃত্য করাকে মনে করতেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেলভিনিস্ট খ্রিষ্টানের সংখ্যা কম নয়। সারা বিশ্বে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে মার্কিন নাগরিকরাই প্রদান করছেন সবচেয়ে বেশী চাঁদা।

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন, ইউরোপ-আমেরিকার সব মানুষ হলো হেতুবাদী। তারা আমাদের দেশের মানুষের মত ধর্মান্ধ নয়। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। ইউরোপ আমেরিকাতে এখনও ধর্মান্ধ ব্যক্তির অভাব নেই। আর তাই তাঁরা দাবী করতে পারছেন, সারা বিশ্বের উচিত খ্রিষ্টধর্মকে গ্রহণ করা। বলেছেন, এছাড়া মানব উন্নতি সম্ভবপর নয়। সম্ভব নয়, এক বিশ্বগড়া।

www.pathagar.com

একাদশ পরিচ্ছেদ
মুসলিম-মানসে বিবর্তন

আজকের রাষ্ট্র বাংলাদেশ বাংলাভাষী মুসলমানের সংগ্রামের ফল। এর উদ্ভবকে উপলব্ধি করতে হলে তাই বাংলাভাষী মুসলমানের মানস বিবর্তনের কথা পৃথক ভাবে আলোচনা করতে হয়। রাজশাহী অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

ইসলাম ধর্ম এসেছে বাইরে থেকে। বাইরের মুসলিম বিশ্বের ভারধারার প্রভাব বারে বারে নানা ভাবে এসে পৌঁচেছে আমাদের কাছে। আর তার দ্বারা আমরা হয়েছি প্রভাবিত। ফকির-দরবেশরা এসেছেন বাইরে থেকে। কিন্তু কেবল তাঁদের চিন্তার দ্বারাই যে আমরা প্রভাবিত হয়েছি, তা নয়। আমরা প্রভাবিত হয়েছি খোদ আরব থেকে আসা বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দ্বারাও। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবের নেজ অঞ্চলে মুহাম্মদ ইব্ন আবদ-আল্-ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৮৭ খ্রিঃ) এক মুসলিম ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁর এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, আদি ইসলামের বিশুদ্ধ নিরাকার একেশ্বরবাদে (Monotheism) প্রত্যাবর্তন। যেহেতু আবদ-আল্- ওয়াহাব এই আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাই এই আন্দোলনকে সাধারণত "ওয়াহাবী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের আসল নাম হলো, "আল্-মোহায়েদিন"।

কেবল আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলে নয়, নাইজেরিয়া থেকে শুরু করে সুমাত্রা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মুসলমান প্রভাবিত হয়েছিলেন আবদ্-আল্-ওয়াহাব-এর মতবাদ দ্বারা। এই উপ মহাদেশেও এই মতবাদ সাড়া জাগায় বহু মুসলমানের মনে। বিশেষ করে বাংলায়। এক পর্যায়ে উত্তর ভারতের রায়বেরিলি নিবাসী সৈয়দ আহামদ শাহ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রিঃ) এই আন্দোলনকে তখনকার সারা উত্তর ভারতে বিশেষ শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং তখনকার পাঞ্জাবের বালাকোট নামক স্থানে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন (মে, ১৮৩১ খ্রিঃ)। বাংলায় সৈয়দ আহমদ-এর আগে ওয়াহাবী ভাবধারা বহন করে আনেন হাজী শরীয়তুল্লাহ (শরীয়ৎ-আল্লাহ) । তিনি ছিলেন সাবেক ফরিদপুর অঞ্চলের লোক। তিনি অল্প বয়সেই হজ্জ করার জন্য মক্কায় যান এবং হেজাজে ২০বৎসর অবস্থান করে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরেন। আরবে থাকাকালিন সময়ে তিনি আবদ-আল্-ওয়াহাব-এর চিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং দেশে ফিরে বিশেষ এক ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ইতিহাসে যা "ফারায়জী" আন্দোলন রূপে খ্যাত হয়ে আছে। আরবীতে "ফরজ" শব্দের অর্থ হল অবশ্য করণীয়। ধর্মীয় অর্থে, কুরানশরীফ ও হাদিস সমূহে যা করণীয় হিসাব বর্ণিত হয়েছে। ফারায়জীরা বলেন, একমাত্র আল-কুরান ও সহী হাদিস সমূহকে অনুসরণ করতে হবে। তাই এই আন্দোলনের নাম হয় "ফারায়জী"। এঁরা বলেন সূফী সাধনা খাঁটি ইসলাম সম্মত নয়, তাই তাকে পরিত্যাগ করতে

www.pathagar.com

হবে। ফিরে যেতে হবে আদি সহজ অনাড়ম্বর ইসলামী জীবনবিধানে। আরো বহু বিষয়ের সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, ইংরেজরা খ্রিষ্টান। তাদের অধীনে থেকে প্রকৃত ইসলামী জীবনবিধান অনুসরণ সম্ভব নয়। দেশকে তাই ইংরেজ রাজ শাসন মুক্ত করতে হবে। এরফলে ফারায়জী আন্দোলন একটা রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে ওঠে, কেবলমাত্র একটি ধর্মনৈতিক আন্দোলন হয়ে আর থাকে না। ইংরেজ আমলে এ সময় সমৃদ্ধ কুটির শিল্প, বিশেষ করে হস্ত চালিত তাঁত শিল্প ধ্বংস হবার ফলে বহু লোক অল্প সময়ের মধ্যে বেকার হয়ে পড়ে। এই বেকার হস্ত শিল্পীরা (প্রধানত মুসলমান তন্তুরায় শ্রেণী) শরীয়তুল্লার সঙ্গে যোগ দেন। ফলে এই আন্দোলন স্বল্প সময়ের মধ্যে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ মহসীন (১৮১৯-১৮৬০ খ্রিঃ) ফারায়জীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ডাকনাম দুদু মিয়া হিসাবেই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দুদু মিয়া অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, জমি আল্লাহর। সুতরাং জমিদারের খাজনা আদায়ের কোন অধিকার নেই। বিংশ শতাব্দীর অসহযোগ আন্দোলনের অনেক পূর্বাভাস দুদু মিয়ার আন্দোলনে পাওয়া যায়। তবে দুদু মিয়ার দল কেবল অহিংস পন্থায় অসহযোগ আন্দোলনে আস্থাবান ছিলনা। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফারায়জীরা পঞ্চচরের নীলকুঠি এবং জমিদার বাড়ি লুঠ করে। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় দুদু মিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন, এই অভিযোগে তাকে ধরে বন্দি করে রাখা হয়। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ফারায়জীদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। তা একটা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ে (Sect) পরিণত হয়। রাজশাহী অঞ্চলে ফারায়জী প্রভাব সেভাবে এসে পৌছাতে পারেনি। পাবনার কোন কোন অঞ্চলে এই আন্দোলন বিশেষ সাড়া জাগিয়ে ছিল। এই আন্দোলন সেখানে খুব শক্তিশালী রূপ নিয়েছিল। বর্তমান রাজশাহীর এই অঞ্চলে ওয়াহাবী ভাবধারা এসে পৌছায় বেশ কিছু পরে। এই ভাবধারা হলো রায়বেরিলির সৈয়দ আহাম্মদ-এর কাছ থেকে আসা।

রাজশাহী অঞ্চলে যে ওয়াহাবী আন্দোলন হয়, তার নেতৃত্ব দেন রায়বেরেলির সৈয়দ আহাম্মদের শিষ্যরা। এরাঁ ছিলেন সে সময়ের সমগ্র উত্তর ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম। এই ওয়াহাবীদের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন W.W.Hunter, তাঁর বিখ্যাত The Indian Musalmans গ্রন্থে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে রাজশাহী জেলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রাজশাহী জেলাতে আরম্ভ হয় ওয়াহাবী আন্দোলন। রাজশাহী জেলায় প্রথম ওয়াহাবী ভাবধারা প্রচার করেন ইনায়েত এবং ওয়ালিয়াৎ আলী। হান্টার ওয়াহাবী ভাবধারাকে তুলনা করেছে খ্রিষ্টান পিউরিটান ভাবধারার সঙ্গে। যাঁরা চেয়েছিলেন সরল বিশুদ্ধ খ্রিষ্টীয় জীবনরীতি অনুসরণ করতে। ওয়াহাবীরা কতকটা অনুরূপভাবেই চেয়েছিলেন আদি সবল ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে। তিনি ওয়াহাবী ভাবধারাকে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন ঃ

১। কেবল এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

২। আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার (যার বাস্তব অর্থ

www.pathagar.com

হলো প্রচলিত পীরবাদের অস্বীকৃতি, এমন কি নবী পূজাকেও অস্বীকার করা। কোন মানুষকেই পবিত্র মানুষ (Saint) না ভাবা।

৩। কুরানশরীফকে খুলা কিতাব বলে মনে করা। অর্থাৎ, তা বুঝবার জন্য কোন ভাষ্যকারের প্রয়োজন অস্বীকার করা। কুরান ও হাদিসে যা বলা হয়েছে তার কোন গুপ্ত অর্থ (বাতেন) আছে, তা স্বীকার না করা।

৪। সমস্ত প্রকার বাড়তি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা পরে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তাদের অস্বীকার করা।

৫। বিধর্মীদের শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য জিহাদ করা।

৬। নেতার নেতৃত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা।

এই ওয়াহাবী আন্দোলনের পথ ধরেই এদেশে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়, যা এখন আহাল-ই-হাদিস সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত। রাজশাহীতে সবাই আহাল-ই-হাদিস সম্প্রদায়ভুক্ত নন। রাজশাহীতেও সারা বাংলা দেশের মতো হানাফি মাযহাবভুক্ত সুন্নি মুসলমানের সংখ্যাই এখনো অধিক। কিন্তু সারা বাংলাদেশেই সব মুসলমানের উপর ওয়াহাবী ভাবধারা ফেলতে পেরেছে এক ব্যাপক প্রভাব। ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলেই সব মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামকে জানবার এবং উপলব্ধি করবার একটা চেষ্টা শুরু হয়। ওয়াহাবী ভাবধারা নানা বিতর্কের জন্ম দিয়ে ইসলাম সম্বন্ধে, তার সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে সব মুসলমানকেই সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করে ছিল। যা ছিল খুবই ইতিবাচক। ওয়াহাবীরা অবশ্য মনে করতেন, ইউরোপীয় ভাবধারার সবকিছুই বর্জনীয়। তাদের চিন্তার এই দিকটি অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি বহু মুসলমানের মনে সৃষ্টি করে বিশেষ অনীহা। যার জের এখনও চলছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মুসলিম পিউরিটান অভ্যুত্থানের পাশাপাশি মুসলিম সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে একটা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরীজীবী শ্রেণী। যারা উৎসাহী হয়ে ওঠেন বিশ্বজগতে যা ঘটছে, সে সম্বন্ধে অবগত হতো, অনেক খোলা মনে বিশ্বের ঘটনা প্রবাহকে বিচার করতে। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের সুলতান খলিফাদের অবসান ঘটবার পরে। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে মুস্তফা কামাল তুর্কী খিলাফতের অবসান ঘটান। যার একটা প্রভাব পড়ে সারা মুসলমান বিশ্বের চিন্তায়।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী মুসলিম ক্লাব। এ সময় রাজশাহীতে সেসন জজ হয়ে আসেন জনাব নূর-উন-নবী চৌধুরী। তিনি এসে নেন এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ। অনেক তরুণ তাঁর এই উদ্যোগের সহায়তা করেন। যাঁরা এই ক্লাব গঠনে উৎসাহ দেখান, তারা সকলেই ছিলেন নব্যপন্থী। এঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। অবশ্য সে সময় রাজশাহী শহরে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম ক্লাবের প্রতিষ্ঠার দিনে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রধান অতিথি করে আনা হয়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠাতাদের মনোভাব। রাজশাহীতে অবস্থানকালে এক সভায় কবি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে ছিলেন। সে সময় মুসলমান সমাজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাওয়াকে শরীয়ত বিরুদ্ধ

www.pathagar.com

কাজ বলে মনে করা হতো। ঐ সভায় গান বন্ধ করবার জন্য গোঁড়া মুসলমানদের পক্ষ থেকে কয়েকটি ঢিল ফেলা হয়েছিল। কিন্তু নজরুলের গান গাওয়া বন্ধ করা সম্ভব হয়না তাদের পক্ষে। বহু সংখ্যক তরুণ ছিলেন কাজী নজরুল-এরই পক্ষে। অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন নজরুল। তারমধ্যে ছিল ঃ

বাজলো কিরে ভোরেরই সানাই
নিদমহলের আধারপুরে।
শুনছি আজান গগন তলে
অতীত রাতের মীনার চুড়ে ॥

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কবি-দার্শনিক ইকবালের মৃত্যুতে মুসলিম ক্লাবের পক্ষ থেকে একটা শোক সভা করা হয়। ইকবাল প্রধানত লিখেছেন ফারসীতে এবং উর্দুতে। ইংরাজিতে তাঁর লেখার অনুবাদ হয়েছে কম। যা হয়েছে, তা সম্ভবত উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু ইকবাল-এর শক্তিবাদের দর্শন এবং তাঁর ভিত্তিতে দেওয়া ইসলামের ব্যাখ্যা এখানেও, সামান্য হলেও, এসে পৌঁছায়। আর সেই ব্যাখাকে তখন গ্রহণ করে তরুণ মহলের একাংশ। ১৯৩০ এর দশকে শহরের পাঠানপাড়ায় মুসলমান ছেলেরা প্রথম থিয়েটার করে। যাঁরা থিয়েটার করবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে বিখ্যাত কণ্ঠ শিল্পী রুনা লায়লার পিতা সৈয়দ হাম্মদ ছিলেন অন্যতম। সে সময় এই থিয়েটার করা নিয়ে গোঁড়া মুসলমান সমাজে উঠে ছিল খুব সমালোচনা।

বিগত পঞ্চশ ষাট বছরে মুসলমান সমাজে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে মেয়েদের জীবনে। আগে এই শহরে মুসলমান মেয়েরা খুব পর্দা মেনে চলতো। রাজশাহী শহরে কোন "ভাল" মুসলমান বাড়ির মেয়ে দিনে বোরখা ছাড়া বাইরে বের হতো না। মুসলমান মেয়েরা সাধারণত সন্ধ্যার পর বোরখা ছাড়া পদ্মার ধারে বেড়াতে আসতেন। রাতের বেলা কোন পর্দা করা হতোনা। এখন মেয়েরা যেভাবে চলাফেরা করছেন, অফিস-আদালতে চাকুরী করছেন, সে সময় তা ছিল অকল্পনীয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসেছে এই বিরাট পরিবর্তন। ১৯৪৭-এর পর থেকেই এই পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে। পাকিস্তান আন্দোলন কোন একটা ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। ছিল একটা রাজনৈতিক আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই ধর্ণতাত্ত্বিক ছিলেন না। এরা সকলেই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় আস্থাশীল। জিন্নাহ সাহেব ছিলেন যুক্তিবাদী এবং সর্ব প্রকার গোঁড়ামীর পরিপন্থী। তিনি পাকিস্তান হবার পর ১১ ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে গণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে ভাষণ দিতে যেয়ে বলেনঃ

"আপনারা এখন স্বাধীন হয়েছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনাগারের দরজা আপনাদের জন্যে এখন মুক্ত। ধর্ম, জাতি এবং মতবাদ আপনাদের যেমনই হোক না কেন, রাষ্ট্রের কাজের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। নতুন নীতির অবলম্বনে এখন আমাদের জীবন যাত্রা হবে শুরু। আমরা একই রাষ্ট্রের নাগরিক এবং রাষ্ট্রের সকল

www.pathagar.com

নাগরিকেরই অধিকার সমান। এ আদর্শ সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে যাব। তাহলে আপনারা দেখবেন যে, কিছুদিন যেতে না যেতেই এক রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে রাজনৈতিক অর্থে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলমানও আর মুসলমান থাকবে না। ধর্মের দিক থেকে যে এরকম হবে, আমি তা বলি না, কেননা ধর্ম প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস।" ("ইংরাজি থেকে বাংলা)

উপরের বক্তব্য নিশ্চয়ই খুব গোঁড়া মানুষের হতে পারে না। জিন্নাহ্ মৌলবাদী ছিলেন, এরকম অভিযোগ তোলা যায় না।

জিন্নাহ নারী সমাজের দাবী-দাওয়া সমর্থন করতেন। তিনি মনে করতেন, সমাজ-জীবন গঠনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। তিনি মনে করতেন, শিশুদের চরিত্র গঠনে মায়েদের দানই অধিক। এক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২৮ শে মার্চ, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এক বক্তৃতায় তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেন, যা সে সময় ঢাকা বেতার থেকে প্রচার করা হয়।

পাকিস্তান হবার পর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয়তার সৃস্টি হয়। এ বিষয় অনেক সনাতন বিধি-নিষেধ অকার্যকর হয়ে উঠতে থাকে। রাজশাহীতে বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে । এই বেতার কেন্দ্রকে নির্ভর করে রাজশাহী শহরে গান বজনার চর্চা বাড়ে। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেও আরম্ভ হয় বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি-চর্চা। ১৯৬০ এর দশক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আরম্ভ করেন একত্রে নাটক অভিনয়। এই যে মানসিকতার পরিবর্তন, এটাকে একটা খুব বড় রকমের পরিবর্তন হিসাবেই চিহ্নিত করতে হবে। পাকিস্তান আমলেই প্রথম মুসলমান বাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বাইরে চাকরি করতে আরম্ভ করে। এক্ষেত্রেও আগের রক্ষণশীলতা সেভাবে আর বজায় থাকতে পারেনা। আসলে জীবিকার পরিবর্তন মানুষের চিন্তা ও চেতনায় বিরাট পরিবর্তন এনে দিতেই পারে। সমাজের আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন মানুষের মানসলোককে নানাভাবেই প্রভাবিত করে। মেয়েদের স্বাধীনভাবে চাকুরি করবার অধিকার এখন সাধারণভাবেই স্বীকৃত।

অনেকে মনে করেন, মুসলমান সমাজ জীবনে আগের তুলনায় যৌন বিশৃঙ্খলা বেড়েছে। যা সূচিত করছে পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত করবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজশাহী গেজেটিয়ারে লেখা হয়েছে, মুসলমান সমাজে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মেয়েদের সহজেই বিবাহ হতে পারে। এরকম বিবাহকে বলা হয় "নিকাহ"। কিন্তু নিকাহর স্ত্রীরা সাধারণ বিবাহের স্ত্রীর মর্যাদা পায়না। এই বিবাহ সহজেই ভঙ্গ হতে দেখা যায়। কেবল স্বামীরা নয়, স্ত্রীরাও এই ধরনের বিবাহবন্ধন সহজেই ছিন্ন করতে পারে। কোন নিকাহর বৌ, তার নিকার স্বামীর সঙ্গে না থাকতে চাইলেই বিবাহ ভেঙ্গে যায়। মুসলমান ধর্মে পুরুষের বহু বিবাহ অনুমোদিত। তারা এক সঙ্গে চারটি স্ত্রীর স্বামী হতে পারেন। কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলে নিকাহর ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় আইন পালিত হয়

www.pathagar.com

না। অনেকের চারটি স্ত্রী থাকবার পরেও একাধিক নিকাহর বৌ থাকতে দেখা যায়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের তুলনায় মুসলমান সমাজে বিবাহ প্রথা নিশ্চয় এখন অনেক সুশৃঙ্খল হতে পেরেছে। বরং পারিবারিক জীবন তখনকার তুলনায় এখন অনেক সংযত হতে পেরেছে বলেই মনে হয়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী গেজেটিয়ারে বাঁশফোঁড় নামে একটি জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। ধর্মের দিক থেকে বাঁশফোঁড়রা ছিল বেশ অদ্ভুত প্রকৃতির। এরা নামাজ পড়তো। কিন্তু মৃতদেহকে কবর দিত না। নদীর চরে রেখে আসত। এদের পেশা ছিল বাঁশ কেটে তা দিয়ে চাটাই, ঝুড়ি ইত্যাদি বানানো। এরা স্ত্রীকে অপরের কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার নিত। এদের মধ্যে ছিল অনেক অদ্ভুত প্রথা।

ধর্মের দিক থেকে মিশ্র প্রকৃতির জনগোষ্ঠী আরো ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বেদেদের কথা বলা যায়। নাটোরের সিংড়া থানায় এখনও অনেক বেদের বাস। বেদেরা নামাজ পড়ে, ঈদে উৎসব করে, আবার সাপের দেবতা বিষ হরির পূজাও করে। এরা মনাসেজ গাছকে (Euphorbia ligularia) খুব পবিত্র জ্ঞান করে। এখন এদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বাড়ছে। বেদের মেয়েরা আগে সূঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসা করে বেড়াত। এখনও কিছু কিছু করে। এদের এই চিকিৎসা পদ্ধতি কিছুটা চীনাদের অকুপাংচার-এর মতো। তবে চিকিৎসার নামে এরা অনেক বুজরুকীও করতো এবং এখনও করে। বেদের মেয়েরা বাড়ি বাড়ি সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়াত। যার চল এখন খুবই কমে গিয়েছে। ধর্মের দিক থেকে এই মিশ্রপ্রকৃতির সম্প্রদায়গুলি কিভাবে উৎপন্ন হতে পেরেছিল। তা নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয়নি। কিন্তু এখন এরকম মিশ্রপ্রকৃতির ধর্ম বিশ্বাস ক্রমশ চলে যাবারই পথে। মানুষ এখন অনেক বেশী শুদ্ধ মুসলমান হবার চেষ্টা করছে।

এই উপমহাদেশে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রপাত্র করেন স্যার হার্বার্ট রিজলে (Sir Herbert Risley)। রিজলের লিখিত বিখ্যাত বই, The People of India কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে । এই বইতে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, বাংলার মুসলমান সমাজে দুটি সামাজিক স্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি স্তরকে বলে "আশরাফ" আর একটি স্তরকে বলে "আজলাফ"। আশরাফেরা মনেকরেন তাদের পূর্ব পুরুষরা এক সময় এসেছিলেন বাইরে থেকে। তাঁরা উচ্চ বংশদ্ভূত। আর আজলাফরা তা নয়। তাদের পূর্বপুরুষ ছিলো এদেশের মানুষ। যারা পরে গ্রহণ করেছে ইসলাম। আশরাফ বা শরিফ মুসলমান বলতে বোঝায় সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান। তবে তিনি এই প্রসঙ্গে একথাও বলেন যে, এই বিভাজন হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মতো অত কঠোর নয়। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হওয়া মুসলমান সমাজে তুলনামূলকভাবে সহজ। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারীর রিপোর্টে একটা বাংলা ছড়া দেওয়া হয়েছে ঃ

আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দিন।
তলের মানুষ উপরে যায় ভাগ্য ফেরে যেইদিন ॥

মুসলমান সমাজের এই শরাফতের ধারণার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেই একপর্যায়ে সমালোচনা আরম্ভ হয়। বলা হয়, ইসলাম অনুসারে সব মুসলমান সব

www.pathagar.com

মুসলমানের ভাই। এখানে "উঁচু" ও "নীচু"-র ধারণা তাই ধর্ম সম্মত নয়।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী "মুসলমানের জাতিভেদ" নামে একটি বই লেখেন। এতে তিনি মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতো "জাতিভেদ" প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেন। বলেন ঃ "আজকাল অনেক হিন্দু-ঘেঁষা অজ্ঞ মুসলমান কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবী মুসলমানদিগের সহিত সমাজ করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এবং হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথার অনুকরণে ঐ সকল মুসলমানের সহিত পানাহার করিতে বা একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কোন কোন স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গীর দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারী, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনাপন বংশগৌরব বা শরাফত রক্ষা করিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবী করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই আলেমগণ কৃষি শিল্প ব্যবসায়জীবীর বংশদ্ভুত হওয়ায় তাহারা তাঁহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িতেও অসম্মত হয়! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বাংলার এই ভুঁই ফোড় আশরাফগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্তান নয় কি? ভন্ডামীর নীচতা বোধ হয় আর ইহা অপেক্ষা নীচে নামিতে পারেনা। মূর্খগণ কোরআন হাদিস খুলিয়া দেখুক, যে মুসলমান সমাজে তাহাদের এই ভন্ডামীপূর্ণ শরাফতের স্থান নাই।....."

মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেব ছিলেন সে আমলের বি, এ, পাস। বি, এ, পাস করা লোক মুসলমান সমাজে তখন সংখ্যায় ছিল হাতে গোনা। তিনি এক সময় ছিলেন রাজারামপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার। তাঁর এই বই মুসলমান সমাজে সে সময় বেশ কিছুটা জাগরণ আনতে পেরেছিল।

রাজশাহী শহরে "শেখ পাড়া" আছে, "পাঠান পাড়া" আছে। এক সময় শেখ এবং পাঠানরা সম্ভবত পৃথকভাবেই বাস করতেন।

রাজশাহীতে "কলু" দের বলা হতো শাহাজী। শাহাজীদের একটা পৃথক পাড়া ছিল। এদের সঙ্গে অন্য মুসলমানরা ওঠা-বসা করাকে হেয় মনে করতেন। এদের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়াকেও মনে করতেন অবমাননাকর।

পাকিস্তান হবার পর এই ধরনের সামাজিক বিভেদ চলে যেতে থাকে। এই যে চিন্তা চেতনার পরিবর্তন এটাকে বিপ্লবী বলেই অভিহিত করতে হয়।

বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মানস বিবর্তন এক খাতে ঘটেনি। হিন্দুদের মধ্যে যখন জন্মেছেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), তখন মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছেন হাজী শরীয়তুল্লা। রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজে ওরকম কোন সমস্যা ছিল না। ছিলনা বিধবা বিবাহের সমস্যা। রামমোহন চেয়েছেন শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্য সরকারী চাকরী। কিন্তু শরীয়তুল্লা সে সময় চেয়েছেন কুটির

www.pathagar.com

শিল্প ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট দরিদ্র জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে। জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিপক্ষে দাঁড়াতে। এই যে সংগ্রামী মনোভাব, মনে হয় তারই এক বিশেষ প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দে ।

বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার প্রতি হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে ৩০ জনের কাছাকাছি বাস করতো শহরে। গড়পড়তা শহরের বাসিন্দাদের শতকরা ৬০ জন ছিলেন হিন্দু। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জনসংখ্যার দিক থেকে কলকাতা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। জনসংখ্যার দিক থেকে লন্ডন-এর পরেই ছিল কলকাতার স্থান। তখনকার বাংলায় শহরবাসী (urban) মানুষের সংখ্যা ছিল ২৫,০০,০০০ জন। এর মধ্যে অর্ধেকই বাস করতো কলকাতা শহরে। কলকাতার পর শহর হিসাবে আসত ঢাকার নাম। কিন্তু এর জনসংখ্যা তখন ছিল মাত্র ৩৫,০০০। রাজশাহী শহরের জনসংখ্যা ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ছিল ২৩ হাজারের কাছাকাছি। ছোট শহরের মধ্যে রাজশাহীর নাম করা যেত। মার্কিন গবেষক J. H. Broomfield, তাঁর Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth century Bengal বইতে বলেছেন (১৯৬৮), ইংরাজ আমলে বাংলার হিন্দু সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব। ভদ্রলোক শ্রেণী, কোন অর্থনৈতিক শ্রেণী (economic class) নয়। এ হলো, যাকে বলে একটা মর্যাদা শ্রেণী (status class)। ভদ্রলোক গরীব হলেও ভদ্রলোকই থাকতো। তার ছিল বিশেষ মর্যাদা। কথনে, চলনে, বসনে ভদ্রলোক শ্রেণী ছিল স্বতন্ত্র্য। এই ভদ্রলোক শ্রেণী প্রথমে কৃষিজীবী মুসলমান শ্রেণীকে অবজ্ঞা করতো ছোটলোক হিসাবে। কিন্তু পরে এই শ্রেণীর মনোভাবে কিছুটা পরিবর্তন আসে। এই শ্রেণী কৃষিজীবী মুসলমানদের উপর কিছুটা সহানুভূতি দেখাতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই সহানুভূতি ছিল কতকটা উর্দ্ধতন (superior) ব্যক্তির অধস্তন (inferior) ব্যক্তির উপর করুণারই মতো।

বিংশ শতকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু ভদ্রলোকেরা গ্রহণ করেছিলেন বিশেষ ভূমিকা। কিন্তু এই ভদ্রলোক শ্রেণী যে আন্দোলন করেন মুসলমানরা থেকেছেন তা থেকে দূরে। উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আস্থার ব্যাবধান। এর একটা কারণ ছিল, এই হিন্দু ভদ্রলোকেরা মুখে ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির (secular principles) কথা ঘোষণা করলেও তাদের রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশে ব্যবহার করেন হিন্দু প্রতীক (Hindu symbolism) । যা বাংলার মুসলমানকে কাছে না টেনে দূরেই সরিয়ে দিতে থাকে। বাংলার মুসলমান, ব্রুমফিল্ড-এর মতে, শক্তির প্রতীক মা কালীকে বাংলা মায়ের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

ব্রুমফিল্ড-এর মতে, বাংলার মুসলমান চেয়েছেন তাদের আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে। তাঁর মতে, ইসলাম ধর্মের একটা বৈশিষ্ট্যই হলো এই ধর্মে বিশ্বাসীদের আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অন্য তাগিদও ছিল। মুসলমানরা ভেবেছেন,

www.pathagar.com

একদিন তাঁরা এদেশ শাসন করেছেন। হিন্দু শাসন তাদের জন্যে হবে অবমাননাকর। বাংলায় ভদ্রলোক ও ছোটলোকের দন্দ্ব এই মানসিকতাকে আরো তীব্র করে তুলেছিল।

ব্রুমফিলাড তাঁর বইতে রাজশাহীর একটা রাজনৈতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর বিশিষ্ট মুসলিম নেতা এমাজ উদ্দিন আহাম্মদ, একজন হিন্দু জমিদারকে(কাকিনার রাজা) সে সময়ের বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউনসিল- এর সদস্য হতে সাহায্য করেন। তিনি লোকাল বডিজ-এর মুসলমান ভোটারদের বলেন,ঐ ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করতে। ভোটে ঐ ব্যক্তি জেতেন। কিন্তু জেতার পর ভোল পাল্টে যোগ দেন সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির পক্ষে। মুসলমানদের মধ্যে একটা পৃথক রাজনৈতিক চেতনা জোর পেতে থাকে এরকম কারণও। তাঁরা মনে করতে আরম্ভ করেন, কেবলমাত্র পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছাড়া তাঁরা তাঁদের আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম হবেন না।

ব্রুমফিল্ড-এর বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা থেকে। বইটি বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস অনুধাবনে যথেষ্ট সহায়তা করে। কারণ, এর মধ্যে একজন বিদেশী বিশ্লেষকের নিরপেক্ষতা আছে। আমরা এর পরের অধ্যায়ে রাজশাহী অঞ্চলের রাজনীতির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
রাজশাহীতে রাজনীতির ধারা

আগে আমাদের দেশে রাজনীতি বলে কিছু ছিল না। বাহুবলে মানুষ রাজা হয়েছে। সুলতানী আমলে কেউ সুলতান হতে হলে, দেশের অভিজাত সমাজের সম্মতি লাগত। কিন্তু মুঘল আমলে এরকম কোন প্রথা আর ছিল না। ভোটের রাজনীতি, যাকে এখন আমরা সাধারণত বলে থাকি রাজনীতি করা, তার শুরু হয় ইংরাজ আমলে, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনের মাধ্যমে। ইংরাজদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও বিশেষ অর্থে আইনের শাসনের ধারণা। যা এখন আমাদের মূল রাজনৈতিক ধ্যান ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যরা গভর্ণমেন্ট (অথাৎ ভারতের বৃটিশ সরকার বা বৃটিশ রাজ) দ্বারা মনোনীত হতো। পরে বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের সভ্যদের তিন-চতুর্থাংশ কর দাতাদের ভোটে নির্ধারিত হতে থাকে এবং এক-চতুর্থাংশ হতে থাকে সরকার দ্বারা মনোনীত। মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত স্থানের উন্নতিকল্পে লর্ড রিপনের সময় (১৮৮০-১৮৮৪) বাংলার সর্বত্র জেলা বোর্ড এবং লোকাল বোর্ড স্থাপিত হয়। জেলা বোর্ডের তিন-চতুর্থাংশ সভ্য নিবাচিত হতেন। লর্ড রিপন বলেন, এর মাধ্যমে এদেশের মানুষ ক্রমশ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার চালাতে ও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে। এর লক্ষ্য ছিল কিছু শাসন ক্ষমতা এদেশের মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং রাজনীতিকে ভোটমুখীন করে তোলা। যাতে দেশে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটাবার পথে মানুষ পা বাড়াতে না চায়। রাজশাহী শহরে (রামপুর, বোয়ালিয়াতে), মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে । ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে করা হয় বেঙ্গল মিউনিসুপ্যাল অ্যাক্ট।এই অ্যাক্ট অনুসারে রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটিতে ২১ জন সভ্য (কমিশনার) নিযুক্ত হন। এর মধ্যে ১৪ জন ছিলেন নির্বাচিত আর ৫ জন সরকার মনোনীত। ২ জন সদস্য ছিলেন পদাধিকার বলে (Ex-officeo)। রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন হরগোবিন্দ সেন।

মুসলমানদের মধ্যে থেকে রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটির (যাকে বাংলায় এখন বলা হচ্ছে পৌরসভা) প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন খান বাহাদুর এমাদ উদ্দীন আহাম্মদ। তিনি পরে বঙ্গীয় আইন সভারও (Legis lative Assembly) সদস্য হন(১৯৩০)। সে সময় আইন সভার ক্ষমতা ছিল খুবই সীমিত। সদস্যরা নির্বাচিত হতেন চেম্বার অব কমার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, জমিদার এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সদস্যদের ভোটে। খান বাহাদুর এমাদ উদ্দীন (মৃত্যু, ৭/৫/১৯৩১) রাজশাহী শহরে এসেছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জের রাজারামপুর থেকে। তিনি রাজশাহী কোর্টে ওকালতি করে নিজেকে এই শহরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দে । লর্ড ডাফরিন (১৮৮৪-১৮৮৮) চেয়েছিলেন এরকম একটি দলের প্রতিষ্ঠা। এর উদ্দেশ্য ছিল, রাজনৈতিক কার্যকলাপকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করা। ভারতের লোক যাতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মতো কোন অভ্যুত্থানের পথে আর পা বাড়াতে না যায়। একজন প্রাক্তন বৃটিশ সরকারী কর্মচারী A.O. Hume (হিউম) প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় কংগ্রেস। এই দল ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল না। ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত করে লর্ড ডাফরিন বলেন ঃ কংগ্রেস হবে ভারত-সম্রাজ্ঞীর স্থায়ী বিরোধী দল।

রাজশাহীতে কংগ্রেসের নামকরা নেতা ছিলেন বাবু সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র(মৃত্যু, ১২/২/১৯৪১)। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (AICC) সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ছিলেন। এঁর এক কন্যা, মীরা মৈত্র, ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্যা। অনুশীলন সমিতি ছিল সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। যার কথায় আমরা একটু পরে আসছি।

রাজশাহীতে কংগ্রেসের বিখ্যাত নেতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী আসেন ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে । চাঁদা সংগ্রহ ছিল তাঁর এখানে আসবার অন্যতম উদ্দেশ্য। এসময়ে অনেক মুসলমানও ছিলেন কংগ্রেসের উপর বেশ কিছুটা সহানুভূতিশীল। নওগাঁর বিখ্যাত ব্যবসায়ী আসানুল্লা মোল্লা এম, এল, সি (MLC= Member of the Legislative Council) গান্ধীজীকে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দেন। দশ হাজার টাকা সেদিন ছিল অনেক টাকা। নাটোরের মহারাজা বীরেন্দ্র দিয়েছিলেন ৫ হাজার টাকা। তখন কংগ্রেসকে চাঁদা দেওয়াটা হয়ে উঠেছিল বেশ কিছুটা ভয়ের ব্যাপার। কারণ, বৃটিশ সরকার এসময় কংগ্রেসকে ঠিক আগের মনোভাব নিয়ে আর দেখতে পারছিলেননা। যদিও গান্ধীজী তখন পর্যন্ত বৃটিশ রাজকে গায়ের জোরে তাড়াবার কথা বলছিলেননা। তিনি কার্যত ছিলেন নরমপন্থীদেরই পক্ষে। কোন চরমপন্থী মতের তিনি প্রবক্তা ছিলেননা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে কংগ্রেসের আন্দোলনের পাশাপাশি আর একটি আন্দোলনের সূত্রপাত্র হয়। যা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (Terrorist Movement) নামে খ্যাত। যদিও নামটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতের মহারাষ্ট্রে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা। এর নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। পরে সেখান থেকে এই আন্দোলন আসে বাংলায়। ১৯০৫ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই পঁচিশ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব্যাপকভাবে চলেছিল বাংলায়। সন্ত্রাসবাদীরা মনে করতেন, কোন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা যাবে না। দেশকে বৃটিশ শাসনমুক্ত করতে হবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে। বাংলায় সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একটির নাম ছিল "অনুশীলন সমিতি" আর একটির নাম ছিল "যুগান্তর"। রাজশাহীতে অনুশীলন সমিতি ছিল জোরালো। রাজশাহীতে অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন মহারাজা তৈলক্যনাথ চক্রবর্তী ময়মনসিংহ থেকে এসে। তৈলক্যনাথ চক্রবর্তী "মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মূলত ছিল উন্নত

www.pathagar.com

হিন্দুজাতীয়তাবাদ ভিত্তিক আন্দোলন। এর গোপন গঠনতন্ত্রে বলা ছিল, "কোন অ-হিন্দুকে সমিতির সদস্য করা যাইবেনা।" সন্ত্রাসবাদীরা চিত্তশুদ্ধির জন্যে সাধারণত ভগবত-গীতা পাঠ করতেন আর ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি লাভের আশায়। পূজা করতেন কালী মাতার। এঁদের একটি গান ছিল এই রকমঃ

এবার তোরা ফিরে দাঁড়া
তুলে নে মার বলির খাঁড়া
ছুটবে তোদের মনের ধাঁধাঁ
বুঝবি নিজের পরাক্রম ॥

সন্ত্রাসবাদীদের চিন্তার মধ্যে এসে মিশেছিল নানা ইউরোপীয় নৈরাষ্ট্রিক (Anarchist) ধ্যানধারণা। এঁদের অনেকে মনে করতেন, ইংরাজ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা সৃষ্টি করতে হবে। এই বিশৃঙ্খলা অরাজকতাই বিপ্লবের তরঙ্গ বয়ে আনবে। পুরাতন সমাজ জীবনের কাঠামোকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ জীবনের জন্ম হবে আপনা থেকেই। কিন্তু কি হবে সেই নতুন সমাজ জীবনের কাঠামো, সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন সুসম্বদ্ধ ধারণা ছিল না।

রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় জেলখানা স্থাপিত হয় ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার ছিল একটা বড় কারাগার। রাজশাহী জেলে জেল খেটেছেন অনেক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। এক সময় ইংরাজ আমলে লিউক (C.A.W. Luke) নামে এক সাহেব ছিলেন এই নামকরা জেলের সুপারিনটেনডেন্ট। লিউক রাজবন্দীদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাতেন। লিউক সাহেবকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে। লিউক গুরুতরভাবে আহত হন, যদিও মারা যান না। লিউক যাচ্ছিলেন মোটরগাড়ী চড়ে। এ সময় একজন সন্ত্রাসবাদী তাঁর গাড়ীর সন্মুখে ফেলে দেন একটা সাইকেল। লিউক-এর গাড়ী থেমে যায়। তখন দুইজন সন্ত্রাসবাদী লিউককে লক্ষ্য করে ছোঁড়েন গুলি। সেটা ১৮ই নভেম্বর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ । ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের বাড়ির কাছেই। অনেক দিন এই ঘটনাটি ছিল শহরবাসীর আলোচ্য। যারা লিউক সাহেবকে গুলি করবার ব্যাপারে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এমন এক জনের সঙ্গে পরে আমার পরিচয় ঘটে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। তাঁর কাছে শুনেছিলাম এই ঘটনার বিশদ বিবরণ। লিউক মারা না গেলেও এরপর থেকে রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর আর আগের মতো অত্যাচার হতে পারেনি। রাজশাহীর রাজনৈতিক জীবনে লিউককে গুলি করা ছিল সে সময় একটা বিরাট রাজনৈতিক ঘটনা। স্কুলের পাঠ্য বইতে তখন আমরা পড়তাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না এবং অনেকে মনে করতেন বৃটিশ সূর্য কখনও অস্তমিত হবার নয়।

মুসলমান আর হিন্দু রাজনীতির ধারা দেশে এক খাতে প্রবাহিত হয়নি। রাজশাহীতেও নয়। বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে ছিল Bengal Muslim Party। তারপর খুব জোরাল হয়ে ওঠে জনাব আবুল কাশেম ফজলুল হক (ফলজ-আল্-হক্)-এর কৃষক-প্রজা-পার্টি। ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে । কিন্তু বাংলাদেশে

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ শক্তি সঞ্চয় করতে সময় নেয় যথেষ্ট। প্রথমে রাজশাহীতেও কৃষক-প্রজা-পার্টি ছিল অনেক শক্তিশালী। রাজশাহীতে মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে । ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হুসেন শহীদ সোহরাওর্দী নিজে এসে এখানকার স্থানীয় মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটি যথাযথভাবে গঠন করেন। এর পরেই রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগ রাজশাহীতে মুসলমান জনসমাজের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে আরম্ভ করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দল হিসাবে হয়ে ওঠে, বলতে গেলে, মুসলমানদের একমাত্র দল। সে সময়ের রাজশাহী জেলার মুসলিমলীগের রাজনীতি প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ, লাহোরে গ্রহণ করা হয় এই উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমির প্রস্তাব। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে নাটোরে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের একটি মুসলিম আসন শূন্য হয়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ঠিক করে, পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নাটোরের এই সিটে ইলেকশন লড়বে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে হয় এই ভোট যুদ্ধ। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এসময় স্বয়ং নাটোরে এসে বক্তৃতা দেন, মুসলিম লীগ প্রার্থীকে ভোট প্রদানের জন্যে। বিপুল ভোটে মুসলিম লীগ প্রার্থী জয়ী হন এই নির্বাচনে। মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট পড়েছিল শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী। সারা উপমহাদেশের মধ্যে পাকিস্তান ইস্যুর উপর নাটোরেই প্রথম মুসলিম জনমত যাচাই হতে পেরেছিল। রাজশাহী সদর এবং নওগাঁ থেকে অনেক কর্মী এ সময় নাটোরে গিয়েছিলেন ঐ নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অংশ নেবার জন্য। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই দল হয়ে উঠেছিল শক্তিশালী। রাজশাহী শহরে একজন বেশ বড় মুসলমান তালুকদার ছিলেন লাল মুহাম্মদ হাজী। ইনি বেঙ্গল লেজিস লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (MLC) হয়েছিলেন। পরে তাঁর পুত্র আব্দুল হামিদ হন তদানীন্তন বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য (MLA)। তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের অ্যাক্ট অনুসারে যে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন হয়েছিল, তাতে। ইনি আগাগোড়াই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিলেন। এমনকি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দেও এঁর ভূমিকা ছিল আওয়ামী লীগের পরিপন্থী। কিন্তু এঁর পুত্র, এ,এইচ,এম, কামরুজ্জামান (আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কামরুজ্জামান) হন আওয়ামী লীগের একজন প্রথম সারির নেতা। তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যদিও দাবী করা হতো, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হলো মুজিব নগর, কিন্তু এই সরকারের মন্ত্রীরা সকলেই থাকতেন কলকাতা শহরে। খন্দকার মুস্তাক এবং কামরুজ্জামান কলকাতায় থাকতেন একই বাসাতে। এঁদের দুজনকে কার্যত রাখা হয়েছিল নজরবন্দি করে। কারণ, এঁদের ভাবা হতো মার্কিন লবির লোক। সে সময় মুস্তাক ও কামরুজ্জামান সাহেবের মধ্যে ছিল চিন্তাগত মিল। এঁরা দুজনের কেউই পছন্দ করতেননা তাজউদ্দীন সাহেবকে। কিন্তু রাজনীতির জটিল আবর্তে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গেই ঢাকা জেলে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেল কামরুজ্জামানকেও।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের মন-মানসিকতায় আসে অনেক পরিবর্তন। সাবেক পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান ছিল

www.pathagar.com

১৭০০ কিলোমিটার। এছাড়া ছিল মানবধারা, ভাষা ও ইতিহাসগত পার্থক্য। বৃটিশ ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক আবেষ্টনিতে উদ্ভব হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two Nations Theory)। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর সৃষ্টি হয় ভিন্ন পরিস্থিতির। এই ভিন্ন পরিস্থিতিতে, সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে এসব পার্থক্য বড় হয়ে উঠতে থাকে। সৃষ্টি হয় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে একটা পৃথক জাতীয়তাবোধ। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ রূপ নিয়েছিল সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামোরই মধ্যে। এদিক থেকে এর ইতিহাস পাকিস্তানের ইতিহাসের সঙ্গেই গ্রথিত। তা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। তাজউদ্দীন সাহেবরা এই জাতীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণে যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেননি। এরকমই মনে হয় অনেকের কাছে। বলা হয়, আজকের জাতীয়তাবাদের মূলে আছে বাংলা ভাষা। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন খুব জোরালোভাবে হয়েছিল । রাজশাহী সরকারী কলেজকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন প্রথমে ছিল ছাত্র আন্দোলন। পরে তা রূপ নেয় গণ আন্দোলনের। কিন্তু পৃথিবীতে যত মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে,তার শতকরা ৬০ ভাগ বাস বরে বাংলাদেশে। আর শতকরা ৪০ ভাগ বাস করে ভারতে। ভারতে বাংলা ভাষা নিয়ে কোন আন্দোলন হয়নি। কিন্তু সাবেক পাকিস্তানে হয়েছে। কেবল ভাষার বাস্তবতা দিয়ে তাই এই আন্দোলকে বিচার করা চলে না। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সাবেক পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল বিশেষভাবে জড়িত। বাংলাদেশ হবার পর রাজনীতির গতি প্রকৃতি ভিন্ন হতে থাকে। মানুষ ভারত কি চাচ্ছে, সে সম্বন্ধে তুলতে থাকে বিভিন্ন প্রশ্ন। যেসব প্রশ্ন আগে ওঠেনি। ভাষা আমাদের জাতীয়তাবোধের একটি মূল্যবান উপাদান, কিন্তু তা-ই কেবল একমাত্র উপাদান নয়। আরো উপাদান আছে। এ থেকেই উদ্ভব ঘটে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যুক্তির।

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ, শেখ মুজিব নিহত হন। আমি সেদিন ঢাকায় ছিলাম। কদিন আগে ব্যক্তিগত কাজে গিয়েছিলাম ঢাকায়। কাজটা না হওয়ায় ঢাকাতেই আটকা পড়েছিলাম। আমার এক ভাতিজার বনভোজনে যাবার কথা ছিল সাভারে, ১৫ই আগস্ট। যাদের সঙ্গে বনভোজন যাবার কথা ছিল, তাদের একজন থাকতো ধানমন্ডিতে। সে খুব সকালে ফোন করে ঘটনাটি জানায় আমার ভাতিজাকে। মানা করে ঘর থেকে বের হতে। সমস্ত ঢাকা সেদিন ছিল শান্ত। কেবল দুয়েক জায়গায় কিছু লোককে দেখা যায় জটলা করতে। আমি ছাদ থেকে বাইনোকুলার দিয়ে দেখছিলাম ঢাকা শহর। অতীতের অনেক কথাই মনে পড়ছিল।

শেখ মুজিব অনেকবার রাজশাহী এসেছেন। তাঁর আপন ফুপাত বোনের বিবাহ হয়েছে রাজশাহীতে। রাজশাহী আসলে তিনি বোনের বাড়িতেই উঠতেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের কথা। শেখ মুজিব রাজশাহী এসেছিলেন নির্বাচনী প্রচারে। এ সময় কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বিশেষভাবে দাওয়াত করে খাওয়ান তাঁর বাড়িতে। ঘটনাচক্রে সেই ভোজসভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। যদিও আওয়ামী লীগের আমি কেউ ছিলাম না। খাওয়া শেষে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ওঠে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, 'পাকিস্তানের

www.pathagar.com

অস্তিত্ব বজায় রেখে কি ছয় দফার বাস্তবায়ন সম্ভব?' শেখ মুজিব তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমরা আপাতত ব্যাপারটা নিয়ে সেভাবে কিছু ভাবছি না। ভাবছি আসন্ন নির্বাচন নিয়ে।'

আমার ধারণা, ১৯৭০-এর নির্বাচনের রায়কে যদি জুলফিকার আলী ভুট্ট মেনে নিতেন, তবে পরবর্তী ইতিহাস অত রক্তক্ষরা হতে পারতো না।

রাজশাহীতে বাম রাজনীতি চিরদিনই বেশ জোরাল ছিল। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর তানোর থানায় পিকিংপন্থী কম্যুনিষ্টরা একত্রিত হন। তাঁরা চান ঐ থানা এলাকা দখল করে একটি কম্যুনিষ্ট ঘাঁটি গড়তে এবং সেখানে থেকে অন্যত্র বিপ্লব-যুদ্ধ পরিচালিত করতে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে পিকিংপন্থী কম্যুনিষ্টদের যুদ্ধ হয় তানোরে। বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে সশস্ত্র কম্যুনিষ্ট ক্যাডারদের পরাজয় ঘটে। মারা যান ৪৪ জন বিপ্লবী। বাংলাদেশে উগ্র বাম শক্তির বিরাট অংশ আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল না। আর এই বামপন্থীরা তখন পর্যন্ত ছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী।

রাজশাহীর তানোর থানার সঙ্গে লাগোয়া হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানা। এখানে কম্যুনিষ্ট ইলামিত্র ও তার স্বামী ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘটান সাঁওতালদের দিয়ে বিদ্রোহ। যা চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। তানোরে পিকিংপন্থী কম্যুনিষ্টদের অভ্যুত্থান ছিল সে তুলনায় অনেক ব্যাপক। কিন্তু ব্যাপক হলেও জনসমর্থন ছিলো সীমিত। সে সময় এ দেশে মানুষ চাচ্ছিল, গণতন্ত্র। বিপ্লবের নামে কোন একদল কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা নয়। তা ছাড়া, তখন শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বাকশাল। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ যেসব শ্লোগান দিয়ে ভোটে জিতেছিল, তা যেমন ছিল ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ নির্ভর, তেমনি আবার তাতে ছিল গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ধারণার সংমিশ্রণ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল একটা মধ্যপন্থী (Moderate) দলের ভাবমূর্তি নিয়ে। যার আবেদন সে সময়ে মানুষের মনে পড়েছিল অনেক ব্যাপকভাবে।

ইংরাজ আমলে মানুষ রাজনীতি করেছে, দেশকে বৃটিশ শাসনমুক্ত করবার জন্যে। রাজনীতি করেছে, ইংরাজের দেওয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা উপভোগ করতে এবং সেই সঙ্গে কিছুটা জনহিতকর কাজও করতে। চেয়েছে জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে। পরে মুসলিম জনসমাজ পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি উত্থান ঘটে বিভিন্ন প্রকার বাম আন্দোলনের। কিন্তু চীনের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসবার পর এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়বার ফলে বাম আন্দোলন বর্তমানে চলছে বিলুপ্তিরই পথে।

দেশে এখন দুটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য। আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আওয়ামী লীগ এক সময় সমাজতন্ত্রকে তার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখানে সে তার এই সাবেক লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করেছে। সে আজ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও ব্যক্তি মালিকানার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে

www.pathagar.com

চাচ্ছে। বিএনপি কখনও সমাজতন্ত্রের কথা বলেনি। বলেছে, সামাজিক সুবিচার এবং অর্থনৈতিক সমতা বিধানের কথা। এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে এখন নীতিগত দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, জাতি-সত্ত্বার স্বরূপ নিয়ে। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে "বাংগালী" জাতীয়তাবাদে, কিন্তু বিএনপি বিশ্বাস করে "বাংলাদেশী" জাতীয়তাবাদে। এই দুই জাতীয়তাবাদের উপলব্ধি এক নয়। আদর্শের ক্ষেত্রে এ দুয়ের দ্বন্দ্ব চলেছে।

এই উপমহাদেশে ন্যাশনালিটির (Nationality) প্রশ্নটি এখনও খুব সুস্পষ্টভাবে মিমাংসিত হতে পারেনি। আজকের বাংলাদেশ যে ভৌগলিক এলাকা নিয়ে গঠিত, তার আছে একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস। কিন্তু একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের আবির্ভাব মাত্র সেদিনের ঘটনা। এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারা তাই এদেশের রাজনীতিবিদদের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য না হয়েই পারে না। আর তাই জাতিসত্তার স্বরূপ নিয়ে এখনও যথেষ্ট আলোচনা চলেছে। সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মাত্র একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পতাকা তলে আসেনি। আসলে "বাংলাদেশী" আর "বাংগালী" জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিতর্কের উদ্ভব হতে পারতো না। এক ভাষা, এক দেশ, এক মানসিকতাকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে একটা জাতি। প্রতিটি জাতি ইতিহাসের ধারায় গড়ে ওঠা এক একটি বিশেষ জনসমাজ। কিন্তু সব বাংলাভাষী মানুষ একটি রাষ্ট্র গড়তে চায়নি। এই না চাওয়াটাও বিশেষ ভাবে বিচার্য, আজকের বাংলাদেশের মানচিত্রকে বুঝতে।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল বাংলাদেশের অনেক এলাকার তুলনায় যথেষ্ট উঁচু। মানুষ এখানে অনেক আগে থেকেই এসে বসতি গড়েছে। অন্য অঞ্চল পরে সৃষ্টি হয়েছে ক্রমশঃ চর পড়ে। মানুষ এসব অঞ্চলে বসতি গড়েছে পরে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে অনেক প্রাচীন ইতিহাস। আমদের আজকের জাতিসত্তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সময় যার কথা না এসে পারে না। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে ঘটে তুর্কী-মুসলিম অভিযান। তাঁরা গৌড়ে করেন তাঁদের রাজধানী স্থাপন। যার কিছুটা পড়েছে বর্তমান চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায়। মধ্যএশিয়া থেকে আগত তুর্কী সুলতানদের সময় থেকেই প্রথম একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে " সালতানাত-ই- বঙ্গালহ্" নামে অভিহিত করা হতে থাকে। বাংলাভাষী যে অঞ্চলের উপর তুর্কী মুসলিম প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে পড়তে পেরেছিল, কার্যত তা নিয়েই গঠিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ ও তার মানুষের বিশিষ্ট জাতিকসত্তা। রাজনীতির সঙ্গে এই জাতিকসত্তার আবেগ বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়েই থাকছে।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে

মানুষ রোগ থেকে বাঁচবার জন্য সবসময় গাছপালা থেকে ঔষধ বানাবার চেষ্টা করেছে। মানুষ রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য নানা রকম গাছ খেয়েছে।যে গাছ খেয়ে কোন রোগ সেরেছে, তাকে সেই রোগের ঔষধ হিসাবে নির্ধারিত করেছে। দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুতে হতো সিনকোনা গাছ (Cinchona)। পেরুর আদিম অধিবাসিরা ম্যালেরিয়া জ্বর হলে এই গাছের ছাল চিবিয়ে খেত। একজন ফরাসী রসায়নবিদ এই গাছের ছাল থেকে কুইনাইন প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইংরাজ আমলে, দার্জিলিংয়ে সরকারী তত্ত্বাবধানে সিনকোনা গাছ (Cinchona ledgeriana) লাগান হয়, কুইনাইন প্রস্তুত করবার জন্য। ম্যালেরিয়া ছিল আমাদের দেশের খুব ক্ষতিকর রোগ। এই রোগে সবচেয়ে বেশি লোক মারা যেত। কুইনাইন-এর ব্যবহারের ফলে ম্যালেরিয়ার লোক মরা কিছু কমে। গাছপালা থেকে তৈরি অনেক ঔষধ অবশ্য বাংলাদেশে আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। যেমন, চাল মুগরা গাছের (Taraktogenus kurzii) গাছের তেল ব্যবহার করা হতো কুষ্ঠ রোগ সারাবার জন্য। কুর্চি গাছের (Holarrhena antidysentrica) আরক ব্যবহার করা হতো আমাশা রোগ সারাবার জন্য। প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে আমরা সাধারণত কবিরাজি বলে থাকি। মুসলমান যুগে বাইরে থেকে আসে ইউনানী বা হেকমি চিকিৎসা পদ্ধতি। ইউনানী চিকিৎসাতেও ঔষধ প্রস্তুতের জন্য বহু প্রকার লতা-গুল্ম ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এসব ঔষধ রোগীকে প্রদান করা হতো সুস্বাদু হালুয়ার সঙ্গে অথবা মিষ্টি সরবতের সঙ্গে। যাতে রোগীর তা খেতে খারাপ না লাগে। ইংরাজ আমলে এদেশে আসে ডাক্তারি। প্রথম দিকে ইউরোপের চিকিৎসা শাস্ত্র খুব যে উন্নত ছিল, তা নয়। পরে চিকিৎসা জগতে বিরাট পরিবর্তন আসে রোগ জীবাণুর আবিষ্কারের ফলে এবং কি করে রোগ জীবাণু অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়ায় সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারবার ফলে। মাইক্রোসকোপের সাহায্যে জীবাণু নিরীক্ষণ করে রোগ নির্ণয় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিরাটভাবে এগিয়ে দেয়। ইউরোপে যখন বিভিন্ন রোগ-ব্যারাম নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তখন আমাদের দেশে আয়ুর্বেদিক ও হেকমি চিকিৎসায় নতুন কিছুর প্রবর্তন ঘটেনি। এই দুই চিকিৎসা পদ্ধতি চলেছিল প্রাচীন শাস্ত্র নির্ভর করে, গতানুগতিক ভাবে।

এক সময় ইউরোপ চিকিৎসাবিজ্ঞানে এগিয়ে ছিলনা। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইবনে সীনা এবং ইবনে রুশদ-এর বই ইউরোপের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহে অবশ্যপাঠ্য ছিল। এরপর থেকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে আরম্ভ হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ গবেষণা যা চিকিৎসাবিদ্যায় আনতে আরম্ভ করে পরিবর্তন। জার্মান জীবাণু তাত্ত্বিক রবার্ট কখ (১৮৫৭-১৯১০) কলকাতায় আসেন কলেরার জীবাণু সংগ্রহ করতে ও তা নিয়ে গবেষণা চালাতে। বৃটিশ চিকিৎসক রোনল্ড রস্ (১৮৫৭-১৯৩২) প্রমাণ করতে সক্ষম হন, কিভাবে স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। তিনি তাঁর গবেষণার কাজ প্রধানত

www.pathagar.com

কলকাতাতে থেকেই করেন।

রোগ সম্বন্ধে অনেক রকম অন্ধ বিশ্বাস অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল। বিলাতেও ছিল। একসময় বিলাতে মনেকরা হতো, অনেক মেয়ের কুনজরে মানুষের ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এরকম মেয়েকে ভাবা হত ডাইনি (witch) বা যাদুকরী। যাদুকরী মেয়েকে বিলাতে বিচার করে পুড়িয়ে মারা হতো। বিলাতে এই বিধান রদ করা হয় ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। সব দেশেই রোগের সঙ্গে জড়িত ছিল অনেক অন্ধ বিশ্বাস। আমাদের দেশে মনে করা হতো, গুটি বসন্ত রোগ হয়, "শীতলা" দেবীর কোপে। হিন্দুরা গুটি বসন্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘটা করে শীতলা দেবীর পুজা করতেন। হিন্দুরা মনে করতেন কলেরা রোগ হয় ওলাই চন্ডি দেবীর কোপে। মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, কলেরা বা ওলাওঠা রোগ হয় "গুলা বিবির" কোপে। তাঁরা গুলা বিবির মূর্তি গড়ে পুজা না করলেও গুলা বিবিকে শান্ত করবার জন্যে অনেক ক্রিয়া কান্ড করতেন। এর মধ্যে একটি হলো, ঘর বন্ধ করা। মনে করা হতো, অনেক ফকির পারে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে ঘর বন্ধ করতে। এভাবে ঘর বন্ধ করলে সেই ঘরে বাসকারীদের আর কলেরা হবার সম্ভবনা থাকবে না। রাজশাহী অঞ্চলের ঘর বন্ধ করা ফকিরদের একটা মন্ত্র ছিল এই রকমঃ

আল্লা হলো তালা
মুহাম্মদ হলো খিল
আমার ঘর বন্ধ করে
ফিরিস্তা জিব্রাইল।

রাজশাহীর কোন কোন অঞ্চলে এরকম "ঘর-বন্ধ করা" ফকির এখনও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।এরকম ফকিরদের সঙ্গে পরিচিত এক ব্যক্তির কাছ থেকে আমি উপরের কলেরা থেকে ঘর বন্দের মন্ত্রটি পেয়েছি। গুটি বসন্ত এখন আর কারো হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ গুটি বসন্তের জীবানু নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) চেষ্টায়। পক্ষান্তরে কলেরার জীবাণু এখনও নির্মূল করা সম্ভব না হলেও এর সহজ চিকিৎসা প্রণালী এখন উদ্ভব করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আমরা এখন জানি, কলেরা জীবানু কিভাবে ছড়ায়। কলেরা জীবাণু মুক্ত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ এবং কলেরা জীবানু মুক্ত পানি যদি পান করা যায়, তবে কলেরা হবার সম্ভবনা থাকেনা। কারণ, কেবলমাত্র কলেরার জীবাণু পেটে গেলেই কলেরা হতে পারে। অন্য কোনভাবে কলেরা হওয়া সম্ভব নয়। এখন অনেক রোগেরই যথেষ্ট ভালো চিকিৎসা বের হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এই চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারেনা, কারণ তারা খুব গরীব। অধিকাংশ মানুষ ডাক্তারের ফি আর ঔষধ কেনার পয়সা যোগাতে পারেনা। ফলে মানুষ বিনা চিকিৎসায়, কুচিকিৎসায় মরে। অন্য দিকে কিছু নামকরা বড় চিকিৎসক ছাড়া, অন্য চিকিৎসকরা রোগীর অভাবে প্রায় আয়হীন হয়ে পড়ে। টাকার প্রাচীর রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখে। ফলে রোগী রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলেও ডাক্তার তাঁর কোন কাজে আসতে পারেনা। অন্য দিকে রোগ যন্ত্রণা দূর করার মতো জ্ঞান সম্পন্ন ডাকতারকে থাকতে হয় বেকার।

www.pathagar.com

রাজশাহী শহরে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন রাজা প্রসন্ন রায়। পরে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথ নাথ রায় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে এটাকে আধুনিক হাসপাতালে পরিণত করবার জন্যে অর্থ প্রদান করেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি পরিণত হয় সরকারী হাসপাতালে। পরিচিত হয় রাজশাহী সদর হাসপাতাল হিসেবে। সে সময় বাংলায় কলকাতার বাইরে এরকম হাসপাতাল বেশি ছিল না।

পাকিস্তান হবার পর, রাজশাহীতে আবদুল মজিদ নামক একজন উর্দুভাষী জেলা প্রশাসক (District Magistrate) আসেন। তিনি স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতায় স্থাপন করেন একটি মেডিক্যাল স্কুল, রাজশাহী সদর হাসপাতালকে নির্ভর করে (১৯৪৯)। পরে এই স্কুলটি সরকার গ্রহণ করে এবং স্কুলটি শেষে রূপান্তরিত হয় মেডিক্যাল কলেজে (১৯৫৮)। মেডিক্যাল কলেজের জন্য করা হয় নতুন বাড়ি ঘর। এই কলেজ থেকে ডিগ্রি পেয়ে ছাত্ররা প্রথম বের হয় ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে । রাজশাহীতে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ রোগ জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আরম্ভ হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে । পানি বিশুদ্ধ করার জন্য পানিতে ক্লোরিন যোগ করা হতো। এরকম বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা তখন খুব কম মফস্বল শহরেই ছিল। পুঠিয়ার রানী হেমন্ত কুমারী এই বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ৬৪ হাজার টাকা দান করেন। কিন্তু বর্তমানে এই শহরের পানি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া আগের মতো পানিকে ক্লোরিন দিয়ে বিশুদ্ধ করাও আর সম্ভব হচ্ছে না। শহরে পানীয় পানির সমস্যা একটা বড় সমস্যা। পৌরকর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র জনাব মিজানুর রহমান (মিনু) এই সমম্যা সমাধানের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। তবে সমস্যাটির সমাধান সহজ নয়। আপাতত কেবল এর আংশিক সমাধান সম্ভব হতে পারে।

একটা হিসাব অনুসারে রাজশাহী শহরের প্রতিদিন পানির চাহিদা হলো প্রায় ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ লিটার। সেখানে বর্তমানে সব মিলিয়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে মাত্র ১ কোটি ৮২ লিটারের কাছাকাছি। পানি সরবরাহ হয়ে উঠেছে রাজশাহী শহরের একটা বড় সমস্যা। আগে শহরে বেশ কয়েকটি দীঘি ছিল, যার পানি পান করা যেত। কিন্তু এখন এরকম দীঘি আর নেই।

শহরে আগে অনেক বাড়িতে পানির জন্য পাতকুয়া, ইঁদারা, নলকূপের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন পানি সরবরাহের এইসব ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়তে চাচ্ছে। এর একটা কারণ হলো ফারাক্কা ড্যাম। ভারত ফারাক্কা ড্যাম তৈরি করবার ফলে শুষ্ক মরশুমে পদ্মায় আর আগের মত পানি থাকছে না। ভূগর্ভস্থ পানি চুঁইয়ে চলে যাচ্ছে পদ্মায়। ফলে কুয়া আর নলকূপে আর আগের মত পানি পাওয়া যাচ্ছেনা ।

রাজশাহীতে টাইফয়েড-এর প্রকোপ বেশী হতে দেখা যাচ্ছে। টাইফয়েড রোগের জীবাণু ছড়ায় পানির মাধ্যমে। এছাড়া উদরাময় রোগেও মানুষ এ শহরে যথেষ্ট ভোগে। এই রোগের জীবাণুও প্রধানত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ তাই

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যগত কারণে বিশেষ প্রয়োজন। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, ১০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত একটি আধুনিক শহরে প্রতিদিন প্রয়োজন ৬২,০০০ মেট্রিকটন পানি, ২,০০০ মেট্রিকটন খাবার এবং ৯,০০০ মেট্রিকটন জ্বালানী। এর ফলে উৎপান্ন হয় ৫,০০,০০০ মেট্রিকটন ময়লা পানি, ২,০০০ মেট্রিকটন কঠিন বর্জ্য এবং প্রায় ১,০০০ মেট্রিকটন বায়ু-দূষক। বিভিন্ন শহরে লোক বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে (বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ। ডঃ এফ.এম. মনিরুজ্জামান)। অন্যান্য দেশে যেমন বড় বড় শহর আছে, আমাদের দেশে তা নেই। সে সব দেশের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, বড় শহরে যারা বাস করে, তাদের তুলনায় সে সব দেশের গ্রামের লোকের গড় আয়ু বেশী। এমন কি শহরে সম্পন্ন মানুষের তুলনায় গ্রামের স্বল্প বিত্ত মানুষের গড় আয়ু বেশী হতে দেখা যাচ্ছে। শহরে ঘটছে বায়ু দূষণ, ঘটছে শব্দ দূষণ। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, শব্দ দূষণের ফলে বড় শহরে শতকরা ৩০ ভাগ লোক বিরক্তি প্রবণতা, মানসিক উত্তেজনা, স্নায়বিক দুর্বলতা, বদ হজম ও অবসন্নতায় ভুগতে পারে। এসব দূষণ ক্ষতিকর হয়ে উঠছে মানুষের জন্য। বড় শহরের চাইতে মানুষের জন্য প্রয়োজন ছোট গোছাল শহর। সুন্দর পরিবেশ প্রকৃতির দান নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। বিজ্ঞ মানুষ জীবাণুজনিত রোগ সমূহকে এখন বিশেষভাবে দমন করতে পারছে। অনেক জীবাণুজনিত রোগ একসময় ভয়ঙ্কর ছিল, কিন্তু এখন আর তারা ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু আমাদের সব রোগই জীবাণুজনিত কারণে হয়না। রাজশাহী অঞ্চলে, দেশের অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মতো, অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। যা কেবল উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমেই নিবারিত হওয়া সম্ভব। এই অঞ্চলের অনেক শিশু যথেষ্ট পরিমাণে A ভাইটামিন পায়না। ভাইটামিন A-র অভাবে অনেক শিশু অন্ধ হয়ে যায় (জেরাপথেলমিয়া)। মানসিক অশান্তি মানুষকে রোগগ্রস্থ করে তুলতে পারে (Psychosomatic Disease)। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মানুষ বেশি অসুখে ভোগে। মানুষ যখন উদ্বিগ্ন হয়, বিরক্ত হয়, তখন তার রক্তের চাপ বাড়ে। কিন্তু উদ্বেগ ও বিরক্তি কেটে গেলে আবার রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে। কেউ যদি বেশি উদ্বিগ্ন হয়,বিরক্ত হয়, সব সময় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকে, তবে সে স্থায়ীভাবে উচ্চ-রক্তচাপ সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। তার রক্ত বহা ধমনীতে স্থায়ী পরিবর্তন আসতে পারে। আমাদের চিন্তা-চেতনা, আমাদের দৈহিক পরির্বতন ঘটাতে পারে। যার ফলে আমরা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। আমরা সুস্থ থাকবো, না অসুস্থ হয়ে পড়বো,তা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের জীবন দর্শনেরও উপর। যারা অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, এমন মানুষ মানসিক কারণে অসুস্থ হয় কম। স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ধারণায় বিগত পঞ্চাশ বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। চিকিৎসক এখন চান রোগীর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হতে। কেবল শারীরিক লক্ষণের উপর নির্ভর করে রোগ বিশ্লেষণ করতে চান না। কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, রোগ-ব্যাধি কমাবার জন্যে মানুষের মানসিক পরিবেশেরও উন্নতি ঘটাতে হবে। আমরা সমবেত চেষ্টায় সকলে সকলকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করতে পারি।

www.pathagar.com

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
ক্ষেত-খামার

রাজশাহী শহরের এখন যেখানে মেডিক্যাল কলেজ, আগে সেখানে ছিল একটা সরকারী কৃষি-খামার। কৃষি-খামারটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে। এসময় বাংলায় এরকম সরকারী কৃষি-খামারের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। রাজশাহী কৃষি-খামারের আয়তন ছিল পঁচিশ হেক্টরের কাছাকাছি (৬৩ একর)। ফার্মটা করা হয়েছিল প্রধানত ইক্ষুচাষের উন্নতি বিধান এবং দেশে গোল আলু চাষের ব্যাপক প্রচলন ঘটাবার জন্য। গোল আলু (Solanum tuberosum) ছিল দক্ষিণ আমেরিকার গাছ। সেখান থেকে, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর, তা নীত হয় ইউরোপে। ইউরোপ থেকে তা আসে আমাদের দেশে। এদেশে প্রথমে মানুষ গোল আলু খেতে চাইতো না। তাই সরকারী খামারে গোল আলু চাষ করে মানুষকে গোল আলু চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করা হতো। গোল আলু এখন রাজশাহী অঞ্চলের একটি বিশেষ ফসল এবং ধান, গমের পর তা এখন হয়ে উঠে মানুষের প্রধান খাদ্য। এই অঞ্চলে গোল আলু সুরক্ষণের জন্যে এখন নির্মিত হতে পেরেছে একাধিক হিমাগার (Cold Storage)।

রাজশাহীর পান (Piper betle)খুব বিখ্যাত। রাজশাহীতে একসময় রেশম উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে তুঁত গাছের চাষ করা হতো। কিন্তু বিশ্বের বাজারে ইংরাজ আমলে বাংলাদেশের রেশমের চাহিদা কমে যাবার পর রাজশাহী অঞ্চলে তুঁত চাষের পরিবর্তে পান চাষ করা আরম্ভ হয়। যেসব জমিতে তুঁত গাছ লাগান হতো, সে সব জমিতে লাগান হতে থাকে পান, পান বরজ করে। পান অন্য ফসলের মতো চাষ করা যায়না। পান ছায়াতে চাষ করতে হয়। তাই পান গাছকে ঢেকে রাখবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন করে। যাকে বলে বরজ।

রাজশাহী অঞ্চলে ক্রমে ইক্ষু চাষও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ, নতুন সংকর জাতের ইক্ষু উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়। দক্ষিণ ভারতে কয়েমবাটর নামক স্থানের ইক্ষু গবেষণাকেন্দ্রে এই আখ উৎপাদন করা হয়। যা আমাদের দেশেও আবাদ করবার পক্ষে ছিল উপযুক্ত। কাশ ফুল (Saccharum spontaneum) এবং সাধারণ আখ (S. officinarum) এর মধ্যে সংকর ঘটিয়ে উৎপাদন করা হয়েছিল প্রথম এই সংকর আখ।

গ্রামের জীবনধারাতে এসেছে অনেক পরিবর্তন। আগে কেবল গরুতে টানা কাঠের লাঙ্গল দিয়ে চাষ-আবাদ করা হতো। কিন্তু এখন চাষ-আবাদ করবার কাজে পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্ষেতে পানি দেবার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে স্যালো পাম্প। এসব যন্ত্রপাতি সরাবার জন্য গ্রামে এখন সৃষ্টি হচ্ছে এক নুতন কারিগর শ্রেণী। যার কোন প্রয়োজন আগে হতো না। ছুতার কামার ছিল। কিন্তু এরকম মিস্ত্রি ছিলনা। কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগ মানুষকে

www.pathagar.com

অধিক কর্মতৎপর করে তুলেছে। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে অনুপ্রাণিত করছে। গ্রামের পথঘাট এখন আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। গ্রাম থেকে মানুষ সহজেই শহরে আসতে পারছে। গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার ধরন নানাভাবেই সমতা পেতে যাচ্ছে। কৃষিজীবী মানুষ আর আগের মত "চাষা" বলে অবহেলিত হচ্ছে না। একদিন যা সে হতো। গত পঞ্চাশ বছরে মানুষের মর্যাদা বেড়েছে, কমেনি। আমার মনে পড়ে, গ্রামের কৃষকরা একসময় জমিদার পুত্র অথবা জমিদারকে গড় হয়ে প্রণাম করেছে। কিন্তু এখন এদেশে মানুষ কাউকে আর ওভাবে মাথা নত করে সালাম করতে চায় না। এটাকে একটা বড় ধরনের মানসিক পরিবর্তন বলেই চিহ্নিত করতে হবে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে জন রাসেল আসেন এই উপমহাদেশের কৃষি-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সরকারকে কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদান করতে। রাসেল ছিলেন একজন নামকরা মৃত্তিকা বিজ্ঞানী। জমিতে সার প্রদান করবার ব্যাপারে একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তিনি তাঁর রিপোর্টে লেখেন, কৃষিতে উন্নতি না হবার কারণ যতনা প্রযুক্তিগত, তার চাইতে অনেক বেশি হলো সামাজিক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষিতে উন্নতির কারণ হলো, সেখানে গ্রামে আছে একটা কৃষি ভিত্তিক আরিস্টক্রেসি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু এখানে গ্রাম এরকম আরিস্টক্রেসি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেই। গ্রামকে উন্নত করবার মত লোকের অভাবেই গ্রামের উন্নতি হচ্ছে না, হচ্ছে না কৃষির উন্নতি। শিক্ষিত লোক থাকতে চাননা গ্রামে। গ্রামবাসীকে নেতৃত্ব দেবার লোকের অভাব এখানে খুব বেশী। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে থেকে অবস্থা এখন অনেক বদলেছে। এখন বাংলাদেশের গ্রামেও একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুটা সৃষ্টি হতে পেরেছে। যারা নেতৃত্ব দিতে পারছেন গ্রামের মানুষকে। আমাদের কৃষি এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদনশীল হতে পেরেছে। তা নাহলে লোকসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, তাতে আরো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতে পারতো দেশে। ম্যালথাস বিশেষভাবেই সত্য হয়ে উঠতো।

অবশ্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যেয়ে আমরা যেসব পন্থা অবলম্বন করছি, তা গ্রহণ করা উচিত কি-না, তা নিয়েও আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যেমন, আমরা এখন যেভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচের কাজে ব্যবহার করছি, তাতে অনেক অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির অভাব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ভারতে অনেক অঞ্চলে সেচের কাজে ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে পানি সরবরাহ করতে যেয়ে এরকম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিশেষকরে হিমাচল প্রদেশে। রাজশাহী অঞ্চলেও ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে পানি তুলে চাষ-আবাদ করতে যেয়ে কিছু কিছু স্থানে এখন সাধারণ নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। কূয়া শুকিয়ে যাচ্ছে। পুকুরে পানি থাকছে না। বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির পানি মাটির মধ্যে জমা হয়। এই পানিই হলো ভূ-গর্ভস্থ পানি। গভীর নলকূপের সাহায্যে এই পানি তুলে সেচের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি বছর বর্ষাকালে যে পরিমাণ বৃষ্টির পানি মাটির নীচের স্তরে জমা হতে পারে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচের কাজে ব্যবহার বিধেয়। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, বর্ষাকালে এই অঞ্চলে মাটির নীচের স্তরে যে পরিমাণ পানি জমা হচ্ছে, তা গভীর নলকূপের সাহায্যে তুলে সেচের কাজে ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে সঞ্চিত পানির ঘাটতি হতে পারেনা। কিন্তু অন্য অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন পারে। বিষয়টি হয়ে উঠেছে বিতর্ক মূলক।

www.pathagar.com

তবে আপাতত আমরা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করছি ফসল উৎপাদনের জন্য। যা আগে ছিল অজ্ঞাত। এই সেচ ব্যবস্থা আমাদের কৃষিতে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সারা বছর ধরে ধান চাষ এবং রবি মরশুমে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

চাষ আবাদ কেবল প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করেনা। করে অর্থনৈতিক চাহিদার উপর। অর্থনৈতিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে একটা দেশের কৃষিতে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

পুরাকাল থেকেই আমাদের দেশে পাটের চাষ হয়ে আসছে বলে মনে হয়। পাটের আঁশ থেকে প্রস্তুত কাপড়কে বলা হতো পট্টবস্ত্র। পাট থেকে সতরঞ্জি তৈরি করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশে পাটের আবাদ প্রাধান্য পায় ইংরাজ আমলে। বিলাতে তিসির আঁশ আমদানী করা হতো রাশিয়া থেকে। স্কটল্যান্ডের ডান্ডি ছিল তিশির আঁশ থেকে লিনেন তৈরির প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বৃটেনের সঙ্গে যখন রাশিয়ার ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে, তখন তিসির আঁশের বিকল্প হিসাবে পাটের প্রতি ডান্ডির নজর পড়ে। কারণ এ সময় রাশিয়া থেকে বৃটেনে তিসির আঁশ আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পাটের বিরাট চাহিদা দেখা দেয়। পাট বিশ্বের বাজারে অন্যতম সস্তা এবং প্রয়োজনীয় তন্তু হয়ে দেখা দেয়। প্রথমে বাংলাদেশের পাটের ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ ও স্কচ কোম্পানীর হাতে ছিল। কৃষকরা পাট উৎপাদন করবার পরে তার ক্রয় বিক্রয় ও গুদামজাত করা ও বিদেশে রপ্তানীকরণ ছিল ইংরাজ ও স্কচ কোম্পানীসমূহের কাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাড়োয়াড়ীরা পাট ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। তারা অনেক সাহেব কোম্পানী গুদাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এক সময় নওগাঁর আত্রাই থেকে র‍্যালিব্রাদার্স কোম্পানী পাট ক্রয়করে বিদেশে চালান দেবার ব্যবস্থা করতো। পরে তা প্রধানত দিতে থাকে মাড়োয়াড়ীরা। আত্রাই-এর মোল্লা পরিবারও পাট ব্যবসায়ে বেশ কিছুটা খ্যাতি পান। দরিদ্র পাটচাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলনা। ফলে কাঁচা পাটের দাম নির্ণয়ে তাদের কোন হাত ছিল না। তারা পাট মজুত করে রেখে ন্যায্য দাম না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতো না। তাছাড়া চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে কৃষকরা টাকা ধার নিয়ে সংসার চালাত। পাট কাটা হলে সেই টাকা তারা সুদে-আসলে শোধ করতে বাধ্য হতো। ফলে তারা পাট বিক্রির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তো এবং পাট কোম্পানীগুলি খুব সস্তায় পাট কিনবার সুযোগ পেয়ে যেত। পাট একসময় হয়ে উঠেছিল, বৃটিশ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উপায়। এরপর তা হয়ে ওঠে সাবেক পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উপায়। কিন্তু বাংলাদেশ হবার পর পাটের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে আর আগের মতো থাকেনা। পাটের চাষ এখন তাই উঠে যেতেই বসেছে। বিশেষকরে রাজশাহী অঞ্চল থেকে।

সামাজিক কারণেও অনেক গাছের চাষ সীমিত অথবা বন্ধ হতে পারে। একসময় নওগাঁতে গাঁজার (Cannabis sativa) চাষ করা হতো। কিন্তু গাঁজার নেশা ক্ষতিকর বিধায় এর চাষ তুলে দেওয়া হয়েছে। ভাং, সিদ্ধি, গাঁজা হলো একই গাছ। বুনো গাঁজার গাছকে বলে ভাং বা সিদ্ধি। ভাং বা সিদ্ধিকে ইংরাজিতে বলে মারিজুয়ানা (Marijuana)। যে উপক্ষার

www.pathagar.com

(Alkaloid) থাকবার জন্য গাঁজার ধূমপান করলে নেশা হয়, সিদ্ধিতেও তা থাকে; কিন্তু থাকে অনেক কম মাত্রায়। আমাদের দেশে আউল, বাউল, সাধু, সন্ন্যাসিরা গাঁজা খেয়ে নেশা করে নানারকম স্বপ্ন দেখতেন আর ভাবতেন, তাঁরা লাভ করছেন এক অমর্ত্যলোকের সন্ধান। গাঁজার ধূমপান খুব প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেও এর প্রচলন ছিল। নওগাঁতে স্ত্রী গাঁজার গাছ বিশেষ যত্ন সহকারে আবাদ করে খুব উৎকৃষ্ট গাঁজা প্রস্তুত করা হতো। এর জন্যে নওগাঁ লাভ করেছিল সারা বাংলায় খ্যাতি। এখন গাঁজার চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চোরাইপথে এখানেও কখনো কখনো এসে পৌঁছায় মারিজুয়ানা সিগারেট। অবশ্য এই সিগারেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তৈরি নিষিদ্ধ। এছাড়া ভারত থেকে গাঁজা এসে থাকে।

অনেক জায়গায় ঐতিহ্যগতভাবে অনেক ফসলের চাষ হতে দেখা যায়। নওগাঁতে মাদুর-কাটি (Cyperus tegetum) বলে একটি গাছের আবাদ করা হয়। সেখানে এই গাছের সাহায্যে মাদুর প্রস্তুত করে বিক্রি করা হয়। মাদুর-কাটি নওগাঁর একটি অর্থকরী ফসল। নওগাঁর তৈরি মাদুর সারা দেশেই বিখ্যাত।

একসময় বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে প্রচুর খেজুরের গুড় উৎপাদিত হতো। কিন্তু এখন আগের মতো হয় না। কারো কারো মতে- 'গুড়' শব্দ থেকে এককালের বাংলার রাজধানী গৌড়, এর নামকরণ হয়েছিল। গৌড় গুড়ের জন্যে বিখ্যাত ছিল। এই গুড় ছিল খেজুরের গুড়, আখের গুড় নয়।

রাজশাহীর চারঘাট থানায় যথেষ্ট খয়ের তৈরি হয়। সারা দেশের খয়ের একসময় এখানেই তৈরি হতো। পানের সঙ্গে এদেশের মানুষ খয়ের খেয়ে থাকেন। খয়ের প্রস্তুত হয় খয়ের গাছের (Acacia catechu) কাঠকে কুচি কুচি করে কেটে সিদ্ধ করে প্রাপ্ত ক্বাথ থেকে। খয়ের গাছের ব্যাস যখন ৩০ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি হয়, তখন সেইসব খয়ের গাছকে কাটা হয়। গাছের বাকল এবং বাইরের দিকের কাঠকে কেটে ফেলে ভিতরের গাঢ় বাদামী রংয়ের কাঠকে কুচি কুচি করে কেটে পানিতে সিদ্ধ করা হয়। এই সিদ্ধ করবার ফলে কাঠ থেকে এক প্রকার গাঢ় বাদামী রংয়ের নির্যাস পাওয়া যায়। এই নির্যাসকে ছেঁকে নিয়ে গরম করে খয়ের প্রস্তুত করা হয়।

ইংরাজ আমলের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, তখনকার রাজশাহী জেলায় যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হতো, তাতে এই জেলার সে সময়ের লোক সংখ্যার দ্বিগুণ লোকের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল। রাজশাহী জেলায় মসুরির ডাল খুব বেশী উৎপন্ন হতো। সে সময়ের যশোর ও রাজশাহী জেলা ছিল মসুর (Lens esculenta) উৎপাদনে আর সব জেলায় উর্দ্ধে। সে সময়ের রংপুর এবং রাজশাহী জেলায় সবচেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হতো। গম সাধারণত লাগান হতো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যেখানে শীতকালে সেচের পানি ছিল সহজলভ্য।

www.pathagar.com

ধান চাষের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগে যেসব জাতের ধান আবাদ করা হতো এখন তার আর আবাদ করা হয় না। যেমন, মুড়ি ও খৈ তৈরি করবার জন্যে আবাদ করা হতো 'কনকচুর' ধান। কেবল খই ভাজবার জন্যে বিশেষভাবে আবাদ করা হতো 'পক্ষীরাজ' ধান। অনেক রকম সুগন্ধি চাল কিনতে পাওয়া যেত রাজশাহীর বাজারে। যেমন 'বাসফুল', 'চিনি আতপ', 'খেরসা পাত'। সাধারণ লোকে এক রকম মোটা চাল খেত। তাকে বলা হতো 'গজে'। একরকম চিকন চাল ছিল, তাকে বলা হতো 'এলাই'। যেটা সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তরা বিশেষভাবে পছন্দ করতেন।

মুসলমানরা সাধারণত ধনী ছিলেননা। কিন্তু ভাল খাবারের প্রতি তাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তারা পোলাও রান্নার জন্যে সুগন্ধি সরু আতপ চাল ব্যবহার করতেন। অনেক রকম ভাবে রান্না মাংসের সঙ্গে মুসলমান বাড়ীতে পোলাও খাবার প্রচলন ছিল। অনেকে টাকা ধার করেও ভাল খাবার চেষ্টা করতেন এবং সর্বশান্ত হতেন।

ইংরাজ আমলে যে গম (Triticum vulgare) আবাদ করা হতো, তাদের মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে দুটি জাত, 'দুধিয়া' এবং 'জামালী' ছিল প্রধান। এখন এসব জাতের গমের আবাদ আর করা হয়না। কৃষিতে এখন উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের আবাদ করা হচ্ছে। যাদের উদ্ভব খুব বেশী দিন আগে হয়নি। এসব জাতের অনেকে এসেছে যথেষ্ট দূর দেশ থেকে।

আগে রাজশাহী অঞ্চলে গমের আবাদ হলেও তা একটা প্রধান খাদ্যশস্য ছিলনা। কিন্তু বিখ্যাত উদ্ভিদ প্রজননবিদ নম্যান বরলগ্ যেসব গমের জাত উদ্ভব করেন, তা অনেক তাপ সহ্য করতে পারে। ফলে উষ্ণ অঞ্চলেও তাদের চাষ করা চলে। তাই বিগত ৩০ বছরের মধ্যে গম হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। মানুষের খাদ্যাভ্যাস বদলে যাচ্ছে। শীতকালে রাজশাহী অঞ্চলে গম উৎপাদন করা হয়েছে যথেষ্ট সহজ। তাই রুটি খাবার চল বেড়েছে।

একসময় বাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। এখন তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হতে চলেছে গোল আলু এবং গম। ইউরোপে অনেক দেশে এখন গমের স্থান গোল আলুই দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশে গোল আলু বিগত কয়েক বছরে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে।

আবুল কাশেম ফজলুল হক্ (ফজল-আল্-হক্) সাহেব প্রথম বাংলার কৃষি উন্নয়নের জন্যে ঢাকায় তেজগাঁতে একটি উচ্চ কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ইংরাজ আমলেই। এরপর ময়মনসিংহে পাকিস্তান আমলে (১৯৬১) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজশাহীতে এখন একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি বিষয়ে এখন সারাদেশে অনেকে পড়াশুনা ও গবেষণা করছেন। দেশে এখন কৃষি বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রও আছে একাধিক।

www.pathagar.com

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অন্নদাশঙ্কর রায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি বলেছেন, "টলস্টয়ের প্রভাবে পড়ে আমার আদর্শ ছিল আত্মসম্মান সম্পন্ন শিক্ষিত কৃষক। যাকে কেউ শোষণ করতে সাহস পাবেনা। শাসক যাঁরা তারাও সমীহ করবেন। তাই আমার হাতে যখন পরিচালনা এল তখন আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় গাঁজামহালের হাই স্কুলকে করতে গেলুম সাধারণ হাই স্কুলের থেকে ভিন্ন প্রকার। জুড়ে দিলুম তার উপরের দিকে চাষের ক্লাস। ছাত্ররা পড়াশুনা করবে, চাষবাসও করবে। চাষবাসের শিক্ষা দেবেন কৃষি বিদ্যায় শিক্ষিত একজন ডেমনস্ট্রেটর। স্কুলের অবস্থান শহর থেকে দূরে। চারদিকে গ্রাম। ছাত্ররা কৃষকের ছেলে। সকলেরই ক্ষেত খামার আছে। আধুনিক পদ্ধতিতে আবাদ করলে অনায়াসেই ভাল ফসল পাবে। চাকরি করতে যাবে কেন ? চাকরির উপর থেকে চাপ কমবে। শহরের উপর চাপ পড়বে কম।

কালচার এণ্ড অ্যাগ্রিকালচার। এই ছিল আমার মটো। ..... কিন্তু দেখা গেল যাদের জন্যে স্কুল তারা অর্থাৎ গাঁজামহালের চাষী মুসলমানরা তাদের ছেলেদের চাষী করবে না, চাকুরে করবে। স্কুলের কৃষি ক্লাসে একটির বেশি ছাত্র নেই। সেটিও বামুনের ছেলে। পাস করে চাষ করবে না, পড়াশুনায় কাঁচা বলে তার অভিভাবক তাকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছেন। সে পাস করে বেরোলে ডেমনস্ট্রেটর হবে। এই একটি ছাত্রের জন্যে এত বড় আয়োজন ! আমি দমে যাই। ওদিকে একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন স্কুলটাকে উঠিয়ে দিতে। আমার বদলীর পর সেটা বোধহয় দুবছর বাদে উঠে যায়। আমার উৎসাহ চলে যায়।

ঢাকায় অধ্যাপক শহীদুল্লাহ্ ছিলেন আমার প্যারিসের আলাপী। আবার নতুন করে আলাপ জমে ওঠে। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি যা বলেন তার মর্ম চাষীর ছেলেরা তো বাপের সঙ্গে মাঠে গিয়েই চাষ শেখে। স্কুলে গিয়ে আর নতুন কি শিখবে ! জমির উপরে চাপ খুব বেশি। চাষীর সবকটি ছেলের জন্যে এত জমিইবা কোথায় ! সেইজন্যে চাষী তার ছেলেদের অন্তত একজনকে পাঠায় স্কুলে পড়াশুনা করতে। পাস করে চাকরি নিয়ে শহরে যেতে।

তার মানে গ্রামের উপর চাপ কমবে। শহরে ভিড় বাড়বে। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা।বোঝা গেল কেউ চাষ করবে না। না হিন্দুর ছেলে, না মুসলমানের ছেলে। সবাই করবে চাকরি। তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। মারামারি। ভাগাভাগি। তখনো মালুম হয়নি যে ভাগাভাগি করতে করতে ঘটবে দেশ ভাগ ও প্রদেশ ভাগ।....." অন্নদাশঙ্কর বাবুর চিন্তার যে রাজনৈতিক চেতনা ফুটে উঠেছে, তা হলো মুসলমানরা কেবল চাষ-আবাদ করলে রাজনীতির ধারা ভিন্ন হতো। তা না করে তারা চাইলো চাকরি করতে। ফলে দেখা দিল দেশ ভাগ। অন্নদাশঙ্কর বাবু, শুনেছি, বাংলাদেশ হওয়াতে খুশীই হয়েছিলেন। বাংলার মুসলমান কেবল ক্ষেত চাষ করলে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হতো, এমন কথা কিন্তু ভাবা যায় না।

www.pathagar.com

ব্রিটিশ দার্শনিক, C. E. M. Joad -এর About Education বলে একটি বই আছে। জোয়াড বইটির এক জায়গায় বলেছেন, ডেনমার্ক-এর কৃষি খুব উন্নত। এর একটা কারণ হলো সে দেশের সাধারণ শিক্ষার (general education) মান খুব উন্নত। সে দেশে কৃষি জীবনে বিরাট রূপান্তর ঘটবার আগেই ঘটতে পেরেছিল শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন। সাধারণ শিক্ষাকে উপেক্ষা করে মানব চিন্তার জাগরণ সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষার উন্নতি বিধান ছাড়া জাতীয় জাগরণ আসতে পারে না। সাধারণ বুদ্ধি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। তা সর্বক্ষেত্রই কাজে লাগে। তাঁর মতে, শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে ঃ ছেলেমেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্যে উপযুক্ত করে তোলা; গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাতে নাগরিক হিসাবে তারা কাজ করতে পারে,তার জন্যে তাদের উপযুক্ত করে তোলা; তাদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তি ও যুক্তি যোজন ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

আমি এক সময় কৃষিবিদ্যার ছাত্র ছিলাম। কৃষিবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যায় শিক্ষকতা করেছি অনেকদিন। কিন্তু জোয়াড-এর বক্তব্যকে আমার যথেষ্ট গ্রহণীয় মনে হয়। আমি দেশে সাধারণ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্বদানের পক্ষে। টলস্টয়ের মতো কৃষক হওয়া কেবলমাত্র একটা কাল্পনিক বিশ্বের বিষয় হতেই পারে। অন্নদাশঙ্কর বাবুর চাকরি জীবন, I.C.S ভুক্ত হবার পর, প্রথম আরম্ভ হয় নওগাঁর এস ডি ও হিসাবে। এরপর কিছুদিন তিনি রাজশাহী জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, যার প্রভাব বাংলাদেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের উপর যথেষ্ট পড়েছে। এছাড়া আছে তাঁর লেখা একাধিক উপন্যাস। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে এদেশের কৃষিজীবী মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের, কোন চিত্র ধরা পড়েনি। বাংলাদেশ কৃষকের দেশ। সে কৃষকের অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু তাদের জীবন চিত্র ধরা পড়েনি অন্নদাশঙ্কর বাবুর লেখায়। একজন হিন্দু লেখকের লেখায় মুসলমান কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র কিছুটা ধরা পড়েছে। তিনি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। অচিন্ত্য বাবু কিছুদিন নবাবগঞ্জে মুনসেফ ছিলেন। তখন নবাবগঞ্জ অবশ্য ছিল মালদহ জেলার অংশ।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
জীবিকার আর সব উপায়

ইংরাজ আসবার আগে এদেশের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল কৃষি এবং হস্ত শিল্পের (Handicraft Production) উপর। ইংরাজ এদেশে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করবার আগে এদেশে ছিল সমৃদ্ধ কুটির শিল্প। হস্তচালিত তাঁতে তৈরি হতো কাপড়, যা কেবল এদেশের প্রয়োজন পূরণ করতোনা, বিশেষভাবে চালান যেত বিদেশে। কিন্তু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে বিলাতে আরম্ভ হয় কলকারখানা বিপ্লব (Industrial revolution)। বিলাতের কলে তৈরি কাপড়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না এদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্প। দেশের শাসন ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে থাকায়, বিদেশী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক আরোপ করা সম্ভব হয়না। ইংরাজ আমলের একটা বিশেষ ঘটনা হলো, আমাদের দেশের সমৃদ্ধ কুটির শিল্পের ধ্বংস আর এরজন্য জমির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি। কিন্তু কুটির শিল্প বিনষ্ট হলেও একেবারে যে উঠে যায়, তা নয়। মানুষ অনেক কিছুর জন্যে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হলেও সব কিছুই যে বিদেশ থেকে আসত তা নয়। দেশী পণ্যও অনেক প্রয়োজন পূরণ করত। আর সে সব পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হতো। বিদেশী পণ্যে বাজার ভরে গেলেও গ্রামীণ জীবনের প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজ করে চলেছে তন্তুবায়, কামার, কুমার, কাঠমিস্ত্রিরা। কাঠমিস্ত্রিরা বানিয়েছেন আসবাবপত্র। বানিয়েছেন নানা রকম নৌকা। বানিয়েছেন গরুগাড়ী। নৌকা আর গরু গাড়ী ছাড়া এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা কিছুদিন আগেও ভাবা যেতনা। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে এদের গুরুত্ব এখনো কম নয়।

রাজশাহী শহর ছিল জেলা সদর। এখানে সরকারী অফিস আদালতে অনেকে চাকরী করেছেন। ইংরাজ আমলে একসময় রাজশাহী, মালদহ ও পাবনা নিয়ে ছিল একটি মাত্র জজকোর্ট। যার অবস্থিতি ছিল রাজশাহী শহরে। রাজশাহী শহরে মামলা মোকদ্দমা উপলক্ষে আসতে হতো অনেক ব্যক্তিকে। অন্যান্য অনেক শহরের তুলনায় এখানে উকিল, মোক্তারের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এছাড়া এ শহরে ছিল একাধিক হাই স্কুল। ছিল একটি নামকরা কলেজ। রাজশাহী শহরের একটা পাড়ার নাম ছিল মাস্টার পাড়া। আর একটা পাড়ার নাম ছিল প্রফেসর পাড়া। এক এক জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত শহরের এক এক এলাকায় বাস করতেন। যারা বাজারে সব্জি বেচত, তারা থাকতো সব্জি পাড়ায়। যারা সরষে থেকে তেল বানাতো তারা থাকতো সাহাজি পাড়ায়। রাজশাহীর কাছে পদ্মায় একসময় প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়তো। শহরের কাছ ঘেঁসে নদীর ধারে ছিল বিরাট জেলেদের পল্লী। শহরের মধ্যেও এক জায়গায় অনেক জেলে বাস করত। যার নাম ছিল মালোপাড়া। শহরে অনেক গোয়ালা ছিল, যারা বাস করতো গোয়াল পাড়ায়।

অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় রাজশাহীতে তন্তুবায় ছিল কম। এখানে কোন তাঁতি পাড়া ছিলনা। শহরের কাছে একটা পাড়ার নাম ছিল ভেড়িপাড়া এখানে মানুষ ভেড়ার

www.pathagar.com

লোম দিয়ে মোটা কম্বল বানাত। কম্বল যারা বানাত, তারা সবাই ছিল বিহারী হিন্দু। এরা একসময় এসেছিল বিহার থেকে। রাজশাহী শহরের একটা পাড়ার নাম ছিল বেলদার পাড়া। বেলদার হলো হিন্দুদের মধ্যে একটি নিম্ন বর্ণের জাতির নাম। যাদের কাজ ছিল মাটির খোলা ও চাড়ি তৈরি এবং কুয়ো খোঁড়া।

রাজশাহী শহরে অনেক পাউরুটি এবং বিস্কুটের দোকান ছিল। যারা বহু রকম রুটি-বিস্কুট বানাত, তারা যে জায়গায় থাকতো, তার নাম ছিল রুটিআলা পাড়া।

রাজশাহী শহরে অনেকের জীবিকার উপায় ছিল 'টমটম' গাড়ী চালান। টমটম গাড়ী এখন আর শহরে তেমন চলতে দেখা যায় না। টমটম হলো এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার বিশেষ ধরনের গাড়ী। এতে কোন ছাউনি থাকেনা এক্কা গাড়ীর মতো। ইংরাজি ভাষায় Tandem বলে একটা শব্দ আছে। ট্যানড্যাম বলতে বোঝায় একটার পর একটা ঘোড়া জোতা, অথবা উক্তভাবে জোতা অশ্ববাহিত গাড়ী। কিন্তু টমটম হলো এক ঘোড়ায় টানা গাড়ী। 'টমটম' শব্দটার কিছুটা মিল আছে, 'ট্যানড্যাম'-এর সঙ্গে। কিন্তু ট্যানড্যাম আলাদা ধরনের ঘোড়ায় টানা গাড়ী। রাজশাহী শহরে অনেক গরীব মুসলমানরা টমটম চালাতো। কিন্তু কেবল মুসলমানরাই যে টমটম চালাতো তা নয়। অনেক হিন্দুও টমটম চালাতো। কিন্তু এরা এসেছিল প্রধানত বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের বালিয়া অঞ্চল থেকে। এরা ছিল হিন্দী ভাষী। এরা থাকতো অন্যদের থেকে পৃথকভাবে। এরা ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু। যাদের বলে 'দোসাদ'। এরা ঘটা করে 'ছট' পুজা করতো। 'ছট' হলো সূর্যদেবতা বা তার ছটার পূজা। সূর্য হলো এদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এরা এখন অধিকাংশই ভারতে চলেগিয়েছে। রাজশাহী শহরে এখন টমটম গাড়ী প্রায় চলতে দেখা যায়না। যদিও একসময় তা-ই ছিল এই শহরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর "সেকালের স্মৃতি গ্রন্থে" লিখেছেন ঃ "এই টমটমগুলি যে কি পদার্থ, তাহা না দেখিলে তাহাদের চেহারা ধারণা করা যায়না। পশ্চিমের এক্কা তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক আরামদায়ক যান। চারিজন আরোহী তাহাতে অতিকষ্টে বসিতে পারে। তক্তার উপর দুর্গন্ধময় মলিন, শতছিন্ন কাঁথা বা কম্বল ভাঁজ করিয়া পাতিয়া রাখে, তাহাই আরোহীদের আসন ও তাহার সম্মুখে একটু নীচে যে অপ্রশস্ত তক্তা প্রসারিত, তাহাই সারথির সিংহাসন; তাহার উপর সে পা ঝুলাইয়া বসিয়া, জিহ্বা ও তালুর সংস্পর্শে এক রকম শব্দ করিতে করিতে টমটমের অস্থিচর্মসার, খর্ব্বকার, পুকুরে ঘোড়াটাকে হাতের দন্ড দিয়া নির্দ্দয়রূপে পিটিতে থাকে। ঘোড়া চলিতে চলিতে দশ পনেরবার থমকিয়া দাঁড়ায়, কখন কখন চারি পা মুড়িয়া শুইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আরোহীরা আসনচ্যুত হইয়া গাড়োয়ানের পিঠে ডিগবাজি খায়! গাড়োয়ান তখন তাহার সিংহাসন হইতে নামিয়া এক হাতে ঘোড়াটাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে, আর এক হাতে ঘোড়ার মুখের দড়ির লাগাম ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করে; কিন্তু পচা দড়ির লাগাম সেই 'টাগ অব ওয়ারের' জুলুম বরদাস্ত করিতে না পারিয়া ছিঁড়িয়া যায়। অগত্যা গাড়োয়ান সেই লাগামে গেরো বাঁধিয়া ঘোড়াটাকে ধনঞ্জয়দানে অতি কষ্টে তুলিয়া, পুনর্ব্বার চালাইতে আরম্ভ করে। এইরূপে আরোহীরা 'খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হয়'; তবে সকল টমটম যে এরকম

www.pathagar.com

আরোহীভীতিদায়ক নহে, একথা বলাই বাহুল্য।"

এখন রাজশাহীর প্রধান যান হয়ে উঠেছে সাইকেল রিকসা। "জিন রিকিসা" শব্দটা জাপানি। এর অর্থ হলো "মানুষ টানা গাড়ী।" মানুষে টানা এধরনের গাড়ীর প্রথম প্রচলন হয় জাপানে। এইসব রিকসা চালকদের অনেকের চেহারা, পুরান দিনের হাড় জিরজিরে ঘোড়াদের কথাই যেন কিছুটা মনে করিয়ে দিতে চায় আমাদের মতো অনেক বৃদ্ধকে। আমার মনে পড়ে, আমি যে স্কুলে পড়তাম তার একজন শিক্ষক রাজশাহীর টমটম নিয়ে একটা গান বেঁধে ছিলেন। গানটা গীত হয়েছিল আমাদের স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভার উৎসবে। মনে পড়ে, গানটার কিছুটা অংশ ছিল এই রকম ঃ

রাজশাহীর টমটম
(রে ভাই) রাজশাহীর টমটম।
বায়া নহাটা যাবেন
এখুনি রেডি পাবেন
শেয়ারে গেলেই হবে
পয়সা কিছু কম।
পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে
আরামে ঘাড় বেঁকিয়ে
চলবে যে গম গম ॥

সে যুগে আমার পিতাকে মোটামুটি স্বচ্ছল বলা যেত। তিনি আমাকে শহরের সবচেয়ে ভাল স্কুলে পড়বার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমি মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান হলেও মিশতাম অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। টমটম চালাত এরকম লোকের ছেলের সঙ্গেও অনেক মিশেছি। বুঝেছি দিন চলত তাদের কত অনটনের মধ্যদিয়ে। এই শহরে অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে চলেছে অধিকাংশ মানুষেরই জীবন। জিনিসের দাম তখন সস্তা ছিল। কিন্তু মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল অনেক কম। কারণ, শ্রমের মূল্যও ছিল খুব কম।

তুলনামূলকভাবে বলতে হয়, সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে। তবে সাধারণ মানুষের অবস্থা আগের তুলনায় উন্নত হলেও অনেক মানুষকেই বাঁচতে হচ্ছে নিদারুণ পরিশ্রম করেই।

আগে মেয়েরা সাধারণত খুব শ্রমসাপেক্ষ কাজ করতো না। মুসলমান মেয়েরা সাধরণত বড়িতে ঘর-গৃহস্থালি করতো। কিন্তু এখন অনেককে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় খোয়া ভাঙ্গতে, ইট মাথায় করে ভারা বেয়ে উপরে উঠতে, রাজ মিস্ত্রির যোগাল দিতে। নানা বৈপরিত্যে ভরে উঠেছে জীবন। মেয়েরা এখন আগের তুলনায় লেখাপড়া শিখছে। আফিস-আদালতে চাকরি করছে। আগে রাজশাহী শহরে খড় ও টিনের বাড়ি ছিল বেশি। দালান-কোঠা ছিল অনেক কম। কিন্তু শহর এখন দালান-কোঠায় ভরে উঠেছে। একটা মধ্যবিত্ত

www.pathagar.com

শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে মুসলিম জনসমাজে, যা আগে ছিলনা। দিন মজুরের সংখ্যা কিন্তু তা বলে কমেনি। সম্ভবত বেড়েছে। জমিহীন কৃষিজীবীরা শহরে এসে করছে দিন মজুরী, এখন আর তাদের কোন ক্ষেত খামার নেই।

রেশম শিল্পের জন্যে রাজশাহী একসময় বিখ্যাত ছিল। পরে এই শিল্পের অবনতি ঘটে। কিন্তু এখন তা আবার হয়ে উঠেছে অনেকের আয়ের উপায়। একটা পুরানো শিল্পের বেশ কিছুটা পুনরুজ্জীবন ঘটছে।

রাজশাহী জেলায় (এখন নাটোর জেলায়) চিনির কল প্রথম স্থাপিত হয় ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে। এই কল স্থাপন করে মাড়োয়াড়ীরা (সুরুজমল- নাগরমল)। পরে এই কল রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। নাটোরে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আর একটি চিনির কল সরকারী অর্থে খোলা হয়। রাজশাহীর হরিয়ানে একটি চিনির কল রাষ্ট্রিক অর্থে খোলা হয় ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ।

রাজশাহীতে রাষ্ট্রিক অর্থে একটি পাট কল এবং কাপড়ের কলও স্থাপিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রিক মালিকানায় পরিচালিত এসব কলকারখানা এখন কেবলই দিচ্ছে লোকসান। এখন তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, রাষ্ট্রিক উদ্যোগে একটা দেশে কলকরখানার অর্থনীতি কতটা গড়ে তোলা যায়, তা নিয়ে। কিন্তু একথাও আবার সমভাবে সত্য যে বড় বড় কলকারখানা গড়তে হলে যেরকম পুঁজির প্রয়োজন, সেরকম পুঁজি এদেশের খুব কম লোকের হাতেই সঞ্চিত হতে পারছে। পুঁজির অভাব মেটাবার জন্যে বিদেশী পুঁজির আমদানি করবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু বিদেশী পুঁজি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে পরে।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে (১৯৯৮) বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বন্টন বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে দারিদ্র্য যেভাবে হ্রাস পাবার কথা সেভাবে হ্রাস পাচ্ছেনা। দেশের শতকরা ৫৩ ভাগ মানুষ রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। অতি দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে প্রায় ৩৬ ভাগ মানুষ। এ হিসাব হলো সারা বাংলাদেশের অবস্থার। রাজশাহী অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে কোন পৃথক জরিপ কেউ করেছে বলে আমাদের জানা নেই।

সমাজতন্ত্র এখন একটা সেকেলে ধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনগ্রসর দেশসমূহে রাষ্ট্রের কোন কিছু করণীয় নেই, এরকম সিদ্ধান্ত সম্ভবত করা যায়না। মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) যুক্তি, মনে হয়, এখনও কিছুটা থাকছেই। অমর্ত্য সেন বলেছেন, চীনকে অনুসরণ করতে। বলছেন, বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করতে, আর রাষ্ট্রের মাধ্যমে জনকল্যাণ এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা বাড়াতে। কিন্তু চীন কি সত্যিকার অর্থনৈতিক সাম্যস্থিতি আনতে সক্ষম হচ্ছে ! প্রশ্নটা জটিল। একসময় ভাবা হতো, দেশে বড় বড় কলকারখানা গড়ে বিরাটভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করে খুব বেশী লোকের যে কর্মসংস্থান করা যায়, তা নয়। বরং স্বল্প পুঁজিতে সম্ভব, এরকম কলকব্জার ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমকে অধিক

www.pathagar.com

উৎপাদনমুখী করে তুলতে পারলেই দারিদ্র্য বিমোচন সহজসাধ্য হয়। আমাদের দেশে ভ্রান্ত শ্রমিক আন্দোলন অর্থনীতির ক্ষেত্রে হয়েছে ক্ষতির কারণ। শ্রমজীবীদের অযৌক্তিক মজুরী বৃদ্ধির দাবী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে তার বাজার সঙ্কুচিত করে ফেলতে চায়। আর যেকোন ব্যবসাকে করে তুলেতে চায় অলাভজনক। পুরানো শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণা এখন পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, তা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পারে না। সমস্যা অনেক আছে। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছর আমরা কোন সমস্যারই যে সমাধান করতে পারিনি, এমন নয়। দেশের রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। রাজশাহীতে বিমানবন্দর স্থাপিত হয়েছে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে । এখন (১৯৯৮) যমুনা সেতু স্থাপিত হবার ফলে রাজশাহীর সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের যোগাযোগ হয়ে উঠবে অনেক সহজ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি একটা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সহজ ও সমৃদ্ধ করেই তোলে।

www.pathagar.com

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে বড় রকমের ভূমিকম্প হয়। এতে অনেক দালান-কোঠা ভাঙ্গে। নাটোরের এবং দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ভূমিকম্পের ফলে বাঘা, কুসুম্বা, ছোট সোনা মসজিদের গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে। এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিক্টর স্কেল অনুসারে ৮ দশমিক ৭। এরকম বড় ভূমিকম্প এই অঞ্চলে এখন পর্যন্ত আর হয়নি। যদিও হতে পারে। কারণ, রাজশাহী বড় রকম ভূমিকম্প হতে পারে, এরকম এলাকার মধ্যেই পড়ে।

রাজশাহী পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। পদ্মা নদীতে অনেকবার বন্যা হয়েছে এবং এখনও হয়। একসময় রাজশাহী শহরের মধ্যে দিয়ে ছিল একটি ছোট নদী । এটা ছিল পদ্মার একটা শাখা নদী। এর একমাথা পদ্মা আরএকমাথা নওহাটার (নওহাট্টা) বারানই নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরপর কয়েক বছর পদ্মা নদীতে খুব বন্য হবার ফলে এই নদীর মুখে অনেক বালি জমে যায়। যার ফলে নদীটির প্রবাহ থেমে যায় এবং ভরাট হয়ে যেতে থাকে। নদীটির কিছু অংশ বায়ার পর নওহাটা যাবার পথে, বাঁ হাতের দিকে এখনও নজরে পড়ে। যাকে এখন বলা হয় শহরের ১নং ড্রেন, সেটা হলো এই নদীর শেষ চিহ্ন। একবার ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে খুব বড় রকমের বন্যা হয়েছিল। এরপর শহরকে রক্ষা করার জন্য পদ্মার ধার ঘেঁসে প্রায় ৭ মাইল লম্বা একটা বাঁধ (Embank-ment) নির্মাণ করা হয়। এর ফলে পদ্মার বন্যার হাত থেকে প্রায় ৩৫ বর্গমাইল এলাকা রক্ষা পেতে পারে। পলি জমে জমে পদ্মা নদীর মূল খাত অনেক উঁচু হয়ে পড়েছে। পদ্মার খাতের তুলনায় বর্তমানে শহর হলো অনেক নিচু। কোন সময় বাঁধের কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে পদ্মার পানি শহরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে একবার এরকম বন্যা হয়েছিল। শহরের পাঠান পাড়া, দরগা পাড়া, এবং হোসেনীগঞ্জ পানিতে ডুবে গিয়েছিল। সে সময় বর্তমান লেখকের বাড়িতেও পানি উঠে ছিল।

শহরের সাত মাইল লম্বা বাঁধের মধ্যে একাধিক পানি-কপাট বা স্লুইস গেট (Sluice gate) ছিল। এইসব কপাট বর্ষাকালে প্রয়োজন মতো খুলে দেওয়া হতো। শহরের মধ্যে ছিল একাধিক বড় বড় ড্রেন। এইসব পানি-কপাট খুলে দিলে তা দিয়ে পদ্মার পানি জোরে প্রবাহিত হত। ফলে শহরের এসব ড্রেন বছরে একবার করে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারতো। শহরে অনেক পুকুর ছিল। যা পদ্মার পানি নিতে পারতো ড্রেনগুলির মাধ্যমে। এটা ছিল একটা খুবই উত্তম ব্যবস্থা। নদীতে পানি বেড়ে উঠলে, এরকমভাবে স্লুইস গেট খুলে দিয়ে পানি কিছুটা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে বন্যার প্রকোপ কমান যেত।

পদ্মা নদীর ধার ঘেঁষে উঁচু বাঁধ রাজশাহী শহরকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল। এই বাঁধের উপর দিয়ে বিকালবেলা মানুষ বেড়িয়ে যথেষ্ট আনন্দ পেত। বাঁধের উপর থেকে দেখা যেত

www.pathagar.com

সূর্যাস্তের শোভা।এখনও শহরের পশ্চিম দিকের "টি" বাঁধ থেকে সূর্যাস্ত দেখে মানুষ আনন্দ পায়। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ভারত চালু করেছে ফারাক্কা ড্যাম। যার ফলে পদ্মা নদীর সাবেক রূপ বিশেষভাবেই গিয়েছে বদলে। এখন শুষ্ক মওশুমে পদ্মা নদীতে পানি প্রায় থাকেনা বললেই চলে। ফারাক্কা ড্যাম নির্মাণের ফলে শুষ্ক মওশুমে রাজশাহীর কাছে পদ্মার পানি প্রবাহ, আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। ফারাক্কা ড্যাম এখন পদ্মার পানিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। বর্ষাকালে ফারাক্কা ড্যামের স্লুইস গেটগুলো যখন খুলে দেওয়া হয়, তখন হঠাৎ করে পানি এসে রাজশাহীর অনেক অংশে বন্যা ঘটাচ্ছে। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে শহরের পশ্চিম অংশে এভাবে ক্ষতিকর বন্যা হতে পেরেছিল। ফারাক্কা বাঁধ রাজশাহী থেকে খুব দূরে অবস্থিত নয়। বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফারাক্কা বিষয়ে যে চুক্তি হয়েছে, বাস্তবে তা কার্যকরী হতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। ফারাক্কা ড্যাম এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশকে যেন বিশেষভাবে বদলে দিতেই চলেছে। পদ্মা ধারে অনেক জনপদে শীতের মওশুমে নলকূপে পানি পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রাজশাহী অঞ্চলে দেশের অন্যান্য অনেক অংশের তুলনায় গড় পড়তা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। এই অঞ্চল এমনিতেই ছিল তুলনামূলকভাবে শুষ্ক। ফারাক্কা এই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশকে আরো অধিক শুষ্ক করেই তুলছে। আমাদের দেশে শীতকালে বৃষ্টি হয় না। শীতকালে ফসল উৎপাদন করতে হলে সেচের পানির প্রয়োজন করে। ফারাক্কা ড্যাম তৈরির ফলে সেচের পানির অভাব আরো প্রকট হতেই চলেছে।

এই অঞ্চলে বড় রকমের দুর্ভিক্ষ বেশি না হলেও প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময়েই আকাল পড়েছে এবং এখনও পড়ে। ঠিক সময়, ঠিক পরিমাণে বৃষ্টি না হলে ফসল হয় না। সৃষ্টি হয় খাদ্যাভাব। অতিবৃষ্টি, স্বল্পবৃষ্টি, অসমবৃষ্টি হলো দুর্ভিক্ষের প্রাকৃতিক কারণ।

খুব বেশী বৃষ্টি হলে দেশে বন্যা হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে একবার সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বেশী বৃষ্টি হবার ফলে, সে সময়ের রাজশাহী জেলার প্রায় ১২০০ বর্গমাইল এলাকা, অর্থাৎ জেলার প্রায় অর্ধাংশ প্লাবিত হয়ে যায়। এই বন্যার ফলে ২,২২,৬০৫ একর জমির আমন ধানের শতকরা ৭৫ ভাগ মারা যায় এবং ৬৩, ৯৬০ একর জমির অন্যান্য ফসল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে সরকারী নথিতে লিপিবদ্ধ আছে।

অনাবৃষ্টির ফলে ধানের চারা না গজাতে পারবারও আছে অনেক নজির। আমাদের দেশে কৃষি হলো বিশেষভাবেই বৃষ্টি নির্ভর। বৃষ্টি বেশি হলে অথবা কম হলে অথবা ঠিক সময় না হলেই দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। কখন খুব ব্যাপকভাবে কখন বা সামান্য অংশ জুড়ে। বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক স্থানের মতো রাজশাহীতে, কাল বৈশাখী-র ঝড় হয়। বিকালে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ধূলি বর্ষণ হয়। বাতাস এই সময় পশ্চিম দিক থেকে আসে। তবে খুব বড় রকমের ঝড় এখানে কদাচিৎ হতে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা খুব বেশি হতে দেখা যায়। কখনও কখনও তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের

www.pathagar.com

বেশি হতে দেখা যায়। শীতকালে তাপমাত্রা রাত্রে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। দু-এক সময় ৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবার কথা জানা আছে। এসময় যথেষ্ট কুয়াশার সৃষ্টি হয়। শীত-বস্ত্রের অভাবে বহু মানুষ পৌষ-মাঘ মাসে বেশ কষ্ট পেয়ে থাকে। কিন্তু মোটের উপর রাজশাহী একটা দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল নয়। এই অঞ্চলে ফসলহানির ফলে সেরকম মারাত্মক দুর্ভিক্ষ বেশী হতে দেখা যায়না। বাংলাদেশ সাধারণভাবে ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষকবলিত দেশ। কিন্তু রাজশাহী অঞ্চলের অবস্থা এই প্রেক্ষিতে অনেক ভাল। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে যে ক্ষতি হয়, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তা বহুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এবারে (১৯৯৮) অবশ্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ থানায় খুব বন্যা হয়েছে। বন্যা হয়েছে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানায়। এই অঞ্চলে বন্যা কমাতে হলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অনেক দেশেই বিশেষভাবে খালকেটে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমেরিকার মিসিসিপি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুইটি খাল (Spillways) কাটা হয়েছে। যা দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হয়ে চলেযেতে পারে। রাজশাহী শহরে শহর রক্ষার যে বাঁধ আছে, তার নীচে নদীর একবারে ধার ঘেঁষে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এই জনবসতিতে প্রতি বছর পদ্মার পানি উঠে। অনেক দেশে, নদীর এত ধার ঘেঁষে জনবসতি গড়া আইনত নিষিদ্ধ। নদীর ধারে, যেখানে সহজেই বন্যার পানি উঠে, সেখানে কিছু জায়গা ছেড়ে রাখা হয় (floodways)। যেখানে চাষ-আবাদ করা চলে, কিন্তু ঘরবাড়ি বানাতে দেওয়া হয়না।

প্রত্যেক জায়গার বন্যার সমস্যা ঠিক একই ভাবে সমাধান করা যায়না। অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পুরোপুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তাছাড়া বন্যা কেবল যে, আমাদের ক্ষতি করে, তা নয়। বন্যা প্রতিবছর প্রচুর উর্বর পলিমাটি বহন করেও আনে. যা আমাদের দেশের জমির উর্বরতা বাড়ায়।

রাজশাহী এবং উত্তরবঙ্গের আরো কয়েকটি জেলার কতকঅংশ এক প্রকার লাল মাটির দ্বারা গঠিত। এই মাটিতে লোহা, ফেরিক অক্সাইড (Feric Oxide) হিসাবে আছে বলে মাটিকে লাল অথবা লালচে হলুদ দেখায়। এই মৃত্তিকা অঞ্চল, তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে উঁচু। এই মৃত্তিকা অঞ্চলকে বলে 'বরিন্দ'। মধ্য যুগে বলা হতো 'বরিন্দা'। ফারসীতে 'বরিন্দ্' এবং 'বুলন্দ' মানে উঁচু। রাজশাহীর বরিন্দা অঞ্চলে এখন গাছপালা বিশেষ নেই। কোন কোন স্থলে দেখা যায় কেবল তাল গাছের সারি। অথচ একসময় এখানে ছিল ঘন বন। ছিল বড় বড় বৃক্ষ। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন F. B. Simpson। তিনি তাঁর লেখা Sport in Eastern Bengal বইতে এই অঞ্চলে হরিণ, চিতা বাঘ ও বন্য বরাহ শিকারের কথা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন এই অঞ্চলে বড় বড় গাছের গোড়ায় ঝোপের মধ্যে এইসব জন্তু বাস করে। কেন এই অঞ্চল বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে, তা বলা যায় না। সিম্পসনের বই থেকে ও'ম্যালি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত, রাজশাহীর গেজেটিয়ারে দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

www.pathagar.com

বরিন্দা অঞ্চলের আবহাওয়া নিয়ে এখন অনেকে গবেষণা আরম্ভ করেছেন। বাংলাদেশে বরিন্দার আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গকিলো মিটার। কেউ কেউ বলছেন, এই অঞ্চল নাকি আগামীতে একসময় মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত করা কতদূর সংগত, তা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা যায়। বিখ্যাত ভূগোলবিদ ডাডলে স্ট্যাম্প-এর মতানুসারে, এই উপমহাদেশে যেখানে বছরে গড়ে ২০৩২ মিলিমিটার (৮০ ইঞ্চি) বা তার অধিক বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের বন (Evergreen forest) সৃষ্টি হতে পারে। যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়পড়তা ১০১৬ মিলিমিটার থেকে ২০৩২ মিটারের মধ্যে (৪০ থেকে ৮০ ইঞ্চি), সেখানে উদ্ভব হতে পারে পাতাঝরা বৃক্ষের বন (Deciduons forest)। যেখানে বছরে গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০৮ মিলিমিটার থেকে ১০১৬ মিলিমিটার (২০ থেকে ৪০ ইঞ্চি), সেখানে জন্মাতে পারে খর্বাকৃতি বৃক্ষ ও তৃণ। আর যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড়পড়তা পরিমাণ ৫০৮ মিলিমিটারের (২০ ইঞ্চি) কম, যেখানে কেবল মরু-উদ্ভিদ জন্মাতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এক নয়। কয়েকটি জায়গায় বছরে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এইরূপ ঃ-

ঢাকা ঃ ১৭৫২ মিলিমিটার ; চট্টগ্রাম ঃ ২৪৪৫ মিলিমিটার ; খুলনা ঃ ১৯৬১ মিলিমিটার; রাজশাহী ঃ ১৪৩২ মিলিমিটার ; সিলেট ঃ ৩৯০৩ মিলিমিটার ; রংপুর ঃ ২৮১১ মিলিমিটার।

বরেন্দ্র অঞ্চলের অনেক অংশ এখন বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর কারণ কতটা প্রাকৃতিক আর কতটা ঘটেছে নির্বিচারে বৃক্ষ কর্তনের ফলে, তা নির্ণিত হওয়া উচিত।

বরেন্দ্র অঞ্চলে বছরে গড়পড়তা যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় ,তাতে শাল জাতীয় পাতা ঝরা বৃক্ষের বন গড়ে উঠা সম্ভব। অতীতে এই অঞ্চলে একসময় শাল জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য ছিল। আমরা দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও এই অঞ্চলে যথেষ্ট বৃক্ষ ছিল। আর এইসব বৃক্ষের গোড়ায় ছিল ঝোপ জাতীয় জঙ্গল। যার মধ্যে অনেক শিকার পাওয়া যেত। ঢাকার কাছে মধুপুর অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি কতকটা বরেন্দ্র অঞ্চলের লাল মাটিরই অনুরূপ। সেখানে কিছুদিন আগেও ছিল শাল গাছের (Shorea robusta) বিরাট বন। যার কিছু কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলার নদ-নদী নিয়ে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশী অনুশীলন করেন মেজর জেমস রেনল (Mejor James Rennell)। তিনি ১৭৬৫ থেকে ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নদীগুলি জরিপ করে তাদের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। রেনল যাকরগঞ্জ (বর্তমান গোয়ালনন্দ) এবং নাটোরের মধ্যে লক্ষ্য করেন একটা বিরাট জলাভূমি। এই জলাভূমিকেই আমরা বলি চলন বিল। রেনল মনে করেন, এই বিরাট জলাভূমির উদ্ভব হয়েছে গঙ্গার (পদ্মার) খাত পরিবর্তনে। রাজশাহী (বোয়ালিয়া) এবং পুঠিয়ার পাশ দিয়ে বর্তমানে

www.pathagar.com

পদ্মা যেভাবে প্রবাহিত হয়, আগে সেভাবে হতো না। তিস্তা উত্তরবঙ্গের একটা বড় নদী। রেনল-এর ম্যাপে তিস্তা নদীর তিনটি স্রোত দেখান হয়েছে। এই নদী জলপাইগুড়ির নিকট দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হবার পর তিনটি স্রোতে বিভক্ত ছিল। তিস্তার পানি এই তিনটি নদীতে পানি সরবরাহ করতো। এই নদী তিনটি হলো, আত্রাই, করতোয়া এবং পূণর্ভবা। কিন্তু বর্তমানে তিস্তা নদী যেয়ে পড়ছে যমুনা নদীতে। যমুনা নদী একসময় ছিল ব্রহ্মপুত্রের একটা খুব সঙ্কীর্ণ শাখা নদী। কিন্তু তিস্তা ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যমুনার সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে যমুনা হয়ে ওঠে একটা বিরাট নদী। তা দিয়েই সাবেক ব্রহ্মপুত্রের পানি বিশেষভাবে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। আর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হয়ে ওঠে একটা শীর্ণকায়া নদী। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এক বিরাট বন্যা হয়। এই বন্যার ফলেই ঘটে তিস্তার খাত পরিবর্তন। যার পর থেকে যমুনা হয়ে ওঠে ব্রহ্মপুত্রের মূল ধারা।

আগে আত্রাই নদী চলন বিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হতো। কিন্তু এখন হয় বড়াল নদীর সঙ্গে।

চলন বিল সম্বন্ধে অনেক ভুল কথা প্রচলিত আছে। চলন বিল কখনও একটা হ্রদ ছিলনা। এটা ছিল একটা বিরাট জলাভূমি মাত্র। এর মধ্যে ছিল উঁচু উঁচু জায়গা। যেখানে বর্ষাকালেও মানুষ বাস করতো। বর্ষাকালে চলন বিলের গভীরতা দাঁড়াতো ২ থেকে ৪ মিটার (৬ থেকে ১২ ফিট)। বর্ষাকালে এই জলাভূমির আয়তন দাঁড়াত ৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার-এর কাছাকাছি (১৪০ বর্গ মাইল)। কিন্তু শীতকালে এর ক্ষেত্রফল দাঁড়াত ৩৯ বর্গ কিলোমিটার-এর কাছাকাছি (১৫ বর্গ মাইল)। আগে শীতকালে চলন বিলে বহু মানুষ যেত পাখি শিকার করতে। চলন বিল থেকে ধরা হতো বহু মাছ। কিন্তু এখন চলন বিল অঞ্চল থেকে নালা কেটে পানি বের করে দিয়ে করা হচ্ছে ধানের আবাদ। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বিশেষভাবেই বদলে গিয়েছে। চলন বিল থেকে ধরা শীতের পাখি রাজশাহীর বাজারেও একসময় প্রচুর কিনতে পাওয়া যেত। কিন্তু এখন আর যায় না।

তিস্তা এবং আত্রাই-এর পর উত্তর বঙ্গের নদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহানন্দা। মহানন্দা গোদাগাড়িতে এসে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মহানন্দা নদীর আগের চেহারা আর নেই। কারণ, এই নদী থেকেও ভারত এখন বাঁধ বেঁধে নিয়ে নিচ্ছে সেচের পানি। ইংরাজ আমলে মহানন্দা নদীর তীরে নবাবগঞ্জ ছিল তখনকার মালদহ জেলার সবচেয়ে বড় নদী বন্দর। কিন্তু নদী বন্দর হিসাবে নবাবগঞ্জের এখন আর বিশেষ গুরুত্ব নেই।

রাজশাহী অঞ্চলে দেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের তুলনায় বৃষ্টি হয় কম। কিন্তু তবু যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার পানি ধরে রেখে পরে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে পারলে এই অঞ্চলে পানির অভাব ঘটবে না। ভারতের উত্তর পশ্চিমে থর বা রাজস্থানের মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৭ থেকে ৫০৮ মিলিমিটারের মতো (৫ ইঞ্চি থেকে ২০ ইঞ্চি)। এর কারণ, মৌসুমি বাতাস ঐ অঞ্চলে ঠান্ডা হয়ে মেঘ সৃষ্টি হতে পারে না। ঐ অঞ্চলের উপরের

www.pathagar.com

বাতাস যথেষ্ট গরম বলেই (inversion of temparature) সেখানে বাতাস উপরে উঠে ঠান্ডা হয়ে মেঘ জমে বৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি হলো ভিন্ন। আমাদের উত্তরে হলো হিমালয় পর্বতশ্রেণী। যাতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বাতাস ধাক্কা খেয়ে উপরে উঠে ঠান্ডা হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয়। যা থেকে হয় বৃষ্টি। উপরের বাতাস গরম নয় । এখানে তাই মেঘ সৃষ্টি হবার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এই পরিস্থিতি বদলে যেতে বসেছে, বা নিকট ভবিষ্যতে বদলে যেতে পারে, এমন নয়। তাই মরুভূমি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা যে এখানে আছে, তা নয়। তবে ভবিষ্যতে এখনকার তুলনায় পরিবেশ আরো কিছুটা শুষ্ক হয়ে উঠতেই পারে।

একটা অঞ্চলে কিরকম গাছপালা হবে তা প্রধাণত নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের আবহাওয়া, মাটি এবং ভৌগোলিক অবস্থানের উপর। মাটির প্রকৃতি নির্ভর করে যে জাতীয় পাথর ক্ষয় হয়ে মাটির উৎপত্তি হয়েছে, তার উপর, আর জায়গাটা সমতল না পার্বত্য, তার উপর। আবহাওয়ার মধ্যে প্রধানত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং তাপমাত্রার কথা আসে। আমাদের দেশের তাপমাত্রা সবসময় থাকে গাছপালা হবার উপযুক্ত। বৃষ্টিপাতের উপরেই এখানে বিশেষভাবে নির্ভর করে চাষ- আবাদ। আমাদের দেশে বছরের সবসময় বৃষ্টি হয় না। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বৃষ্টি আশা করা হয়। মৌসুমি বায়ু প্রবাহের উপর নির্ভর করে বৃষ্টি হওয়া। বৃষ্টি যে বছর দেরিতে হয়, অথবা কম হয়, সে বছর ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। সৃষ্টি হয় ক্ষরার সমস্যা। বর্ষাকালে অনেক সময় বন্যায় ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে। রবি মৌসুমে অর্থাৎ শীতকালে ফসল উৎপাদনের জন্যে সেচের পানি প্রয়োজন হয়। সেচের সুবিধা থাকলে রাজশাহী অঞ্চলের প্রায় সব জমিতে রবি মৌসুমেও যথেষ্ট আবদ করা যায়। বিশেষ কোন অসুবিধা হয়না। আমাদের অর্থাৎ রাজশাহী অঞ্চলের, প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবনধারণের জন্য আদৌ কঠোর নয়।

www.pathagar.com

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
পীর-আউলিয়া-দরবেশ

'পীর' শব্দটা ফারসী। শব্দগত অর্থে বৃদ্ধ। ধর্মীয় অর্থে তত্ত্বজ্ঞানী। মনে করা হয়, আধ্যাত্মিক সাধনা বলে কারো কারো পক্ষে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব। তাঁরা সাধারণভাবে অসম্ভব, এমন কিছুকে সম্ভব করতে পারেন। পীররা মরে গেলেও তাদের অলৌকিক শক্তি লোপ পায়না। কোন না কোন ভাবে তা থাকে তাদের কবরের সঙ্গে যুক্ত। পীরের কবরকে তাই পবিত্র ভাবা হয়। মানুষ পীরের কবরে গিয়ে অনেক কিছু কামনা করে। যেমন- রোগ মুক্তি, মামলায় জেতা, অথবা অন্য কোন প্রকার বিপদ থেকে উদ্ধার। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে মানুষ পীরের দরগায় শিরনি প্রদান করে । অর্থাৎ পীরের সমাধি ভবনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মিষ্টান্ন, পায়েস ইত্যাদি বিতরণ করে। পীররা মারা যাবার পর, তাঁদের কবর যেন হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ উপাস্য। অনেক সময় পীরের ধারণা আর দেবতার ধারণা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় কাছাকাছি। যেমন, পীর শাহ মান্দার ও জিন্দা-গাজীর ধারণা। পীর শাহ মান্দার থাকেন হিমালয়ে। সেখানে অবস্থান করে তিনি ভক্তদের উদ্ধার করেন বিপদ-আপদ থেকে। বিশেষকরে পথের বিপদ থেকে। গ্রাম দেশে, রাজশাহী অঞ্চলে, পীর মাদারের গান কিছুদিন আগেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। গানের সঙ্গে একটি বা একাধিক কিশোর ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে নাচানো হতো। মায়েরা তাদের ছেলের মঙ্গল কামনা করে দিতেন শাহ মান্দারের শিরনি। অন্যদিকে জিন্দা-গাজী থাকেন সুন্দরবনের গহনে। তিনি সুন্দরবনের কাঠুরেদের পীর। তিনি বাঘের পিঠে চড়ে বেড়ান। ভক্তদের তিনি রক্ষা করেন বাঘ ও কুমিরের হাত থেকে। পীরবাদ বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে ছিল খুবই প্রবল এবং এখনও মুসলমান সমাজে পীরের ধারণা যথেষ্টভবেই বলবৎ থাকতে দেখা যায়। অবশ্য, পীররা যে কেবল মুসলমানদেরই ভক্তির বিষয় হয়েছেন, তা নয়। হিন্দুরাও পীরের দরগায় দিয়েছেন শিরনি। করেছেন প্রার্থনা। এ ব্যাপারে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান অতীতে প্রায় একই মানসিকতার পরিচয় প্রদান করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে সীতারাম দাস তাঁর ধর্ম মঙ্গল কাব্যের দিগ বন্দনায় লিখেছেন ঃ

বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারণে ॥
বাঘ মহিষ কাননে বাস পালে পাল।
মান্দারণ-গৌড়েতে যাহার জাঙ্গাল ॥
গড় মাঝে বনাল্য আঠার গন্ডা কোট।
তাহার চরন বন্দো ভূমে হয়্যা লোট॥
দারাবেগ ফকীর বন্দিব নিগাঞে।
জোড় হাতে বিন্দিব পাড়ুয়ার শুভি (সুফী) খাঞে ॥
বড় পঁতরায় বন্দ পীর কুতুব আলম।
তাঁহার দরগা দিয়া নাহি চলে যম॥

www.pathagar.com

রাইপুরের গোরাচান্দ নানপুরে নাল।
বন্দিব সাহেব-দুল্লা শিরে বান্ধ্যা শাল ॥

পীরের ধারণা যে কেবল বাংলাদেশেই দেখা যায়, এরকম নয়। সারা মুসলিম বিশ্বেই, এই ধারণা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন দেবতার ধারণা পরিণত হয়েছে পীরে। যেমন, মিশরের থেবেস শহরের শেখ হারীদি-র মাজার। মনে করা হয়, শেখ হারীদি বহু প্রকার রোগ সারাতে পারেন। শেখ হারীদি-র মাজার এককালে ছিল প্রাচীন মিশরের সর্প দেবতার মন্দির। লেবানন-এর টায়ার শহরে আছে শেখ মাসুখ-এর মাজার। শেখ মাসুখ, কেউ কাউকে ভালবেসে বিবাহ করতে চাইলে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এখন যা শেখ মাসুখের মাজার, এক কালে তা ছিল প্রাচীন ফনিসীয় প্রেমের দেবতা অ্যাডোনিস-এর মন্দির। মরক্কোতে অনেক সৈনিকের কবর পরিণত হয়েছে পীরের কবরে। মানুষ তাদের পবিত্র এবং অলৌকিক শক্তি সম্পৃক্ত বলে ভক্তি করে। এদের দরগাকে বলে "মারাবুৎ"।

'ওয়ালী' শব্দটা আরবী। আরবীতে ওয়ালী শব্দের দ্বারা এখন বোঝান হয়, 'আল্লাহর কাছের মানুষ।' 'আউলীয়া' হলো 'ওয়ালী' শব্দের বহুবচন। পীর এবং ওয়ালী প্রায় সমার্থক। একটি হলো ফারসী, আর অপরটি হলো আরবী শব্দ-এই যা। 'বো' শব্দটা ফারসী। 'বো' মানে গন্ধ। সুগন্ধ হলো 'খোস- বো' আর দুর্গন্ধ হলো 'বদ-বো।' অনেকের মতে বোয়ালিয়া নামটার উদ্ভব হয়েছে 'বো-আউলীয়া' থেকে। শব্দগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় আউলীয়াদের গন্ধ। এদের মতে অতীতে এখানে অনেক আউলীয়া এসেছিলেন; তাই জায়গাটার নাম হয়েছিল 'বো-আউলীয়া'। পরে তা হয়ে দাঁড়ায় বোয়ালিয়া। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কেবল রাজশাহীতে নয়, চাঁপাই নবাবগঞ্জেও একটা জায়গার নাম আছে বোয়ালিয়া।

রাজশাহীর মখ্দূম সাহেবের দরগা বিখ্যাত। এই দরগাটি কিন্তু বোয়ালিয়াতে অবস্থিত নয়। অবস্থিত হলো রামপুরে। রামপুরের নাম কিন্তু বদলায়নি। রামের নামেই থেকে গিয়েছে। রামপুরে পীর শাহ্মখ্দূম কোথায় থেকে কখন এসেছিলেন, তা নিয়েও আছে বিতর্ক। এক্ষেত্রে বিশ্বাস যত প্রবল, প্রমাণ হলো তত দূর্বল। এই পীরের আসল নাম কি ছিল, তা নিয়েও আছে অনেক বিতর্ক। তিনি সাধারণভাবে রাজশাহীবাসীর কাছে, বাবা মখ্দূম নামেই পরিচিত। 'মখ্দুম' শব্দটা আরবী। শব্দগত অর্থে, শিক্ষক, জ্ঞানী অথবা পরিচালক। ধর্মীয় অর্থে, ধর্মপথে পরিচালক অথবা ধর্মের শিক্ষক। মখ্দূম-এর দরগা রাজশাহী ছাড়াও অন্যত্র আছে। যেমন, বিহারের রাজধানী পাটনায়।

মধ্য যুগের বাংলার মুসলমান সমাজের বিশেষ চিত্র পাওয়া যায় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখিত কবি কঙ্কন চন্ডি নামক কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থটিকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত বলে মনে করা হয়। এতে এক স্থলে লেখা হয়েছে ঃ

ফজর সময়ে উঠি বিছায় লোহিত পাটী
পাঁচবেরি করয়ে নমাজ।

www.pathagar.com

সোলেমানি মালা ধরে জপেপীর পেকম্বরে[১]
পীরের মোকামে দেয় সাজ ॥
দশ-বিশ বিরাদরে[২] বসিয়া বিচার করে
অনুদিন পড়য়ে কোরান।
কেহবা বসিয়া হাটে পীরের শিরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড়[৩] নিশান॥
বড়ই দনিশমন্দ[৪] কারে নাহি করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাই ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ-বেশ মাথায় না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥

[[১]পেকম্বর = পয়গম্বর। [২]বিরাদর =ভাই বা ভ্রাতৃসুলভ ব্যক্তি। [৩]দগড় = এক রকম বড় ঢাক, যা মাটিতে রেখে দন্ড দিয়ে পিটিয়ে বাজান হতো। [৪]দানিশমন্দ = জ্ঞানী ব্যক্তি।]

মুকুন্দরামের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই, মুসলমানরা ছিলেন সৎ এবং জ্ঞানী। তাঁরা চাইতেন, নিজেদের মধ্যে বিচার করে বিবাদ নিস্পত্তি করতে। তাঁরা পাঁচবার নামাজ পড়তেন। কোরান শরীফ পাঠ করতেন। সেই সঙ্গে আবার পীরের প্রতিও তাদের ছিল অগাধ ভক্তি। তাঁরা পীরের মোকামে সাঁজ-বাতি দিতেন। দগড় বাজাতেন।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বাংলাদেশে পীরবাদ খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এ সময় থেকে সুফী-দরবেশগণের দরগা নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা পেতে আরম্ভ করে। এই সব দরগায় লিখতে, পড়তে এবং গুণতে শেখানো হতো। অসুস্থকে চিকিৎসা করা হতো এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরন্নকে প্রদান করা হতো অন্ন। মানুষ পীরের কবরকে পবিত্র ভাবতে আরম্ভ করে। এক পর্যায়ে আরম্ভ হয় পীরের কবর পূজা। মানুষ ভাবতে আরম্ভ করে, পীর বহু অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারেন। ভঙ্গ করতে পারেন সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ওয়াহাবীরা পীর পূজার বিপক্ষে প্রচার আরম্ভ করেন। রাজশাহী এক পর্যায়ে হয়ে ওঠে ওয়াহাবীদের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি। আমরা এ সম্বন্ধে আগে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু তবু পীরবাদ বিলুপ্ত হয় না। যথেষ্টভাবে থেকেই যায়। আর এখনও আছে। যদিও আগে বিভিন্ন দরগায় যা করা হতো, তার বহু কিছু এখন আর করা হয় না। ভাবা হয়, ঐ সব ক্রিয়া-কান্ড ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা শির্‌ক ।

রাজশাহীর শাহ্ মখদূমের দরগার নামে বহু 'মদদ্-ই-মাস' জমি ছিল। ইংরাজ সরকার এই জমি নিয়ে নিতে চায়। ফলে মামলা হয়। মামলায় জেলা জজের আদালতে রায় সরকারের পক্ষে যায়। কিন্তু হাই কোর্টের রায়ে দরগার খাদেম-এর দাবি অনেক পরিমাণে মেনে নেওয়া হয়। এই মামলাতে জজ কোর্টে সাক্ষ্য দেবার সময় খাদেম গোলাম আকবর

www.pathagar.com

বলেন, তিনি হলেন এই দরগার ওয়াকফ সম্পত্তির প্রথম মতোয়াল্লী আলী নূর-এর নবমতম বংশধর। দরগার এই সম্পত্তি সম্রাট হুমায়ুন প্রদান করে যান ১০৪৪ হিজরীতে (অর্থাৎ ১৬৩৪ খ্রিঃ)। কিন্তু নিম্ন আদালতে তাঁর এই দাবী অগ্রাহ্য হয় এই কারণে যে, সম্রাট হুমায়ুন এই সময় কোন জমি দান করতে পারেন না। কারণ, তিনি মারা যান ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। অর্থাৎ হুমায়ুন কর্তৃক জমি প্রদানের কথা যখন বলা হচ্ছে, তার প্রায় ৭৮ বছর আগেই সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অন্যান্য আরো ঘটনার কথা বিবেচনা করে হাই কোর্ট দরগার পক্ষে রায় দেয় এবং ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে দরগা এস্টেট্-এর জন্যে সরকারীভাবে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়।

রাজশাহীতে যে বাড়িতে আমি থাকি, সেটা দরগা এস্টেট্-এর জমির উপর নির্মিত। বহুদিন ধরেই এই বাড়িতে আমাদের বাস। আমরা দরগা এস্টেটে নিয়মিত খাজনা দিতাম। আমাদের জমির স্বত্ব ছিল কায়েমী। একবার আমাদের উপর নোটিশ হয়, খাজনা বাকি আছে বলে। আমাদের কাছে খাজনার রশিদ ছিল। যা থেকে প্রমাণিত হল, আমরা ঠিক মতই খাজনা দিয়েছি। কিন্তু খাজনা কোন কারণে দরগা এস্টেটে নামে জমা পড়েনি। পরে দেখা গেল, এরকম আরো একাধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে। যে তহশীলদার খাজনা নিয়েছে, সে খাজনার টাকা জমা না দিয়ে খেয়ে ফেলেছে। এই তহশীলদার শেষে রাজশাহী ছেড়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। লোকটা ছিল ভয়ঙ্কর নামাজি আর বাবা মখ্দূমের একান্ত ভক্ত। আমরা ভাবতে পারিনি, লোকটা এরকম করতে পারে। কিন্তু আমার পিতা কাউকেই সেভাবে বিশ্বাস করতেন না। সব রকম কাগজ পত্র তিনি ঠিক রাখতেন। মনে করতেন, সব লোককে প্রথমে ধরে নিতে হবে খারাপ, যদিনা তার বিপরীতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। খাজনার রশিদগুলি আমার পিতা রেখে দিয়েছিলেন বলে আমাদের কাছ থেকে দরগা এস্টেট্ বাকি খাজনা দাবি করতে পারেনি। না হলে প্রায় পাঁচ বছরের বকেয়া খাজনা আবার আমাদের প্রদান করতে হতো। কত লোক যে ইতিপূর্বে দরগার টাকা লুটে পুটে খেয়েছে, তা বলা যায় না। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবার পর এই লুটপাট নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু তবুও তহশীলদার কর্তৃক খাজনা জমা না দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। যেমন ঘটেছিল আমাদের বাড়ির ক্ষেত্রে।

পীর মখ্দূম সাহেবের জন্ম ও মৃত্যু (ওয়াফৎ) তারিখ যথাযথভাবে জানা না থাকলেও প্রতি বছর হিজরির রজব মাসের ২৭ তারিখে তার মৃত্যুবার্ষিকী বা উর্স (ওউরস) উদ্যাপন করা হতো। এখনও হয়। তবে ঠিক আগের পদ্ধতিতে আর নয়। পুরানো ধারায় উর্স বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সময়, পীরের মাজারকে প্রথমে দরগার সংলগ্ন পুকুরের পানি দিয়ে ভাল করে ধৌত করা হতো। পরে ধৌত করা হতো গোলাপ পানি দিয়ে। দরগায় কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে। যাকে বলা হয় শাহ্ মুখদূমের দ্বারা ব্যবহৃত জিনিস। যেমন, মাথার পাগড়ী এবং গায়ের আল খেল্লা, হাতের লাঠি, পায়ের একটা খড়ম এবং বসবার একটি পিঁড়ি। দরগার খাদেম ও তার সঙ্গীগণ উরস-এর দিনে এগুলি মাথায় নিয়ে পীরের দরগাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতেন। এ সময় বাজান হতো সানাই এবং ঢোল। উর্স-এর

www.pathagar.com

দিনে খুব খাওয়া দাওয়া হতো। দরগার পরিবেশ হয়ে উঠত উৎসবমুখর। মৃত্যুদিবসে থাকতো না কোন শোকের ছায়া। উর্‌স-এর দিনে পীরের নাম করে খাওয়া হতো হালুয়া-পরটা, যা পাক করা হত দরগার আঙ্গিনায়। আনন্দ করা হতো, কারণ মনে করা হতো, মৃত্যু দুঃখের ঘটনা নয়, বরং আনন্দের ঘটনা। সকল দুঃখের উৎস হলো আমাদের দেহ। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দেহ পিঞ্জর থেকে আত্মা মুক্তি পেয়ে থাকে। যেহেতু আমরা ছিলাম দরগা এস্টেট্ এর প্রজা, তাই আমাদের বাড়িতে হালুয়া পরটা পাঠান হতো। আমরা তা খেতাম তৃপ্তি ভরে। খাঁটি ঘি দিয়ে তৈরী এই হালুয়া ও পরটা খেতে সত্যিই ভাল লাগত।

রাজশাহীর শাহ মখ্‌দূম-এর দরগায় একটা প্রস্তর ফলকে ফারসীতে যা লেখা আছে তার সারমর্ম হলো, এই দরগা নির্মাণ করান আলী কূলী বেগ। তিনি নিজেকে বারো ইমামের অনুসারক হিসাকে দাবি করেছেন। তাঁর এই দাবি থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি ছিলেন শিয়া। ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের সাফাভী বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী শিয়া মতবাদকে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেন। হুমায়ুনকে তিনি উত্তর ভারতের বাদশাহী ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন এই শর্তে যে, তাঁর সাম্রাজ্যে বারো ইমামে বিশ্বাসী শিয়া মতবাদ (ইসন আশা রিয়্যা) প্রচারের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু শাহ্ মখদূম শিয়া ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। কেউ কেউ অনুমান করেন, শাহ মখদূম-এর আসল দরগা পদ্মার ভাঙ্গনে ভেঙ্গে যাবার পর বর্তমান দরগাটি নির্মিত হয়েছিল। এই দরগার অনেক রীতি-নীতি ছিল শিয়া মতের অনুরূপ। দরগার সঙ্গেই ছিল ইমামবাড়া, অর্থাৎ মহররম অনুষ্ঠানের বাড়ি। পরে যা ভেঙ্গে ফেলা হয়। এক সময় দরগার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল নহবত খানা। 'নহবত' আরবী শব্দ। সানাই, ঢোল, নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে একত্রে বাজিয়ে ঐকতান সৃষ্টিকে বলে নহবত। আর যেখানে এসব বাজান হয়, তাকে বলে নহবত খানা ; যা এখন আর দরগায় নেই। যদিও এক সময় ছিল। শাহ্ মখ্‌দূমের দরগার পুরাতন বর্ণনায় নহবত খানার উল্লেখ পাওয়া যায়। সূফী সাধকরা সাধারণত সঙ্গীত পছন্দ করতেন। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গান (সামা) গেয়ে মনে আধ্যাত্মিক ভাব জাগিয়ে তুলতেন। তারা মনে করতেন, সঙ্গীত মনে প্রশান্তি আনতে সাহায্য করে, সুতরাং তা ধর্ম জীবনের পরিপন্থী নয়। বিখ্যাত সূফী দার্শনিক ইমাম আল্-গাজ্জালী সঙ্গীতকে দুভাগে ভাগ করেছেন, ভাল ও মন্দ। ভাল সঙ্গীত তা-ই, যা স্নায়ুবিক উত্তেজনাকে প্রশমিত করে। মনকে একটি নির্মললোকে নিয়ে যায়। আর মন্দ সঙ্গীত তা-ই, যা মানুষকে মদ খেতে উৎসাহিত করে, আর রিরংসা জাগায়। তাঁর মতে, ভাল সঙ্গীত ইসলাম ধর্ম সম্মত। তিনি তাঁর এই মত ব্যাক্ত করেছেন, তাঁর বিখ্যাত এহ্‌ইয়া-উল-উলুমুদ্দীন নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, দুটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বিদ্যমান ছিল। একটা পরিচালিত হতো রাজকীয় আওতায়, আর অপরটি চলে আওলিয়া দরবেশদের আস্তানাকে কেন্দ্র করে।

বাংলার সূফী সাধকদের নিয়ে অনুসন্ধান করে যাঁরা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁর ইংরাজিতে লিখিত A Histoty of Sufi-Ism in Bengal বই এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বইটি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে

www.pathagar.com

Asiatic Society of Bangladesh, ঢাকা, থেকে প্রকাশ করা হয়। এনামুল হক সাহেব ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক। কিন্তু তিনি রাজশাহী কলেজে বেশ কিছু দিন অধ্যাপনা করেন। তিনি তাই শাহ মখদূম দরগা সম্পর্কে গবেষণার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি রাজশাহীর বিখ্যাত দরগাকে তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন শাহ্ মখদূম-এর দরগা হিসাবে এবং বলেছেন, যেহেতু এই পীরের আসল নাম জানা যায়না, তাই এই দরগাকে শাহ মখ্দূমের দরগা হিসাবেই বর্ণনা করা উচিত। তিনি বলেছেন, অনেকে মনে করেন, এই পীর সাহেবের আসল নাম ছিল, জালাল-উদ-দীন। কিন্তু যাঁরা এটা বলেন, তাঁরা তাঁদের এই দাবির মূলে কোন যুক্তি দেখাতে পারেন না। কারণ, দরগার দরজার উপর ফারসীতে লেখা আছে 'সইয়াদ-ই-সনদ শাহ দরবেশ', অর্থাৎ সনদ প্রাপ্ত সন্মানীয় দরবেশ। কিন্তু দরবেশের কোন নাম উল্লিখিত হয়নি। এক সময় মনে করা হতো, বাবা মখদূমের বিদেহী আত্মা রাজশাহী শহরবাসীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে (guardian spirit)। বলা হতো, এই কারণেই যারা রাজশাহী শহরে চাকুরী করতে আসেন, তারা বার বার ফিরে আসতে চান এখানে। অনেকে চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর এখানে করেন বাড়ি। আমার পিতা চাকুরি উপলক্ষেই বাইরে থেকে এসেছিলেন এখানে। করেছিলেন বাড়ি। কিন্তু তিনি এখানে বাড়ি করেছিলেন নানা কথা ভেবে। এখানে ছিল উন্নতমানের স্কুল ও কলেজ। খাদ্যদ্রব্য ছিল যথেষ্ট সস্তা। আর মানুষ ছিল তুলনামূলকভাবে শান্ত প্রকৃতির। এখানকার আবেষ্টনি তাঁর পছন্দ হয়েছিল।

অনেক লোককথা প্রচলিত আছে বাবা মখদূমকে নিয়ে। একটি লোককথা হলো এই রকম ঃ

সে সময় রামপুর গ্রামে পদ্মা নদীর ধারে বাস করতো কিছু জেলে। নদীতে মাছ ধরে কায়-ক্লেশে চলত তাদের জীবন। একদিন ভোরে কয়েকজন জেলে মাছ ধরতে তাদের নৌকা নামাবে নদীতে, এমন সময় তারা দেখতে পায় নদীতে কুমিরের পিঠে চড়ে একজন মানুষ এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে। ওরকম অদ্ভুত মানুষ, তারা এর আগে আর কখনও দেখেনি। তারা অবাক হয়ে যায় তাঁকে দেখে। লোকটি নদীর পাড়ে কুমিরের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ান। ডাকেন জেলেদের কাছে আসতে। লোকটির মাথায় পাগড়ী। গায়ে আলখেল্লা। পায়ে কাঠের খড়ম আর হাতে একটা লাঠি। জেলেরা ভয়ে তাকে গড় হয়ে প্রণাম করে। তিনি ওদের বলেন ভয় না পেতে এবং তাঁকে কিছু খেতে দিতে। ক্রমে অনেক লোক এসে জড় হতে থাকে চারপাশে। জেলেরা বাড়ি যেয়ে মাটির থালায় করে খাদ্য এনে খেতেদেয় অদ্ভুত মানুষটিকে। তিনি নদীর পাড়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেন। তিনি খাবার সহ থালাগুলিকে ঢেকে দেন তাঁর মাথা থেকে পাগড়ী খুলে। কিছুক্ষণ পরে পাগড়ী উঠিয়ে তা আবার বাঁধতে থাকেন তাঁর মাথায়। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখে, মাটির থালাগুলি সব পরিণত হয়েছে সোনার থালায় ; আর তা ভরে উঠেছে বড় বড় তাজা মাছে! তারা তখন বাবা মখদূমের কাছে দীক্ষা নেয়। পীরের কেরামতের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। রামপুরে নানা জায়গা থেকে লোক এসে বসত করতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই রামপুর একটা শহর হয়ে ওঠে। রামপুরে লোক না আঁটায় লোকে যেয়ে বসতি করে কাছেই একটা জায়গায়, যা পরিচিত হয়ে ওঠে বোয়ালিয়া

www.pathagar.com

হিসাবে। পরে এই দুটি জায়গা নিয়ে গড়ে ওঠে রামপুর-বোয়ালিয়া শহর। সেটা অনেক দিন আগের কথা। কতদিন আগের কথা, কেউ তা বলতে পারে না। বাবা মখদূমের এই গল্পটা চলে আসছে লোকের মুখে মুখে। লোকে আরও বলে, একসময় এ অঞ্চলে অনেক দৈত্য-দানো ছিল। বাবা মখদূম তাদেরও তাড়িয়ে দেন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ফলে সবার জীবনে শান্তি নেমে আসে। মখ্দূম সাহেবের দরগায় একটি কবর আছে । কবরটিকে বলা হয় কুমীরের কবর। সেই কুমীরের কবর, যার উপর সওয়ার হয়ে বাবা মখ্দূম প্রথমে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন এখানে।

ডক্টর এনামুল হক্, শাহ মখ্দূমের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, অতীতে এখানে একজন সূফী সাধক সত্যিই ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। যদিও তাঁর প্রকৃত নাম পরিচয় এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এনামুল হক প্রমাণ করতে চান, ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খালজির বঙ্গ বিজয়ের অনেক আগে থেকেই বাংলায় বহু সূফী পীর এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করবার জন্যে। আর রাজশাহীর শাহ্ মখ্দূম ছিলেন তাঁদেরই একজন।

কিন্তু ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জর্জ কোর্টে সাক্ষদানের সময়, দরগার তখনকার খাদেম গোলাম আকবর বলেন, তিনি মনে করেন, বাবা মখ্দূম ৪৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁর এই কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকলে বলতে হবে, মখ্দূম সাহেব এসেছিলেন সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহ্মুদ শাহ-এর সময়। এনামুল হক্ যেমন বলতে চেয়েছেন, শাহ মখ্দূম এসেছিলেন সুলতানী আমলের আগে, আমার মনে হয়, তাঁর এই দাবী যথার্থ নয়।

বাংলাদেশে বহু পীর ও সূফী সাধকের দরগা ও মাজার নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। কেবল রাজশাহী নয়, গোটা বাংলার ইতিহাস আলোচনাতেই তাই আসে নানা পীর দরবেশের কথা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়, অনেক সূফী সাধকের মাজার নিতান্তই কৃত্রিম। ইরানের বিখ্যাত সূফী সাধক বায়াজিদ আল্-বোস্তামী, কোনদিন বাংলায় আসেননি। ইরানে রয়েছে তাঁর প্রকৃত সমাধি ভবন। কিন্তু তাঁর নামে চট্টগ্রামেও রয়েছে একটি মাজার। লোকে ভাবে, বায়াজিদ আল-বোস্তামী কোন এক সময় চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। যা হতে পারে না। আল- বোস্তামী ইন্তেকাল করেন ইরানের বিস্তাম শহরে, ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ।

'দরবেশ' শব্দটা ফারসী। শব্দগত অর্থে ভিখারী। দরবেশের সঙ্গে মিল থাকতে দেখা যায় বৌদ্ধ-ভিক্ষুর ধারণার। সূফী ধ্যান ধারণার উপর বৌদ্ধ চিন্তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেক ঐতিহাসিক। যেমন, P.K. Hitti করেছেন, তাঁর বিখ্যাত, History of the Arabs, নামক বইতে। হিট্টির মতে, সূফীবাদ প্রকৃত ইসলামের অংশ নয়, পরে তা যুক্ত হয়ে পড়েছে এর সঙ্গে।

www.pathagar.com

বৌদ্ধরা নানা স্থানে স্তূপ স্থাপণ করে তাকে পবিত্র মনে করতেন। পীরের মাজার আর বৌদ্ধ স্তূপের ধারণার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া সুফী 'ফানা' আর বৌদ্ধ 'নির্বাণ' এর ধারণার মধ্যেও আছে মিল। এক সময় মধ্য এশিয়াতে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব। অনেকের মতে, এই প্রভাব সম্পৃক্ত হয়েছে সুফীবাদের মধ্যে। আর এ থেকেই পীরের ধারণার উদ্ভব হয়েছে। মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ শ্রমণদের অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে মনে করা হতো। পীরবাদ ও মধ্য এশিয়ার খিবাও বোখারা-র বৌদ্ধবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

পীরবাদ ও সুফীবাদ অবশ্য ঠিক সমার্থ নয়। কিন্তু পীরবাদ আর সুফীবাদ বিশেষভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সুফীবাদ, সুন্নী ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়কেই প্রভাবিত করেছে। সৃষ্টি করেছে এক সাধারণ মুসলিম মরমীবাদ (Mysticism)।

মরমীবাদ নিয়ে অনেক বইলেখা হয়েছে। কিন্তু পীরের ধারণার সঙ্গে এমন অনেক ধারণা জড়িয়ে আছে, যা আজকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করা কঠিন। যেমন, আমরা এখন জানি, আমাদের অনেক রোগ হয় জীবাণুজনিত কারণে। এসব ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে জীবাণু ধ্বংশকারী ঔষুধ সেবন করতে হবে। কিন্তু আমরা অনেকে উপযুক্ত ঔষুধ সেবন না করে গ্রহণ করি পীরের পানি পড়া। যা আমাদের রোগ না কমিয়ে বাড়িয়েই দেয়। আমি আমাদের দেশের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মাওলানা ভাসানীকে পানি পড়া দিতে দেখেছি ; যা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লেগেছিল। সেটা ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের কথা। মাওলানা ভাসানী একদিকে ছিলেন পীর, আর অন্য দিকে ছিলেন বিপ্লবী। সেটা বিখ্যাত যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের বছর। মনে হয়, ভাসানী চাচ্ছিলেন পানি-পড়া দিয়ে ভোট বাড়াতে।

রাজশাহী জেলার সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের নিমতিতা নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বরদাচরণ মজুমদার নামে একজন ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। বরদাচরণ নজরুলকে তার রোগ মুক্তির জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে কালী সাধনা করবার উপদেশ দেন। কিন্তু আমরা জানি, এই সাধনার ফলে নজরুলের ব্যাধি সারেনি। নজরুল বরদাচরণকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তিনি বরদাচরণ সম্বন্ধে বলেছেন, জীবনে যত সন্ন্যাসী, যোগী, ফকির, দরবেশ দেখেছেন তাঁদের সঙ্গে বরদাচরণের কোন তুলনা হয় না। নজরুলের মতে, বরদাচরণ ছিলেন শক্তিমান সাধক, অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

পীর, ফকির, দরবেশ, সন্ন্যাসী, যোগী প্রভৃতির ধারণা হলো খুবই কাছাকাছি। এঁরা সকলেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, আর এদের সম্বন্ধে আমাদের মনে জমে আছে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। এক সময় উত্তরবঙ্গে সত্যপীরের পুজার খুব প্রচলন ছিল। সত্যপীর হিন্দু পীর, তাঁর মূর্তি গড়ে পুজা করা হতো। কিন্তু এই পুজার পুরোহিত হতেন সাধারণত মুসলমান। পুজার পর সত্যপীরের শিরনি বিতরণ করা হতো।

www.pathagar.com

আমরা আলোচনা করছিলাম রাজশাহীর শাহ্ মখ্দূমের দরগা নিয়ে। এই দরগার এখন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পদ্মার ধারে, এক সময় জায়গাটা ছিল যথেষ্ট নিরিবিলি। মখ্দূম সাহেব যখন এখানে এসেছিলেন, তখন নিশ্চই জায়গাটা ছিল আরো শান্ত। সূফী সাধকরা শান্ত পরিবেশে করতেন তাঁদের মোরাকাবার জন্যে। কিন্তু এখন জায়গাটা হয়ে উঠেছে খুবই কোলাহল মুখর। যেটা সূফী চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সূফীবাদের সংজ্ঞা দেওয়া অবশ্য বেশ কঠিন। কারণ, সূফীবাদের রূপ চিরকাল এক হয়ে থাকেনি। সূফীরা নিজেরাই সূফীবাদের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। আবু মুহাম্মদ আল্-জারিনীর মতে, "সমস্ত অনিষ্টকর কামনা থেকে মনকে মুক্ত করা এবং সদভ্যাস গড়ে তোলাই সূফীবাদ।" এরকম সূফীবাদ নিশ্চই আমাদের অনেকের কাম্য। আর মনে এরকম সূফী চেতনা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় শান্ত পরিবেশ।

শাহ্ মখদূম অবশ্য কেবল মোরাকাবা করেই সময় কাটাননি। রাজশাহীর লোক-কথায় বলে, তিনি নরবলী প্রদান বন্ধের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। অনেক সূফী দরবেশ প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছেন এদেশে। এঁরা যুদ্ধ করেছেন নরবলী প্রদানকারী তান্ত্রিক সাধুদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ এদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল অনেক পরিচ্ছন্ন ও মানবিক। তান্ত্রিকরা অনেক বীভৎস আচরণ করতো। তান্ত্রিকদের অনেক আচরণ ছিল ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত। যেমন, বলি দেওয়া মানুষের অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত মানুষের দেহের উপর বসে মড়ার মাথার খুলিতে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ একত্রে সুরাপান ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপাল কুন্ডলা" উপন্যাসের (১৮৬৬) মধ্যেও তান্ত্রিক কাপালিক সাধুর কিছু বর্ণনা আছে। যা থেকে বোঝা যায়, কি ধরনের এক ভয়াবহ ধর্ম বিশ্বাস এদেশে কিছু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এর পাশাপাশি সূফী সাধকের চিন্তাকে নিশ্চয়ই অনেক উজ্জ্বল মনে হয়।

এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে অ্যারনল্ড (T.W. Arnold, 1864-1930.) নাম বিশেষভাবে খ্যাত হয়ে আছে। তিনি তাঁর The Preaching of Islam নামক বইয়ে বলেন, বাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে ইসলাম একটা মানব সমতার বাণী বহন করে এনেছিল। হিন্দু সমাজে যারা অবহেলিত ছিল, তারা এর মধ্যে দেখেছিল একটা নতুন মুক্তির পথ। এর আবেদন বিশেষভাবে পড়েছিল দরিদ্র হিন্দুদের উপর। যেমন, জেলে, ব্যাধ, ক্ষেতে খামারে নিয়োজিত দীন শ্রমজীবীদের উপর।

আমরা মুখ্দুম সাহেবের কথা আলোচনা করতে যেয়ে যে কাহিনীর উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে আরনল্ড-এর বক্তব্য বেশ কিছুটা মেলে। বাবা মুখ্দূম-এর কাছে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন রাজশাহীর পদ্মা নদীর ধারে বসবাসরত দরিদ্র জেলেদের একাংশ। অ্যারনল্ড -এর মতে, উদ্যমশীল মুসলমান ধর্মপ্রচারকরা এদেশের অবহেলিত মানুষের কাছে আল্লাহ্র একত্ব এবং সব মানুষই যে সমান, তা প্রচার করেন। সাধারণ মানুষ এ বাণীতে আকৃষ্ট হয়। বাংলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গরীবেরাই এ ধর্ম গ্রহণ করেন। এই উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার বাংলায় (Bengal) সবচেয়ে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
জন-সংস্কৃতি

জন-সংস্কৃতির জন্ম জনসাধারণের মধ্যে। সাধারণ মানুষের মধ্যেই এর উদ্ভব ও বিলয় ঘটে থাকে, কতকটা অবচেতনভাবে। জন-সংস্কৃতি উপভোগ করবার জন্যে কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন করেনা। এই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অনেক লোক অংশ নিতে পারে, কোন পৃথক ভাবে প্রশিক্ষণ ছাড়াই। যেমন, বিয়ের গান। রাজশাহী অঞ্চলে বিয়ে বাড়িতে বিয়ের গীত গাওয়া হয়। এসব গান গাইতে খুব একটা সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন করেনা। প্রয়োজন করেনা গলা সাধবার। এসব গানের সুর খুবই সরল । এদের ভাববস্তুও গভীর নয়ঃ

খেরেসা[১] খ্যায়্যা
গেরেদা[২] লাগায়্যা
কতই নিদরে যাও।
মায়ে ডাকে
বোনে ডাকে
উঠিয়া খেরেসা খাও।

[১]খেরেসা ফারসী শব্দ। ঘন করে রান্না দুধের পায়েস।

[২]গেরেদা (গিরদাহ) ফারসী শব্দ। গোল নরম পাশ বালিশ।

গানটা বিয়েতে ক্ষীর খাওয়া পর্বকে কেন্দ্র করে গীত হয়ে থাকে। সাধারণত বিয়েতে রাজশাহী অঞ্চলে তিনদিন ধরে খেরেসা বা ক্ষীর খাবার পর্ব চলে। বিয়ের গান খুব ভাব গভীর নয়। তবে কখনও কখনও বিয়ের গানের মধ্যে গভীর আবেগ কিছুটা ধরা পড়তে দেখা যায়। আগের দিনে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল খুব কম। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যেয়ে অনেক মেয়েকে ভোগ করতে হতো শাশুড়ির অত্যাচার। অনেক বিপদ ও বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত মেয়েদের, স্বামীর বাড়ি যেয়ে। মেয়ের মায়ের মন এসব ভেবে উদ্বিগ্ন হতো। এই যে উদ্বেগ, তা ধরা পড়তে দেখা যায় অনেক পুরানো বিয়ের গীতে, যা এখনও কিছু কিছু গীত হয়ে থাকে। এরকম গীতের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

নদীর কূলে কিসের বাজনা বাজেরে?
সোনার ফাতেমা রে!
নদীর কূলে, মা, কিসের হাউই উড়ে রে?
সোনার ফাতেমা রে!
যারে দিছি, মা, এ মুখের জবান রে–
সোনার ফাতেমা রে!
তারাই অ্যালো, মা, পালট-বাজী লিয়্যারে–
সোনার ফাতেমা রে!

www.pathagar.com

কেমনে সইবো, মা, পরার পুতের জ্বালারে?
সোনার ফাতেমা রে!
কেমনে সইবো, মা, তার বাপ-মার জ্বালারে ?
সোনার ফাতেমা রে !
নদীর কূলে, মা, বট বিরিক্ষি আছে রে,
সোনার ফাতেমা রে!
নদীর কূলে, মা, কলমি লতা আছে রে,
সোনার ফাতেমা রে!
তারা যে সয়, মা, ভরা গাঙ্গের আফাল রে,
সোনার ফাতেমা রে!
তারা যে সয়, মা, চৈড়-বৈঠার বাড়িরে,
সোনার ফাতেমা রে !
তেমনি সয়ো, মা, পরার পুতের জ্বালারে,
সোনার ফাতেমা রে।
তেমনি সয়ো, মা, তার মা- বাপের জ্বালারে,
সোনার ফাতেমা রে।

এই গানের মধ্যে আছে কন্যা বিদায়ের সময় মায়ের মনের বিলাপপূর্ণ আবেগ। এসব গানের সুরটাও হলো কতকটা একটানা কান্নারই মতো। এতে স্বর-বৈচিত্র।

বিয়ের উৎসবের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতিতে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহী অঞ্চলে কেবল মুসলমানদের বিবাহেই বিয়ের গানের চল আছে। হিন্দুদের বিবাহ উৎসবে এরকম বিয়ের গীতের প্রচলন নেই।

এখন আমরা পত্র-পত্রিকায় নারী হরণের অনেক খবর পড়ি। আগেও যে নারী হরণ ছিলনা, তা নয়। এমনি একটি নারী হরণের ঘটনাকে নিয়ে বাঁধা গানের কথাগুলি এরকম ঃ

আগা নায়ে ঝিমিক ঝিমিক,
আমার পাছা নায়ে পানি,
ও-আমি ক্যানে আইলাম নাইতে।
আস্তে আস্তে মারো বইঠা
ওইযে আমার পতির কাদন শুনি!
ও-আমি ক্যানবা আইলাম নাইতে।
একো ডুবে, দুয়ো ডুবে, তিন ডুবের কালে
কোনঠিকার এক ময়ফুল
রাজা অ্যাসে তুল্যা নিলো নায়ে।
ও-আমি ক্যানবা অ্যালাম নাইতে।

www.pathagar.com

ক্যান্দোনা, ক্যান্দোনা পতি
চিত্তে লও ক্ষেমা।
বাকসো ভরা রলোরে গয়না
ফির‍্যা কইরো শাদি।
ও–আমি ক্যানে অ্যালাম নাইতে।

এখানে স্বামীর দুঃখে স্ত্রী দুঃখিত। স্ত্রী স্বামীকে তার দুঃখ ভুলবার জন্যে আবার বিয়ে করে সুখী হতে বলছে। পতির সুখেই সতীর সুখ, একদিন এদেশের মেয়েরা তাই ভেবেছে । স্ত্রী বলছে, বাক্সভরা তার যে গহনা থাকছে, তা দিয়েই নতুন বৌকে ঘরে আনতে! তাকে মায়ফূল রাজা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে অসহায় নারী, কিইবা করতে পারে!

রাজশাহীর গ্রামে এবং শহরের অনেক পাড়ায় শীতের দিনে গল্প বলার চল ছিল। এসব গল্প মশগুল হয়ে শুনতো মানুষ। অনেকে গল্প বলে পয়সাও নিত। গল্পের মধ্যে থাকতো গান। গল্প বলা লোকের সঙ্গে থাকতো গান গাওয়ারও লোক। এভাবে গল্প বলবার চল শহরে এখন আর নেই। কিন্তু গ্রামে এখনও বেশ কিছু পরিমাণে আছে। ভেলুয়া সুন্দরী, সোনা ভানের কেচ্ছা, রূপভানের কেচ্ছা, মধু-মালা, কিরণ-মালা, গহর বাদশা, সইফুল মুলুক ও বদিউজ্জামান, প্রভৃতি বহু কাহিনীই বলতেন কেচ্ছা কথকরা। অনেক কেচ্ছা চলত কয়েক রাত ধরে।

রাজশাহীতে অনেক যাত্রা হতো। এসব যাত্রার মধ্যে ভাসান-যাত্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পদ্মপুরাণের বেহুলা ও লক্ষিন্দরের কাহিনী নিয়ে হতো এই যাত্রা। যদিও ভাসান-যাত্রার কাহিনী হিন্দু পুরাণ থেকে নেওয়া, কিন্তু এই যাত্রা অভিনয় করতেন মুসলমানরা। আর সাধারণত দেখতেনও মুসলমান জনসাধারণ। রাজশাহীতে একসময় খুবই সাপের উপদ্রব ছিল। তাই সম্ভবত বেহুলা-লক্ষিন্দর কাহিনী এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। ধর্মের চাইতে এর রূপকথার দিকটি মানুষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতো। একসময় রাজশাহীতে একাধিক আলকাব-এর দল ছিল। আলকাব হলো পাঁচমিশালী অনুষ্ঠান (Variety show)। এতে থাকতো রাধা-কৃষ্ণের গান। থাকতো হাস্য কৌতুক। থাকতো কবি-গানের মতো ছড়ার মাধ্যমে কোন একটা বিষয়ে প্রশ্ন আর উত্তর। এক পক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিত আর এক পক্ষ। কতকটা তরজার ধরনে। 'আলকাব' (সাধারণত উচ্চারণ করা হয়, 'আলকাপ') হলো একটি আরবী শব্দ। শব্দটার মানে হলো 'শিরোনাম'। বিভিন্ন শিরোনামের বিষয় থাকতো বলেই বোধ হয় হতে পেরেছিল এই নাম। এতে গান, আবৃত্তি ও অভিনয় থাকতো। ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচত। যার মধ্যে বেশ কিছুটা অশ্লীলতাও থাকতো। আলকাবের দল সাধারণত মুসলমানরাই গড়তেন। আর এর দর্শক শ্রোতাও হতেন প্রধানত মুসলমানরাই। 'তরজা' শব্দটা আরবী। 'তরজা' বলতে বোঝায় দুই দলের গান। দুই দল এতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে গান গায়। এক দল গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করে, অপর দল গান গেয়ে তার উত্তর দেয় ।

www.pathagar.com

'আলকাব' আর 'তরজা' আগে এই দেশে ছিল, না মুসলমান আমলে বাইরে থেকে আসে, তা বলা যায় না। তবে আলকাব মুসলমানদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। যদিও এতে থাকতো আবার রাধা-কৃষ্ণেরও গান। ছোকরা সাজত রাধা। পারস্যে রঙ্গ-কৌতুককে বলে 'তামাসা'। আলকাব-এর রঙ্গ-কৌতুক কতকটা তামাসারই ধরনের। আলকাবের রঙ্গ-কৌতুক বা তামাসার একটু নমুনা দেওয়া যাচ্ছে ঃ

সে যুগের কথা। নতুন বউ কয়মাস খুব লজ্জা দেখিয়ে চলতো। বিধবা মায়ের এক ছেলে। সে সদ্য বিয়ে করেছে । নতুন বউকে মন খুলে দুটো কথা বলতে চায়। বউ তার শাশুড়ির কাছে কাছে থাকে। ছেলের কাছে আসতে চায় না। ছেলে এক ফন্দি করে। সে কাঁদতে থাকে। মা বলে, "কাঁদছিস কেন?" ছেলে বলে, "শুনলাম মামার খুব অসুখ।" মা বলে, "আমার সাথে চল। দেখে আসি মামার কি হয়েছে।" ছেলে বলে, "বাড়িতে নতুন বৌ কি একা থাকতে পারবে!" মা বলে, "চল তবে আমরা তিনজনেই যাই।" ছেলে বলে, "বাড়িতে কেউ না থাকলে চুরি হতে পারে।" মা বলেন, "তাইতো, তা হলে আর যেয়ে কাজ নেই। তোর মামা বাড়ি তো বেশি দূরে নয়। তেমন কিছু হলে নিশ্চয় খবর পেতাম।" ছেলে এবার নতুন ফন্দি করে। সে বৌ-এর নানী সেজে আসে। নিজের বৌ-কে মার অনুপস্থিতিতে এক ফাঁকে বাড়ি ঢুকে বলে, "আমি তোর নানী হই। আমি তোর মায়ের খালা। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম কেমন আছিস দেখে যাই। তোর বিয়েতে তো যাওয়া হয়নি! আহা, তোর মাকেই তো কতদিন দেখিনা।" এসব শুনে নতুন বৌ ঘোমটা তোলে। নানীর কাছে আর কিসের লজ্জা! ছেলে তখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রং-তামাশার আর একটা নমুনা ঃ

এক কৃষক মাঠে চাষ করতে যায়। কৃষকের বৌ ঠিক সময় মাঠে তার স্বামীর জন্যে দ্বিপ্রহরের খাবার (লাহারী) পাঠায় না। ফলে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া বাধে।

স্ত্রী - আমি লাহারী পাঠাতে পারবো না।

স্বামী - কেন পারবি না।

স্ত্রী - তোমার ছেলে সামলানো কঠিন। কাজ কাম করে সময় পাইনা। ঠিকসময় লাহারী পাঠাতে পারবো না।

স্বামী - না পারবি তো ছেলে রেখে ঘর ছাড়।

স্ত্রী - ছেলে আমার।

স্বামী - ছেলে বাপের।

স্ত্রী - ছেলে আমরা পেটে ধরি।

স্বামী - ছেলে বাপের। জানিস, শীশ নবীর মা ছাড়াই জন্ম হয়েছিল শিশিরের মধ্যে।*

---

* কেবল বাপের বীজ থেকে শীশ নবী শিশিরের মধ্যে জন্মেছিলেন, এটা একটা প্রচলিত ধারণা। লোক- কবিরা বলে থাকেন। ধর্মশাস্ত্রে নেই।

www.pathagar.com

স্ত্রী - ছেলে মায়ের। ঈসা নবীর বাপ ছিলনা। রোজ হাসরের ময়দানে আল্লাহ্ মায়ের পরিচয়েই সবাইকে ডেকে বিচার করবেন, বাপের পরিচয়ে নয়।

গ্রামের প্রধান - তোমরা ঝগড়া করছো কেন? ছেলে নিয়ে টানাটানিই বা করছো কেন?

প্রধানকে স্বামী স্ত্রী তাদের ঝগড়ার মূল কারণের কথা খুলে বলে। প্রধান তাদের কথা শুনে বলেন, আমরা এখন কেউ শীশ এবং ঈসা নবীর মতো জন্মাই না। আমরা সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম হতে মা-বাপের প্রয়োজন হয়। ঠিক মতো ছেলে মেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হয় মাতা পিতার। ছেলে মেয়ের ভালর কথা ভেবে তাই মা-বাপের এখন থাকা উচিত একত্রে। পুরুষ বড়, না নারী বড়, তা নিয়ে ঝগড়া করে ফয়দা নেই। দুজনে মিলেই তৈরী হয় সংসার। এভাবে হঠাৎ আসা গ্রামের প্রধানের মধ্যস্থতায় মেটে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া।

এই রং তামাশায় ছেলেকে নিয়ে মায়ের তার নিজের বাপের বাড়ি চলে যাবার চেষ্টা, আর বাপের তার নিজের ছেলের পা ধরে টানাটানির অভিনয় উপভোগ্য। দুজনের অঙ্গভঙ্গী হাসির উদ্রেক করে।

আলকাবে কথোপকথন চলে সমিল ছড়া এবং গানের মাধ্যমে। এসব ছড়া ও গান হলো উপস্থিতভাবে তৈরি করা। গান ও ছড়ার ভাষা হয়ে থাকে আঞ্চলিক। স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে, রাধার-কৃষ্ণের গানের মধ্যে, বেশ কিছু অশ্লীল শব্দও থাকতে পারে এবং থাকে। কিন্তু এই অশ্লীলতার একটা নাটকীয় প্রভাব পড়ে শ্রোতা-দর্শকের উপর। যা হলো আলকাব-এর বৈশিষ্ট্য।

অনেকে আধুনিক সাহিত্যের অশ্লীলতা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু লোক-সাহিত্যেও অশ্লীলতার অভাব নেই। আলকাবে ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচে। এসবের ফলে সমকামীতাও অনেকক্ষেত্রে প্রশ্রয় পায় (বিলাতে শেক্সপিয়ার-এর আমলে ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করতো। মহাকবি শেক্সপিয়ার-এর বিখ্যাত সনেটগুলি নাকি কোন ছেলেকে কেন্দ্র করেই লেখা!)।

আলকাবে কোন স্টেজ থাকে না। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে আলকাব অনুষ্ঠান হয়। দর্শক-শ্রোতারা চারধারে গোল হয়ে বসে। আলকাব গানে উঁচু পর্দায় সুর তুলে হারমোনিয়ম বাজান হয়। আর সেই সঙ্গে বাজান হয় তবলা, করতাল, মন্দিরা এবং কখনো কখনো বাঁশি। নাচের তাল সাধারণত হলো খেমটা। প্রত্যেক আলকাব দলের একজন করে পরিচালক থাকেন। আলকাব দলের পরিচালককে বলে ওস্তাদ।

www.pathagar.com

আলকাব রাজশাহী শহরের ধারে কাছে এখনো কিছু কিছু হয়। রাজশাহীর বিনোদপুরে আলকাব-এর একটা দল আছে। রাজশাহীর গ্রাম অঞ্চলেও আলকাব কিছু কিছু হয়। তবে সাধারণভাবে মানুষ এখন ঘরে বসে টেলিভিশন দেখা-ই বেশী পছন্দ করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখন সাধারণ মানুষেরও রুচির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

আগের দিনে মালদহ, রাজশাহী এবং মুর্শিদাবাদে আলকাব যথেষ্ট প্রচলিত ছিলো। রাজশাহীর আলকাব ছিল নামকরা।

পল্লীর গান নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন পল্লী সঙ্গীত নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন তাঁর 'হারামণি' নামক পল্লী সঙ্গীত বইয়ের ভূমিকায়। তিনি কিছুদিন রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। মনসুর উদ্দীন তাঁর পল্লী গানের সংগ্রহ প্রকাশ করেন 'হারামণি' নামে। কিন্তু তিনি তাঁর সংগৃহীত গানগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা বজায় রাখেননি। এতে অনেকক্ষেত্রে গানগুলির অঙ্গহানী ঘটেছে। তাঁর বইতে দেওয়া রাজশাহী অঞ্চলের একটি গানের কথা হলো এই রকম ঃ

নকল পাগল অনেক আছে
আসল পাগল কয়জনে
মনের মতো পাগল পেলাম না
তাই তো পাগল হলাম না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে হবে কি? আর কেনইবা আমরা করতে যাব এই ঘর ছাড়া দর্শনের গুণকীর্তন! আজকাল অনেক নামকরা অধ্যাপক বাউল দর্শন নিয়ে গৌরব করতে চান। বলেন, এর মধ্যে ধরা পড়েছে শাশ্বত বাংলার মন। কিন্তু কেবল বাউল দর্শন নির্ভর করেই বাংলার লোক-গীতি গড়ে ওঠেনি। বাংলার লোক সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আগে রাজশাহীর পল্লী গানের যে দুটি নমুনা আমরা উদ্ধৃত করেছি, তা আশুতোষ বাবুর বই থেকে নেওয়া। কেবল বাউল গানই বাংলার পল্লী সঙ্গীত নয়। উত্তর বঙ্গের রংপুর অঞ্চল পল্লী গানে খুবই সমৃদ্ধ। সেখানকার পল্লী গীতি অনেককেই মুগ্ধ করে। এসব গানের কথার অংশ অনেক কবিত্বময়। যেমন ঃ

দিনের শোভা সুরুয রে ভাই
রাইতের শোভা চান।
হালুয়ার শোভা হাল কৃষি
জমিনের শোভা ধান ॥
ঘাসের শোভা সবুজ রং রে
মাটির শোভা ঘাস।
কাশিয়ার শোভা ধপলা ফুল
আসিলে ভাদর মাস ॥
ফর্নীর শোভা মনি হায়রে

www.pathagar.com

গজের শোভা মোতি।
মোর আঙ্গিনায় শোভা হইছেন
নারী রূপবতী ॥

এই গানের মধ্যে ঘর ছাড়ার কথা নেই। আছে ঘর গড়বার প্রবল ইচ্ছা। এইটাই অধিকাংশ মানুষের সাধারণ ইচ্ছা।

রাজশাহী অঞ্চলে সংগীত, যেসব গানের সঙ্গে আমি পরিচিত, তার কথাবস্তু এতো সুন্দর নয়। তবু অনেক গানের কথাবস্তু যথেষ্ট সুন্দর। আর এর সুরেও আছে একটা স্বতন্ত্রধারা। রংপুর কুচবিহার অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতকে পরিশীলিতভাবে পরিবেশন করেছেন আব্বাস উদ্দীন। তিনি উত্তরবঙ্গের গান, 'ভাওয়াইয়া'-কে দিয়েছেন বিশেষ প্রাধাণ্য। তিনি ঐ গানের মধ্যে,ঐ সুরের মধ্যে জন্মেছিলেন। রংপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানের কথা ও সুর লোক-সঙ্গীত হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। একসময় আব্বাস উদ্দীনের রেকর্ডের গান রাজশাহীতেও মানুষ গ্রামে-গঞ্জে অনেক গেয়েছে। সেটাও ইতিহাস।

'জন-সংস্কৃতি' আর 'ভদ্র -সংস্কৃতির' স্বাদ এক নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"পতিসর, ১১ আগস্ট ১৮৯৩। অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারি অদ্ভুত--কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার, পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই--- খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধানখেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে ; পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে ; জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল বসে আছে। দ্বীপের মতো অতিদূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে। যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী। দু ধারে গ্রাম, পাটের খেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।

ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলি ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল ঃ

যোবতি ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব
ট্যাকা দামের মোটরি।

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন ক'রে সংগীত রচনা করেছেন আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই। কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে ; তাতেই বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশী দুর্মূল্য নয়, এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে

www.pathagar.com

বেশ মজার লাগল---যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এই গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্রবিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে ; আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবি-ভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখদুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক---আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।" (ছিন্নপত্র)

রবীন্দ্রনাথ যখন এই মন্তব্য করেছিলেন, তারপর অনেক বছর গত হয়েছে। শহর আর গ্রামের মধ্যে ব্যবধান কমেছে অনেক। ব্যবধান কমছে অভিজাত এবং জন-সংস্কৃতির মধ্যে। আগে বাংলাদেশের নানা অঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল ভিন্ন । কিন্তু এখন সারা দেশে স্থাপিত হতে যাচ্ছে একটা ভাষাগত ঐক্য। আজ এই রেডিও-টেলিভিশনের যুগে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আগের তুলনায় ভিন্ন না হয়েই পারেনা । মানুষ এখন যাত্রা দেখে আনন্দ পাচ্ছে টেলিভিশনেই। টেলিভিশনের মাধ্যমেই প্রধানত শুনছে লোকগীতি। এক কালের জন-সংস্কৃতি পরিমার্জনা পেয়ে হয়ে উঠছে বিশেষ অর্থে অভিজাত সংস্কৃতি। রাজশাহী অঞ্চলের বিয়ের গানের ক্যাসেট এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। বিয়ে বাড়িতে মাইকে বাজান হচ্ছে তা ঃ

গাহ্ গাহ্ গায়নারা গাহ্
গাহ্ সারারাতি।
আজক্যা রাতে লুট্যা লিব
ভায়ের শালার বাড়ি।
গাহ্ গাহ্ গায়নার গাহ্
গাহ্ সারারাতি ॥

www.pathagar.com

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
নাথ-সাহিত্য

নাথ বা যোগী বলে এক বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল। নাথদের সাধনার লক্ষ্য ছিল নরদেহে অমরত্ব অর্জন। এই সাধনার মূল অঙ্গে ছিল সংযম, 'ব্রহ্ম-চর্য' এবং 'কায়া-সাধন' নামক যোগ প্রক্রিয়া। যা করলে রেত উর্ধ্বমুখী হয়। পরমায়ু বাড়ে। এরা মনেকরত রেতক্ষয় মানুষকে আয়ুহীন করে। এরা তাই চাইতো নারী সংসর্গ ত্যাগ করতে। সন্যাস জীবনযাপন করতে। নাথদের মতে, প্রতি মানুষের মস্তকে থাকে অমৃতক্ষরণকারী চন্দ্র এবং নাভি-দেশে থাকে অমৃতবিনাসী সূর্য। 'কায়া-সাধন' নামক যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সূর্যের গ্রাস থেকে চন্দ্রের অমৃতক্ষরণকে রক্ষা করা যায়। এদের মতে, মানুষের শরীরে আছে ৩২টি 'নাড়ী'। তার মধ্যে দিয়ে শক্তি (বীর্য) মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ প্রদেশে প্রবাহিত করা যায়। শক্তি যখন মস্তিষ্কের মহাসূক্ষ্ম স্থানে যেয়ে পৌছায়, তখন সাধনার শেষ এবং সাধক পরম ও চরম আনন্দ অর্থাৎ এক মহাসুখ লাভ করে থাকে। সাধকের কাছে তখন বহির্বিশ্ব লুপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়াদি কিছুরই জ্ঞান থাকে না। যোগীদের এইসব ধারনার সঙ্গে মিল থাকতে দেখা যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের। পথে-ঘাটে ঘোরা বাউল এবং অবধূতদের (সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসী বিশেষ)। অন্যান্য ধর্মে যেখানে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে পরকালে পরম শান্তি পাবার পথ, নাথপন্থে তখন চিন্তা করা হয়েছে কিকরে অমরত্ব লাভ করা যায়। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া চলে। কায়া-সাধন পদ্ধতি গুরুর কাছ থেকে শিখতে হয়। তা হলো গুহ্য-বিদ্যা। গুরুভক্তি তাই অপরিহার্য। নাথপন্থী গুরুদের নিয়ে যেসব কাহিনী রচিত হয়েছে তাকে বলা হয় নাথ-সাহিত্য। এতে আছে অনেক আলৌকিক উপাদান। আর আছে সব কিছু ছেড়ে স্বামীর সন্যাস গ্রহণের ফলে স্ত্রীদের দুঃখের বর্ণনা। রাজার ছেলে সবকিছু ত্যাগ করে হচ্ছে সন্ন্যাসী। এই ত্যাগের মহিমাও এসব কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এইসব ত্যাগের লক্ষ্যই হলো এক ব্যক্তির অমরত্ব লাভ। অন্য ধর্মের মতো পরকালের সুখভোগ নয়। নাথ-সাহিত্যে ঘটেছে নাথ-চিন্তার প্রতিফলন।

নাথদের আদি গুরু চারজন– মীন নাথ, গোরক্ষ নাথ, হাড়িপা ও কানুপা। গোরাক্ষ নাথ মীননাথের শিষ্য এবং কানু পা হাড়ি পার শিষ্য। বাংলার নাথ-সাহিত্যের কাহিনী মূলত হলো দুটিঃ গোরক্ষ নাথ-মীন নাথের কাহিনী এবং হাড়িপা-কানুপা-ময়নামতী-গোপীচাঁদের কাহিনী। শেষের কাহিনী নিয়ে যেসব লেখক পুঁথি রচনা করেছেন, তারা সকলেই যে নাথসম্প্রদায়ের লোক, তা নয়। এমনকি সকলে হিন্দুও নন। এই সব লেখকের কেউ কেউ হলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। যেমনঃ ফয়জ-উল্লা এবং শুকুর মামুদ। শুকুর মামুদের বিরচিত পুঁথি, "গুপিচাঁদের সন্ন্যাস" বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে নতুন করে প্রকাশ করা হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন, এ.কে.এম. যাকারিয়া। শুকুর মামুদ কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, তা নিয়ে অনেক বির্তক আছে। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে শুকুর মামুদের বাড়ি

www.pathagar.com

ছিল 'সিন্দুর কুসুমী' গ্রামে। এই গ্রাম রামপুর-বোয়ালিয়া থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। শুকুর মামুদ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

আব্দুল শুকুর নাম পিতায় রাখিল।
শুকুর মামুদ নাম কুলেতে রাখিল ॥

এর বেশী আত্ম-পরিচয় তিনি তাঁর "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" নামক পাঁচালীতে প্রদান করেননি। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-এর কাহিনী হলো এই রকম ঃ মুকুল বলে এক শহর ছিল। সেখানে ছিলেন এক রাজা। তাঁর নাম মানিকচন্দ্র। মানিকচন্দ্রের অনেক রাণী ছিল। এক রাণীর নাম ছিল ময়নামতী। তিনি রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। ময়নামতী ছিলেন গুরু গোরাক্ষ নাথের শিষ্যা। তাঁর ছিল মহাজ্ঞান। তিনি ছিলেন যোগসিদ্ধা। অন্য রাণীদের সঙ্গে ময়নামতীর বনতো না। রাজা তাকে তাই রাখেন 'ফেরুসা নগরে'। সেখানে স্বামী সম্ভোগ ছাড়াই তাঁর এক সন্তান হয়, গরু গোরাক্ষ নাথের বরে ঃ

একরাত্রি না বাঞ্ছল স্বামীর বাসরে।
এক পুত্র হইল মুনি গোরখের বরে ॥

পুত্রের জন্মের পর পুত্রকে নিজ পুত্র রূপে ধাত্রীর কাছে মানুষ করবার ভার দিয়ে রাণী ময়নামতী কায়া-সাধনে নিরতা হন। রাজা মানিকচন্দ্র এই পুত্রকে মেনে নেন। পুত্রের বয়স যখন বারো বছর হলো, তিনি তখন ময়নামতীকে কিছু না জানিয়ে ছেলের বিয়ে দিলেন মহা ধুম-ধাম করে, তিন রাজার তিন কন্যার সঙ্গে। পূবদেশের রাজা মহিচন্দ্রের কন্যা চন্দনা, উত্তর দেশের রাজা নিহালচন্দ্রের কন্যা বন্দনা এবং পশ্চিম দেশের হরিশচন্দ্রের কন্যা অদুনা হলেন তাঁর তিন স্ত্রী। অদুনার খালাতো বোন হলো পদুনা। পদুনাকে তিনি পেলেন অদুনাকে বিয়ে করার যৌতুক হিসাবে। ফলে পদুনাও হলেন কার্যত তার স্ত্রী। এই চার স্ত্রী নিয়ে মহাসুখে কাটতে থাকে গুপিচন্দ্রের সময়। এদিকে রাজা মানিকচন্দ্রের মৃত্যু ঘনিয়ে আসল। কারণ, তিনি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলেন। প্রজারা শিবের কাছে এই অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে পুজা দিল। করল অত্যাচারী রাজার মৃত্যু কামনা। শিব প্রজাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন ঃ

এতেক কহিয়া রাজা করে অহঙ্কার।
অকারণে গেল রাজা যমের দুয়ার ॥

শিবের ইচ্ছায় স্বামীর মৃত্যু হতে যাচ্ছে জানতে পেরে ময়নামতী ছুটে এসে স্বামীকে বললেন তাঁর কাছ থেকে মৃত্যুজয়ের জ্ঞান নিতে। রাজা বল্লেন, স্ত্রীর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ রাজার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোন রাজা মরণের ভয়ে তার স্ত্রী সেবক হতে পারে না। সব শাস্ত্র বলে, জন্মালে মরতে হয়। তাই স্ত্রীর কথা শ্রবণ করার চাইতে তিনি মরণকেই মনে করেন শ্রেয়। ফলে মৃত্যু হলো রাজার। এদিকে গণক গুনে বল্লো, পুত্র গুপি চন্দ্রের যখন বয়স ১৮ পেরিয়ে ১৯ বছরে পড়বে, যদি তখন সে সন্ন্যাস গ্রহণ না করে, তবে মারা যাবে। ময়নামতী তাই ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বল্লেন। ছেলে সন্ন্যাস গ্রহণে প্রথমে রাজি হয়

www.pathagar.com

না। পুত্রবধূরা অর্থাৎ চার রাণীও করতে থাকে এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা। স্বামী যোগী হবে এই কথা শুনে তারা বলে ঃ

এইরূপ যৌবনকালে
এহি ছিল কপালে
যুগী হইবে নয়নের কাজল।
পতি যাবে যুগী হইয়া
ঘর বর কারে লৈয়া
চারি রাণী খাইব গরল।

ময়নামতী ছেলে গুপিচন্দ্রকে বলেন, তোমার পিতাকে বলেছিলাম আমার কাছে জ্ঞান সাধনা করবার কথা। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বললেন ঃ

জন্মিলে মরণ আছে সর্ব শাস্ত্রে কঞ।
আমি হইবো স্ত্রীর সেবক মরণের ভঞ ॥
তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
তবুত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি ॥

ময়নামতী ছেলেকে বলেন, তোমার পিতা আমাকে অবহেলা করতে পারেন তাঁর স্ত্রী বলে। কিন্তু তুমি আমার পুত্র হয়ে নিজের মাকে অমান্য ও অবহেলা করতে পারনা। আমি তোমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বলছি মা হিসাবে। মায়ের কথায় যাতে সন্তানের প্রত্যয় হয়, সেজন্য তিনি অনেক অলৌকিক কর্মকান্ড প্রর্দশন করলেন। ফলে ছেলের বিশ্বাস হলো। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন ঃ

শুকুর মামুদ কহে পয়ার প্রবন্ধ।
যেরূপে হইবে যুগী রাজা গুপিচন্দ ॥
এহিরূপে সর্বজন রহিল এহি ঠাঞি।
পুত্রকে যুগী করে এথা মঞনামতী ॥
নাপিত আনিয়া রাজার মস্তক মোড়াইল।
গলে ক্ষেতা দিয়া মুখে ভুসন চড়াইল ॥
বগলে বগলী দিল সিংহনাদ গলে।
রক্ত-চন্দন ফোটা পরাইল কপালে ॥
চকমকি পাথর নিল বটুয়া আধারি।
ঘোর মেখলি দিল রসের খাপরী ॥

রানীদের খুব দুঃখ হলো ঃ

পতিহীন গৃহবাস
কি তার জীবন আস
জল বিনে মৎসের মরণ।

www.pathagar.com

দিবসে জুড়এ বাতি
যেন আমবস্যার রাতি
কি করে সহস্র তারা গন ॥

গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস জীবনে অনেক কষ্ট হয়। কারণ, ঘটনাচক্রে গুপিচন্দ্রকে এক গণিকার কৃতদাস হতে হয়। অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। হাড়িপা গুপিচন্দ্রকে অনেক জ্ঞান দিলেন। কষ্টও দিলেন। পরীক্ষা করলেন। হাড়িপা ছিলেন ময়নামতীর গুরু ভাই। ফেরুসাতে বাসের সময় এঁরা পরস্পর অনেক সময় একত্রে যোগ-অভ্যাস করতেন। রানীরা এবং একসময় গুপিচাঁদ নিজেও সন্দেহ করতেন যে, তাঁর মাতার সঙ্গে হাড়িপার অবৈধ সম্পর্ক আছে। তাই হাড়িপা তাকে গণিকার কৃতদাস করে কষ্ট দিলেন। বারো বছর বাদে গুপিচাঁদ সন্ন্যাসব্রত শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে ঢুকবার সময় রাণীরা তাকে চিনতে না পেরে তাঁর উপর কুকুর লেলিয়ে দিলেন। কিন্তু কুকুর তাঁকে চিনতে পেরে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তখন রাণীরাও তাকে চিনলেন। মাথারজট মুড়িয়ে গুপিচাঁদ আবার রাজ বেশে রাজত্ব করতে আরম্ভ করলেন। এই হলো গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণে দীর্ঘ জীবন লাভের কাহিনী।

শুকুর মামুদ-এর নিবাস কোথায় ছিল তা নিয়ে বির্তক আছে। কিন্তু রাজশাহীর বাগমারা থানায় মৃকুল বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটা বিরাট উঁচু ঢিবি আছে। যা খনন করলে কিছু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। একবার ইংরেজ আমলে এই স্থানটি খননের কথাও হয়েছিল, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে। শুকুর মামুদ গুপিচন্দ্রের বিবাহের বর্ণনা দিতে যেয়ে মৃকুল শহরের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

মৃকুল শহরে ঢুলি ছিল যতজন।
রাজার বড়িতে আইল বিভার কারণ ॥
ঢাকঢোল বাজে আর ধঙ্‌সা নাকাড়া।
দক্ষিনী জোড় খাই বাজে কাড়া টিকাড়া ॥
রণসিঙ্গাঁ ভেউর বাজে হইয়া এক সঙ্গ।
মৃকুল শহরে হইল বিভার বাদ্যের রঙ্গ ॥

একসময় উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গে গোপীচন্দ্রের (গৃপিচান্দর) গান বা পাঁচালী খুব জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বাংলার অন্যত্র ছিলনা। এর কারণ, রাঢ় ও সমতট অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গানে কোন হিন্দু দেবতার মাহাত্ম কীর্তন করা হয়নি বলে ব্রাহ্মণদের কাছে ধর্মীয় কারণে এর গ্রহণযোগ্যতা ছিলনা। ফলে রাঢ় ও সমতটে-এর তেমন কদর হতে পারেনি, এরকমই মনে করেনে অনেক সমালোচক।

ময়নামতীর গানে অদুনা আর পদুনার দুঃখের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ময়নামতীর অনেক পাঁচালীতে গুপিচাঁদের স্ত্রী হিসাবে কেবল অদুনা আর পদুনার উল্লেখ আছে। কিন্তু শুকুর মামুদের রচনায় গুপিচন্দ্রের আরো দুই স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চার স্ত্রীর মধ্যে পদুনার অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে। কারণ, পদুনা ঠিক বিয়ের বৌ নয়। যৌতুকের

www.pathagar.com

বউ। এরকম যৌতুক দেবার রীতি একসময় হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। যৌতুকের বউকে অন্য বউদের তুলনায় অনেক হেয় ভাবা হতো। শুকুর মামুদ বিরচিত গুপিচাদের সন্ন্যাসে তাই পদুনাকে বিলাপ করতে শোনা যায় ঃ

শুন মোর দুঃখের কথা
প্রসবকালে মৈল মাতা
মামী মাত্র করিল পালন।
আমার যতেক দুখ
কহিতে বিদরে বুক
নাহি জানি কিরূপ জননী ॥
আমি মরি মনস্তাপে
বিভা নাহি দিল বাপে
আমাকে দিলেন যৌতুক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা নাথ-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ এর একটা বড় রকমের প্রভাব রাজশাহী অঞ্চলে ছিল। নাথ-সাহিত্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন শ্রী সুকুমার সেন, তাঁর বহুল পঠিত "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" নামক বইতে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে । এতে তিনি লিখেছেন ঃ "শ্রী যুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলিয়াছেন যে, তাহার নিকট শুকুর মামুদের পাঁচালীর এক পুঁথি আছে। তদানুসারে কবির বাসস্থান সিদুর কুসুমী গ্রামে। এই গ্রাম রামপুর-বোয়ালিয়ার প্রায় ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে। ইহা ব্যতীত শুকুর মামুদ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।"

এখনও শুকুর মামুদ (অনেকে শুকুর দন্ত 'স' দিয়ে লিখেন) সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয়নি। গুপিচন্দ্রের অথবা ময়নামতীর কাহিনী যথেষ্ট পুরানো। এই পুরানো কাহিনীকে নতুন করে বলেছেন শুকুর মামুদ। যোগ করেছেন তার আপন ভাব-কল্পনা। এখনকার অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, শুকুর মামুদ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। শুকুরের লেখায় অনেক ফারসী শব্দ পাওয়া যায়, যা বাংলা ভাষায় সে সময় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

বহু প্রাচীন সাহিত্যেই নারী-দেহের স্থূল বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যাকে এখন মনে হয় অশ্লীল। নাথ-সাহিত্যেও এরকম অশ্লীলতা আছে। নাথ-সাহিত্যে অলৌকিক কাহিনীর পাশাপাশি সে সময়কার সমাজ জীবনের ছাপও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, নাথ-সাহিত্যে ময়নামতীর স্বামী রাজা মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে প্রজাদের উপর অত্যাচার। প্রজাদের উপর জোর করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করবার জন্য প্রজারা শিবের কাছে প্রতিকার চেয়ে প্রার্থনা করছে। শিব মানিকচন্দ্রের প্রাণ হরণ করবার জন্য পাঠান এক যমকে। রাণী ময়নামতী তা জানতে পেরে রাজাকে বলেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কায়া-সাধন করতে। রাজা বলেন, রাজা হয়ে রাণীর শিষ্য হওয়া অবমাননাকর। তিনি এরকম

www.pathagar.com

অবমাননাকর প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষম। ছেলে মায়ের কথা শুনতে পারে। ছেলের পক্ষে মায়ের কথা শোনা আদৌ অবমাননাকর নয় । তাই রাজা মানিকচন্দ্র বলেন ঃ

তোমার যে এহি জ্ঞান মোর কার্য নাহি।
সব জ্ঞান কহি দিও গুপিচাঁদের ঠাঞি ॥

অর্থাৎ সমাজে সে সময়ও মেয়েদের যথেষ্ট হেয় জ্ঞান করা হতো। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা বিদ্রোহী হতো। রাজাকে মেনে নিতে চাইতো না। প্রজার রোষ রাজার মৃত্যুর কারণ হতো। সবরকম সাহিত্যই কিছু না কিছু সমাজ বাস্তবতার ছাপ বহন করে। নাথ-সাহিত্যে তান্ত্রিক সাধনার কথা বলা হয়েছে। জীবমাত্রেরই জৈবধর্ম বেঁচে থাকতে চাওয়া। মানুষ তাই এক সময় নানাভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে অমৃতত্ব লাভের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার সন্মুখীন হয়েছে নানা সমাজ সমস্যারও। যাকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। অনেকের মতে অন্যান্য নাথ-সাহিত্যিকদের তুলনায় শুকুর মামুদ ছিলেন একটুবেশী নারী-বিদ্বেষী। তাই তিনি বলেছেন ঃ

পুরুষের ধন লয়া নারী বেপার করে।
লোভেতে থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মরে।

এক সময় বাংলার বৌদ্ধরা হয়ে উঠেছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাঁরা সে সময় তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দিয়েই লাভ করতে চাইতেন নির্বাণ। এই তান্ত্রিক সাধনা-কৌশল কেবল গুরুরাই জানেন। তাই গুরুভক্তির মাধ্যমেই কেবল এর কৌশল শেখা যেতে পারে। গুরু ভক্তি ছিল এই ধর্ম বিশ্বাসের প্রথম সোপান।

প্রাচীন তান্ত্রিক ধারণা এখনও এখানে সেখানে কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তথাকথিত পীর-ফকিররা এমন অনেক কিছু করেন, যা মনে করিয়েদেয় এদেশে প্রচলিত এক সময়কার তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণারই কথা। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজশাহী গেজেটিয়ারে লেখা হয়েছে, এমন কিছু লোক নাটোর, নওগাঁ এবং রামপুর-বোয়ালিয়াতে আছে, যারা নিজেদের দাবী করে মুসলমান হিসাবে; কিন্তু তাদের কার্যকলাপ ইসলামের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এরা সব হলো 'নেড়া ফকির'-এর শিষ্য। এরা এদের ধর্ম সাধনার অংশ হিসাবে নিজেদের মূত্র পান করে এবং গায়ে মাখে !

গ্রামে-গঞ্জে পীর-ফকির নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী এখনও প্রচলিত আছে। পীর-ফকিররা প্রাকৃতিক নিয়ম, কার্য-কারণ সূত্র, বদলে দিতে পারেন তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে। জড় জগতে নিয়ম এদের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যা খুশী তাই করতে পারেন তারা।

নাথ-সাহিত্যে যেসব গুরুর নাম পাওয়া যায়, বৌদ্ধ চর্যাপদেও তাঁদের অনেকের নাম থাকতে দেখা যায়। যেমন, মীননাথ, গোরখ্ নাথ। চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ হিসাবে গণ্য করা হয়। চর্যাপদ, কার কার মতে হলো প্রায় হাজার বছরের পুরানো।

www.pathagar.com

শুকুর মামুদ "গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস" ছাড়াও আর দুটি পাঁচালি রচনা করেছেন। এরা হলো, "সতীময়না" এবং "মৃকুল শহরের কাহিনী"। পাঁচালী বলতে বোঝাত পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাহিনী। যা শ্রোতাদের সুর, তান এবং লয়যোগে গান করে শোনান হতো। এক সময় সারা বাংলায় পাঁচালি গানের খুব চল ছিল।

www.pathagar.com

বিংশ পরিচ্ছেদ
লোক-শিল্প

লোক-শিল্প (Folk Art) বলতে সাধরণত গ্রাম্য সনাতন কৃষি-নির্ভর স্বল্প আয় মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা বিশেষ ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারাকে বোঝায়। খুব সাধারণ শিল্প-উপকরণ নিয়ে লোক-শিল্পের কারবার। কয়েকটি সাধারণ রঙ, কতগুলি মূল আকৃতি এবং ছন্দকে কেন্দ্র করে চলে এই শিল্প-প্রয়াস। যে সব জিনিস দিয়ে লোক-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পবস্তু গড়েন, তা খুব উচ্চ মূল্য নয়। তাদের কেনা যায় অথবা আহরণ করা যায় সহজেই। সবদেশেই লোক-শিল্প সাধারণ সহজ লভ্য জিনিসকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। লোক-শিল্পের অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত মেলে আমাদের দেশে। বাংলার কাঁথা লোক-শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সামান্য পুরাতন ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কাঁথা বানান হয়। কিন্তু এর ব্যবহারিক মূল্যের চাইতে শিল্পগত মূল্য কম নয়। ফুল, লতা-পাতা, পাখি ও অন্যান্য জীব-জন্তুর আকার-আকৃতি এবং জ্যামিতিক রূপের সাহায্যে রচিত কাঁথার নকসার আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই অনবদ্য হয়ে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন রঙের সুতা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে থাকে একটা বর্ণ বোধের বিশেষ পরিচয়। যা চলে আসছে বহু যুগ ধরে। গ্রাম্য কাঠের ও মাটির পুতুলে, বাঁশ, বেত ও সোলার কাজে, মাদুর ও শীতল পাটির নকসায়, পৌর-জীবন ও উচ্চবিত্ত মানুষের বিলাসী মনের প্রকাশ নেই, নেই নকসা কলার অতি সূক্ষ্ম সুচিক্কণ অভিব্যক্তি; কিন্তু আছে এক অনাড়ম্বর জীবনের সহজ শিল্পবোধের প্রকাশ। যা বহুদিনের পারমপার্যের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হতে পেরেছে। এই শিল্পকলা বিশেষভাবেই ব্যবহারিক। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসে কিছুটা সৌন্দর্য আরোপ হলো এর প্রধান লক্ষ্য। লোক-শিল্পের মধ্যে অবশ্য এমন অনেক জিনিসও পড়ে, যা দিয়ে আমরা ঘর সাজাই। যেমন, শখের হাঁড়ি। নামেই এর পরিচয়। জিনিস রাখবার চাইতে ঘর সাজাতেই এর ব্যবহার বেশি।

লোক-শিল্প সাধারণত হলো নির্বস্তুক। অর্থাৎ এতে জিনিসের গড়নের খুঁটিনাটি থাকেনা। থাকে কেবল গড়নের মূলভাবটুকু। যা দিয়ে চেনা যায়, আসলে বস্তুটা কিসের প্রতিনিধিত্ব করছে। মাটি বা কাঠের পুতুলে মানুষ এবং জীবজন্তুর মূলভাবটা থাকলেও তা থাকে অনেক সরলীকৃত এবং প্রথাগত (Stylized) ভাবে।

লোক-শিল্পীরা শিল্প-কর্ম নির্মাণ কোন স্কুল-কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে শেখেন না। শেখেন পারিবারিকভাবে, ঘরে বসে। যেসব কলা-কৌশল তারা ব্যবহার করেন, তা হলো বহুদিনের পুরানো। লোক-শিল্প এবং লোক-শিল্পীদের মধ্যে কাজ করে চলে বিশেষ ধরনের রক্ষনশীলতা। তাঁরা নতুন কোন গড়ন, আকার আকৃতি বা করণ কৌশলকে সহজে গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা অনেক বেশী অতীত নির্ভর। লোক-শিল্পে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় থাকেনা। থাকতে পারে এবং থাকে অঞ্চল বিশেষের ছাপ। যা হলো কোন একটা অঞ্চলের মানুষের সমবেত শিল্প চর্চারই ফল।

www.pathagar.com

রাজশাহী অঞ্চলের শখের হাঁড়ি বিশেষভাবে খ্যাত। এসব হাঁড়ির আছে বিশেষ গড়ন। এসব হাঁড়ির গায়ে সাধারণত দেওয়া হয় হলুদ রঙ। তার উপর, সবুজ, গাঢ়-নীল, লাল, কাল রং দিয়ে করা হয় ফুল, লতা-পাতা, জীবজন্তু ও জ্যামিতিক আকার আকৃতির সাহায্যে বৈশিষ্ট্যময় নকসা।

রাজশাহী অঞ্চলে সোলা দিয়ে অনেক রকম খেলনা বানানো হয়। সোলা গাছ (Aeschynomene aspera) জলা জায়গায় হয়। এর কাঠ খুব নরম এবং ফাঁপালো (Spongy Xylem)। এ দিয়ে তৈরী করা হয় অনেক রকম খেলনা। যার মধ্যে কুমীর বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য। এসব খেলনার গায়ে বিভিন্ন প্রকার বর্ণ প্রয়োগ করা হয়। সোলার খেলনা বেশীদিন টেকেনা। কিন্তু শিশুদের কাছে তা খুব প্রিয়। এছাড়া সোলা দিয়ে বানানো হয় হিন্দু বিবাহের টোপর আর মুসলমান বিবাহের শেহেরা (যা দিয়ে ঢাকা হয় কন্যার মুখ)। সোলা কেটে বানান হয় নকল কদম ফুল, যা দিয়ে পূজা পার্বণে এবং উৎসবে সাজান হয় গৃহ। যারা সোলা দিয়ে এসব বস্তু গড়েন, তাদের বলা হয় মালাকার। মালাকাররা সবাই হলেন তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। এটা তাদের কৌলিক পেশা। অর্থাৎ বংশপরম্পরায় তারা এই কাজ করে চলেছেন।

কাঠের পুতুল বানান ছুতার মিস্ত্রিরা। তবে সব ছুতার মিস্ত্রি নন। এটাও হলো এক রকম কৌলিক পেশা। কাঠের পুতুলের গড়ন হয় খুবই সরল। এতেও প্রয়োগ করা হয় রং। কাঠের পুতুল সাধারণত হলো মেয়ে। কাঠের পুতুল সাধারণত ছেলে হয় না। কাঠের পুতুল বানাবার জন্য ব্যবহার করা হয় অপেক্ষাকৃত নরম কাঠ; যেমন, কদম ও শিরীষ। তবে কাঠের পুতুল এখন মেলাতে আর আগের মতো দেখা যায় না।

রাজশাহীর বিভিন্ন মেলাতে এখন মাটির পুতুল যথেষ্ট বিক্রি হয়। এসব পুতুল হলো প্রধানত সন্তান কোলে জননী অথবা কলসি কাঁখে জলকে চলা রমণীর। গাঢ় লাল, হলুদ, কাল, কমলা, নীল এবং সবুজ রং প্রয়োগ করা হয় পুতুলগুলিতে। পুতুলের চোখ ও ভ্রু আঁকা হয় তুলি দিয়ে।

বাঁশ ও বেতের কাজও রাজশাহীতে কিছু কিছু করা হয়। বেত আনা হয় বাইরে থেকে। রাজশাহীর বেত ভাল নয়। আর তা এখন পাওয়াও যায় কম। কাঁসা-পিতলের কাজ আগে রাজশাহী শহরে হঁতো না। এখন চাঁপাই-নবাবগঞ্জ থেকে কিছু কারিগর এসে এই শিল্প চালু করেছেন রাজশাহী শহরে। এর সবটুকু অবশ্য লোক শিল্প নয়। এর অনেক কিছুতে থাকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম কারুকাজ। বিলাসী মনের পরিচয়। এদের দামও হলো অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে হয় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কাঁসা তৈরী করা হয় তামা এবং টিন (রাং) মিশিয়ে। আর পিতল তৈরী করা হয় তামা এবং দস্তা মিশিয়ে। এরা হলো, যাকে বলে মিশ্র ধাতু। মুসলমানরা অনেকে তামার বাসন বিশেষভাবে পছন্দ করেন। তাঁরা রাং-কলাই করা তামার তৈজস ব্যবহার করে থাকেন। হিন্দুরা যা সাধারণত করেননা। তবে পূজার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে হিন্দুরাও কাঁসা-পিতলের মত মিশ্রধাতুকে শুদ্ধ বলে বিবেচনা করেননা। এই অঞ্চলে একসময় হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে কাঁসার থালা ও গ্লাস খুবই প্রচলিত ছিল। এখন তার স্থান দখল করছে এ্যালুমিনিয়াম এবং মরিচা ধরে না এমন লোহা বাসন, যা আসছে বাইরে থেকে। এ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র রাজশাহীতে কিছু তৈরী করা হয় ।

রাজশাহীতে এখন ছাঁচে ফেলে কৃষ্ণ নগরের মাটির পুতুলের ধরনে কিছু কিছু মাটির পুতুল তৈরী করা হচ্ছে। এদের ঠিক লোক-শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়না। এরা একেবারেই ছাঁচের ব্যাপার। আর এসব ছাঁচ রাজশাহীতে তৈরী নয়, বাইরে থেকে আনা। এসব পুতুল হলো খুবই বাস্তবধর্মী (Realistic), প্রতীকধর্মী (Symbolic) নয়।

সাধারণভাবে আমরা যাদের লোক-শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করি, তাদের ক্ষেত্রেও এখন অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে লোক-শিল্পীরা তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনীয় রং নিজেরাই তৈরী করে নিতেন, বাজার থেকে ক্রয় করতেন না। যেমন, গাঢ় আলতা রং বানাতেন লাক্ষা থেকে ; সবুজ রং বানাতেন তামার কুচির সঙ্গে লেবুর রসের বিক্রিয়া ঘটিয়ে ; গাব থেকে বানাতেন গাঢ় কাল রং। আগে লোক-শিল্পীরা নিজেদের তুলি নিজেরাই বানিয়ে নিতেন ছাগলের লেজের রোম থেকে। কিন্তু এখন তাঁরা বাজারে তৈরী তুলি ব্যবহার করছেন। লোক-শিল্পের কারিগরি দক্ষতাও অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করা চলে। লোক-শিল্পের রেখা রচনায় আর আগের সেই বলিষ্ঠতা এখন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। নকসাতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে একটা বিশৃঙ্খলভাব। আগের সেই সুসমতা যেন আর বজায় থাকছে না।

এককালে আমাদের দেশে শহর ছিল খুব কম। শহর ঘিরে গড়ে উঠেছিল, যাকে বলে, দরবারী শিল্প। রাজা-বাদশাহ্, আমীর-ওমরাহের ব্যাপার। যার মধ্যে থাকতে দেখা যায় একটা বিলাসী মনের প্রকাশ। পক্ষান্তরে গ্রামকে নির্ভর করে কৃষিজীবী মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল লোক-শিল্প। যা হলো অনেক নিরাভরণ। যার মধ্যে থাকতে দেখা যায় একটা গড়নগত সারল্য। কিন্তু গ্রাম ও শহরের মধ্যে আগের সেই বিভেদ এখন ক্রমশ কমে আসতে চাচ্ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এবং রেডিও, টেলিভিশনের কল্যাণে। গ্রাম ও শহরের জীবনরীতি (Life Style) হয়ে উঠতে চাচ্ছে প্রায় একই রকম।

অনেক কিছুর প্রয়োজন এখন আর থাকছে না। এক সময় যা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়, এখন তা হয়ে উঠছে অপ্রয়োজনীয়। এক সময় ঢেঁকি ছাড়া গ্রামের জীবন চলতো না। এখন অনেক ধান-কল হয়েছে। ঢেঁকি এখন বিলুপ্তির পথে। এক সময় এদেশের কৃষকরা কেবলই ব্যবহার করতেন কাঠের লাঙ্গল। কিন্তু এখন ব্যবহৃত হচ্ছে পাওয়ার টিলার। যে সনাতন কৃষি অর্থনীতির মধ্যে লোক-শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল, সেই অর্থনীতিতে ঘটে চলছে নানা পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন লোক-শিল্পের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা কঠিন। আর বহু ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজনও থাকছে না। তবে আমাদের দেশের লোক-শিল্পের কিছু কিছু জিনিস বিদেশী ট্যুরিস্টদের কৌতূহল জাগায়। যেমন জাগায় পশ্চিম আফ্রিকার

www.pathagar.com

নিগ্রোদের তৈরী কাঠের মুখোশ। এ হিসাবে এসব জিনিসের বাজার কিছুটা থাকছে। আর তার সুযোগ নিতে হবে।

শিল্পী যামিনী রায় লোক-শিল্পের আকার আকৃতির ধরণ অনুসরণ করে ছবি এঁকে খ্যাতি পেয়েছেন। আমাদের দেশে শিল্পী জয়নুল আবেদীন এবং কামরুল হাসানও এক পর্যায়ে মনে করেছেন, লোক-শিল্পের আঙ্গিকে ছবি আঁকলে তা হবে খুবই উন্নতমানের শিল্পকর্ম। আর এর মধ্যে ধরা পড়বে আমাদের বহুযুগের ঐতিহ্যের ছাপ। ফুটে উঠবে আমাদের জাতি-মনের (National Soul) পরিচয়। কিন্তু এঁরা লোক-শিল্পের পক্ষে যে জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন, তা সফল হয়নি। কারণ আজকের দিনে শিল্পীরা কেবল ঐতিহ্য পূজারী হতে চান না। তারা চান নতুন কিছু করতে। জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষার নামে একঘেয়েমীকে তাঁরা পারেননা মেনে নিতে।

বর্তমানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মিজানুর রহমান বরেন্দ্র জাদুঘরকে কিছু অনুদান প্রদান করেছেন। রাজশাহী শহরের জন্য দুটি কক্ষ এখন এই জাদুঘরে আলাদা করে সাজানো হচ্ছে। যেখানে থাকতে যাচ্ছে রাজশাহী শহরের পুরানো স্মৃতিবাহী কিছু জিনিসপত্র। সেই সঙ্গে এর মধ্যে থাকছে এই অঞ্চলের পুরাতন লোক-শিল্পেরও কিছু নমুনা। যা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে অতীত লোক-শিল্পের একটা সাধারণ ধারণা । তবে আমরা যত চেষ্টাই করি, অতীতের সব কিছু ধরে রাখা সম্ভব হয় না। কোন দেশেই হয়নি। কারণ, এক যুগের ঐশ্বর্য পরিণত হতে চায় আর এক যুগের আবর্জনায়।

www.pathagar.com

একবিংশ পরিচ্ছেদ
গাছপালা ও জীবজন্তু

গাছপালার উপর প্রাণীকুল বিশেষভাবে নির্ভর করে। ঠিক সরকারীভাবে বনভূমি (Forest) বলতে যা বোঝায় রাজশাহী জেলায় তা ছিল না। পাকিস্তান হবার ফলে পশ্চিম দিনাজপুর থেকে পত্নিতলা এবং সাপাহার এসে যুক্ত হয় নওগাঁর সঙ্গে। এই দুই অঞ্চলে সামান্য কিছু সরকার স্বীকৃত বনভূমি (Forest) ছিল। রাজশাহী অঞ্চলে বনভূমি না থাকলেও ঝোপ-জঙ্গলের অভাব ছিল না। শহরের মধ্যে ছিল আমবাগান। ছিল বাঁশ ঝাড়। ছিল ঘন বেতের বন। আসস্যাওড়ার (Glycosmis pentaphylla) ঘন ঝোপ। ছিল বঁইচি ফলের (Flacourtia sepiaria) গাছের কাঁটা-বন। শহরের কাছেই ছিল, সিরোইলের জঙ্গল। বড় গাছের বন না হলেও এই জঙ্গল ছিল উল্লেখযোগ্য। এই জঙ্গলে থাকতো মানুষখেকো চিতা বাঘ (Panthera pardus)। আর ছিল অজগর সাপ (Python molurus), যা এক একটি ৩২ থেকে ৩৩ ফিট লম্বা হতো। এসব সাপ হাঁ করে গিলে খেতে পারত পাখি এবং খরগোশের মত জন্তু। কবিরাজদের কাছে এই সাপের বেশ মূল্য ছিল। এর চর্বি থেকে তাঁরা বানাতেন বাত-বেদনার ঔষধ। শহর এলাকায় যে কেবল চিতাবাঘ ছিল, তাই নয়, অনেক সময় সাধারণ ডোরা কাটা বাঘও (Pantera tigirs) দেখা যেত। সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়, এ বিষয়ে তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, সে সময়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, রাজশাহী কোর্ট থেকে ভিতর শহরে আসবার পথে অনেক সময় রাতে বাঘের হাতে পড়তে হতো। তিনি রাজশাহী কোর্টে সে সময় করণিকের চাকরী করতেন। একদিন রাত দশটায় বাড়ি ফিরবার পথে বাঘের দেখা পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় ঃ "সেসনের কার্য্য আরম্ভ হইলে কোন কোন দিন, রাত্রি দশটার পূর্ব্বে আমরা নিস্কৃতি পাইতাম না। আমার বেশ স্মরণে আছে--একদিন রাত্রি দশটার সময় জজসাহেব তাঁহার টমটমে উঠিয়া কুঠিতে প্রস্থান করিলে আমরা কোর্ট হইতে বাহির হইলাম।..... এক টমটমের সম্মুখ দিকে হুড কম্‌পেয়ারিং ক্লার্ক মহিনী রায় এবং মহাপেস (রেকর্ড কিপার) গদাধর রায়, পশ্চাতে আমি ও পেস্কার অবিনাশ রায়। গাড়ী-বারান্দার বাহিরে টমটমে উঠিবার সময় অবিনাশ রহস্য করিয়া বলিলেন, 'আমরা চার 'রায়' এক টমটমে চড়িলাম– পথে কি ঘটিবে---কে জানে।' যাহা ইউক, মাইল খানেক নির্ব্বিঘ্নে চলিলাম। তারপর হঠাৎ টমটমের ঘোড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। সারথি ক্রমাগত 'দাভা' দিয়া তাহাকে পিটিতে লাগিল, কিন্তু সে নিশ্চল। ---হঠাৎ একটা বোঁট্‌কা গন্ধ পাইলাম। তাহার পর আর কি! 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' মহাশয় পথের উত্তর ধারের নয়ঞ্জুলি হইতে ধীরে ধীরে পথে উঠিয়া থাবা গাড়িয়া বসিলেন, এবং টমটমের দিকে চাহিয়া এরূপ এক শব্দ করিলেন, যেন ভূমিকম্প হইল ! সেই জ্যোৎস্নালোকেও তাহার চক্ষু দুটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বল জ্বল করিতেছিল। তাহার পর আর কি? তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ও গর্জ্জন শুনিয়া টমটমের অশ্বিনী কুমার একটা হ্যাঁচকা টান দিয়া টমটমসহ পথের অন্য দিকের নয়ঞ্জুলি দাখিল। মোহনী রায় ও গদাধর রায়--দুজনের ওজন সাত মন সাড়ে সাঁইত্রিশ সেরের কম নয়, ডিগবাজি খেলিয়া হেঁটমুন্ডে উর্ধ্বপদে এলাহিবক্স কোচম্যানের ঘাড়ের উপর পড়িলেন

www.pathagar.com

এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া একদম ঘোড়ার পিঠে, তাহার পর সেখান হইতে গড়াইয়া নয়গুলির মধ্যস্থিত কন্টকেয়ারীর কন্টক-শয্যায় সগুরু দেহভার প্রসারিত করিলেন। আমি ও অবিনাশ পশ্চাতের আসন হইতে গড়াইয়া পড়িয়া চাকায় বাধা পাইলাম। ভাগ্যে ঘোড়াটা তখন টমটম ঘাড়ে লইয়া লাফালাফি করে নাই ! আমাদের অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যাঘ্র মহাশয় বোধ হয় আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়াই কৃপা করিয়া আমাদের অঙ্গ-লেহনের প্রবৃত্তি সংবরণ করিলেন; তিনি এক লাফে জেলা বোর্ডের প্রশস্ত পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের আট দশ হাত পূর্ব্বে আসিয়া নয়গুলিতে নামিলেন এবং আর এক লাফে পথের দক্ষিণ দিকের ক্ষেতে উঠিয়া মাঠ ভাঙ্গিয়া পদ্মার তীরের দিকে ধাবিত হইলেন।

বাঘ অদৃশ্য হইলে আমরা কন্টক-শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক। মনে হইল, বুকের ভিতর ঢেঁকি পড়িতেছে ! কারণ, রাজশাহীর বাঘ আমাদের পল্লী অঞ্চলের, 'কেঁদো' বা 'গো-বাঘা,' নহে ; ইহারা 'রাজকীয় বঙ্গীয়ে'র মাসতুতো ভাই ! ইহাদেরই স্বশ্রেণীর একটি নরভুক কিছু দিন পূর্ব্বে আড়ানীতে শতাধিক নরনারীকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিদান করিয়া ছিল ; অবশেষে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট প্রাইজ সাহেব বহু চেষ্টায় তাহাকে বধ করেন।....."

এ হলো সেকালের রাজশাহীতে বাঘের সম্পর্কে একজন সাহিত্যিকের বর্ণনা। যা তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই দিতে পেরেছেন।

রাজশাহী ডিসট্রিক গেজেটিয়ায়ে ওম্যানলি বলেছেন, রাজশাহী হলো ভয়ঙ্কর রকম সর্পপূর্ণ অঞ্চল। গোখুরা সাপ (Naja naja) রাজশাহীতে ছিল খুব বেশি। এই সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়াত সাপুড়েরা। এছাড়া ছিল দাঁড়াশ (Ptyas mucosus), কেউটে (Bangarus caeruleus) এবং চন্দ্র বোড়া সাপ (Vipera russelli)। সাপের কামড়ে বছরে অনেক লোক মারা যেত। মানুষ মশারীর মধ্যে শুয়েছে কেবল মশার কামড় এড়াবার জন্যে নয়, সাপের হাত থেকে রক্ষা পাবারও জন্যে। এ সময় খাট খুব উঁচু করে বানান হতো, যাতে সাপ উঠে রাতে সহজে কামড়াতে না পারে।

পদ্মা নদীতে কুমির দেখা যেত। দু'রকম কুমির ছিল। এক রকম কুমির (Crocodilus palustris) নদীর ধারে ছাগল বা অন্য জন্তু পেলে ধরে খেত। মানুষকেও সুযোগ পেলে খেত। আর এক রকম কুমির ছিল যাদের মুখ ছিল অপেক্ষাকৃত সরু এবং লম্বা। এরা কেবল মাছ ধরে খেত। এদের বলা হত ঘড়িয়াল (Gavialis gangeticus)। ঘড়িয়াল ও কুমির এই অঞ্চলে প্রায় বিলুপ্তির পথে। রাজশাহীর কাছে পদ্মায় বহুদিন হলো আর কুমির দেখা যায়নি। একটি ঘড়িয়াল আছে রাজশাহী চিড়িয়াখানায়।

রাজশাহীর বরিন্দা এবং চর অঞ্চলে একসময় বুনো মহিষ ছিল (Bubalus bubalis)। কিন্তু এখন বুনো মহিষ বিলুপ্ত হয়েছে। কেবল আছে গৃহপালিত মহিষ।

www.pathagar.com

চিল ও শকুন এখন প্রায় আর দেখাই যায় না। কিন্তু আগে এরা ছিল খুবই সাধারণ পাখি। দুরকম চিল দেখা যেত। ভুবন চিল (Milvus migrans) এবং শঙ্খ চিল (Haliastur indus)। ভুবন চিল শহরে বেশি দেখা যেত। শঙ্খ চিল বেশী দেখা যেত আশেপাশের গ্রামে। রাজশাহীর সাহেব বাজারের কাছে বড় বড় গাছে অনেক ভুবন চিল থাকতো , যারা বাজার করে ফেরা মানুষের হাত থেকে মাছ নিয়ে যেতে ছোঁ মেরে। শকুন ছিল দু'রকম। সাধারণ শকুন (Gyps bengalensis) এবং রাজ শকুন (Torgos calvus)। নদীর ধারে বড় বড় গাছে এরা থাকতো। এদের মাথা হতো লাল।

শীতকালে অনেক অনাবাসিক পাখী আসত, যা শিকারীরা শিকার করতেন, জালে ধরতেন। যেমন, বুনো মরাল (Anser anser), চখা-চখি (Tandorna ferruginea), বুনো পাতি হাঁস (Anas platyrhynchos), মুরগাবি (Anser crecca)। বর্তমানে শীতের পাখি কম আসবার একটা কারণ হলো, শীতকালে এখন বিলের পানি নালা কেটে বের করে দিয়ে সেখানে আবাদ করা হচ্ছে। এসব পাখি আসত তিব্বত, চীনের মূল ভুখন্ড এবং সাইবেরিয়া থেকে। সাধারণভাবে আমাদের দেশে পাখির সংখ্যা আগের তুলনায় কমে গিয়েছে। এই কমে যাবার একটা কারণ হলো, অনেক পাখি বড় গাছে বাসা বেঁধে সেখানে ডিম পাড়ে। বহু বড় গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এছাড়া শিকার করবার ফলে অনেক পাখির সংখ্যা হ্রাস ঘটেছে। যেমন ঘুঘু (Streptopelia resoria) এবং কবুতর (Columba livia) সংখ্যায় আর আগের মতো নয়। ইংরাজ আমলে যত লোকের হাতে বন্দুক ছিল, এখন আছে তার চাইতে অনেক বেশি লোকের হাতে। রাজশাহীতে পাখি শিকারির অভাব নেই।

অনেকে বলছেন গাছপালা কেটে ফেলবার ফলে এই অঞ্চলের আবহাওয়া আগের তুলনায় শুষ্ক হয়ে উঠছে। গাছপালা, বনভূমি একটা অঞ্চলের আবহাওয়াকে কিছুটা ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু একটা অঞ্চলের আবহাওয়া বিশেষভাবে নির্ভর করে, তার অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র থেকে ঐ অঞ্চলের দূরত্ব, সমুদ্র স্রোত, বায়ু প্রবাহ এবং ভূমি কোন দিকে উঁচু তার উপর। গাছপালা নির্বিচারে অবশ্যই কাটা উচিত নয়। বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কিন্তু গাছপালা কমে গেলে একটা অঞ্চলের জলবায়ু যে মৌলিক ভাবেই বদলে যায়, তা নয়। একটা অঞ্চলের জলবায়ুর উপর গাছপালার প্রভাবের কথা এখন অনেকে খুব বাড়িয়ে প্রচার করছেন। বলছেন, গাছপালা কেটে ফেলবার ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল ক্রমশ মরুময় হতে চলেছে। কিন্তু এই ধারণা যথেষ্ট যুক্তিসিদ্ধ নয়।

অনেকে ভাবেন, গাছপালা লাগালেই পরিবেশ উন্নত হয়। অর্থাৎ, তা মনুষ্য বাসের অধিক উপযোগী হয়ে উঠে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। গাছপালা মাটি থেকে প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করে, তার পরিমাণ কম নয়। এই পানির একটা বড় অংশই গাছপালা পরিত্যাগ করে জলীয় বাষ্প হিসাবে, যাকে বলে প্রস্বেদন (Transpiration)। বিলাতের একটি পরীক্ষা থেকে দেখা যায়, ১৫০০ একর জমিতে ফার জাতীয় গাছ লাগাবার ফলে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ গ্যালন পানি এভাবে মাটি থেকে চলে যেতে পারে। যা একটি শহরের

www.pathagar.com

পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাতে সক্ষম। বনভূমির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু যত্রতত্র বনভূমি গড়তে গেলে অনেক সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন পানীয় পানির সমস্যা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, যুগে যুগে মানুষ বন কেটে পরিষ্কার করে জনপদ গড়েছে। উত্তরবঙ্গে জনপদ গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট আগে। তাই এখানে বনভূমির পরিমাণ এত কম। র‍্যালফ্ ফিচ (১৫৮৩-১৫৯১), ফনসেকা (১৫৯৯) প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্যটকদের বর্ণনা থেকে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের অনেক অংশই এক সময় ছিল শ্বাপদসংকুল বনভূমি। ১৪৬৬ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কৃত্তিবাস তাঁর রচিত রামায়ণে নিজের জীবন কথা কিছুটা বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি এবং তাঁর ভ্রাতগণ ছোটগঙ্গা (ভাগীরথী) এবং বড়গঙ্গা (পদ্মা) বলিন্দা (বারেন্দ্রী) অঞ্চল পেরিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন বিদ্যা উদ্ধার করবার জন্যে ঃ "ছোট গঙ্গা বড়গঙ্গা বড় বালিন্দা (বারেন্দ্রী) পার, যথা তথা কর্য্যা বেড়ায় বিদ্যা উদ্ধার।" বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তখন ছিল বর্ধিষ্ণু জনপদ এবং শিক্ষিত লোকের বাস।

এখন অনেক জায়গায় গাছ লাগিয়ে বন গড়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে। রাজশাহীতে পদ্মার তীরে কিছু জায়গায় শিশু গাছ (Dalbergia sissoo) লাগিয়ে একটা ছোট বনভূমি গড়ে তোলা হয়েছে। শিশু গাছের কাঠ ভাল। এছাড়া গাছটা বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি। অনেক স্থলে রাস্তার দুধারে ঘন করে লাগানো হয়েছে বাবলা গাছ (Acacia arabica)। আগে নাটোর রোডের দুধার দিয়ে অনেক বড় বড় গাছ ছিল। যেমন, বট (Ficus bengalensis) অশ্বত্থ (F. religiosa) পাকুড় (F. infectoria) এবং শিরীষ (Albizzia lebbek)। কিন্তু এসব গাছ এখন কেটে ফেলা হয়েছে। বট, অশ্বত্থ, পাকুড়-এরা হলো ছায়া বৃক্ষ। ছায়া দানের জন্যে পথের ধারে, হাটে, গ্রামে গঞ্জে একসময় এদের যথেষ্ট লাগান হতো। সুলতানী এবং বাদশাহী আমলে পথের দুধারে ছায়াবৃক্ষ রোপণ করা হতো, মানুষ যাতে ছায়ায় ছায়ায় পথ চলতে পারে এবং যুদ্ধের সময় ছায়ায় ছায়ায় সৈন্যদের নিয়ে চলা হয় সহজ। তবে প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে শহরের ধারে কাছের বনভূমি কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হতো। কারণ, বনভূমিতে কেবল যে ভয়ঙ্কর বন্য জন্তুরা বাস করতো তাই নয়, শহরের কাছে বনভূমিতে চোর-ডাকাতরা আস্তানা গেড়ে নগরবাসীর জীবনকে অশান্ত করে তুলত। বন মানেই তপোবন ছিল না। অতীতে অরণ্যে মুনি ঋষিদের চাইতে দস্যু-তস্করই বাস করেছে বেশি। আগে বর্ষার পর যখন রাজশাহীর কাছে পদ্মায় চর জাগত, তখন সেই চরে হতো অনেক ঝাউ গাছ (Tamarix) । আমরা এই ঝাউ বনের মধ্যে দিয়ে অনেক বেড়িয়েছি। পদ্মার চরে একরকম ঝাউ গাছ এখন আর গজাতে দেখা যায় না। এটা আমার কাছে একটা লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন বলেই মনে হয়।

www.pathagar.com

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
যুদ্ধ-বিগ্রহ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ যুদ্ধ করে আসছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ প্রাচীন যুগে অনেক হয়েছে । প্রাচীন কালে প্রত্যেক রাজার থেকেছে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী বিহীন রাজার অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, সফল সেনাপতিরা একসময় হয়ে উঠেছেন রাজা। রাজার রাজত্ব ছিল দখলিস্বত্বের ব্যাপার। পৃথিবীটা চলছে জোর যার মুল্লুক তার নীতির উপর ভিত্তি করে। প্রাচীন যুগে এ দেশের রাজাদের সেনাবাহিনী গঠিত হতো পদাতিক, অশ্বারোহী, গজ এবং রথ সহযোগে। এরকম সেনাবাহিনীকে বলা হতো চতুরাঙ্গ। চতুরাঙ্গের প্রত্যেক অঙ্গের জন্যে থাকতেন একজন করে স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ বা সেনাপতি। এছাড়া বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসে 'কোট পাল' এবং 'প্রান্ত পাল' প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। কোট পাল বলতে বোঝাতো দুর্গ রক্ষক। প্রান্ত পাল বলতে বোঝাতো সীমান্ত রক্ষক। বাংলাদেশের রণতরী প্রসিদ্ধ ছিল। সব প্রাচীন রাজারই নৌবহর ছিল। যা প্রধানত নদী পথে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশের বনহস্তী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এদের পোষ মানিয়ে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হতো। সুলতানী আমলে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হতেন সুলতান স্বয়ং। বিভিন্ন সময়ে যেসব বাহিনী প্রেরিত হতো, তাদের অধিনায়কদের প্রত্যেককে বলা হতো 'সর-ই-লস্কর'। মধ্য যুগে সৈন্যবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী এবং নৌবহর। বাংলার পদাতিক সৈন্যের বিশিষ্ট নাম ছিল 'পাইক'। এরা সাধারণত স্থানীয় লোক হতো। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সৈন্যরা প্রধানত তীর-ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করতো। এছাড়া তারা তরবারি, বর্শা, বল্লম, শূল প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করতো। শর এবং শূল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে 'অরাদা' এবং 'মঞ্জালিক'। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার সৈন্যরা কামান চালনা করতে শেখে এবং ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই কামান চালনায় দক্ষতার জন্যে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে। মধ্য যুগে, সুলতানী আমলে, বাংলার সেনাবাহিনীতে দশজন করে অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এক একটি করে দল গঠিত হতো। তাদের নায়কের উপাধি ছিল 'সর-ই-খেল'। প্রত্যেক সিপাহ্-সলারের অধীনে দশজন করে 'সর-ই-খেল' থাকতো। প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ্-সলার থাকতেন। প্রত্যেক মালিক-এর অধীনে থাকতেন দশজনকরে আমীর। প্রত্যেক খান-এর অধীনে থাকতেন দশজন করে মালিক। বাংলার নৌবহরের অধিনায়ককে বলা হতো 'মীর-বহর'। বাংলার সৈন্যবাহিনীর শক্তি জোগাতো রণহস্তী। সে সময় বাংলার হস্তীর মত এত ভাল হস্তী এই উপমহাদেশের আর কোথাও পাওয়া যেতনা। সুলতানের সেনাবাহিনীর লোকেরা নিয়মিত বেতন পেত। সৈন্যবাহিনীর বেতন দাতার উপাধী ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।

মুঘলদের সেনা সংগঠন ছিল বেশ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। মানসিংহ বাংলায় যুদ্ধ করতে এসে নৌবাহিনীর প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন। মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁর সময়ের যুদ্ধের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমে নদীপথে যুদ্ধ করবার জন্যে নৌবহর তাদের

www.pathagar.com

ছিল না। নৌবহর নদী পথে রণহস্তী পারাপার করতো। নদীপথে বাণিজ্যের উপর শুল্ক আদায় করতো। পরে পূর্ব বাংলায় মুঘল রাজত্বে ঢাকায় ৭৬৮টি নৌকার বহর রাখা হয়, আরাকানী জলদস্যু ও পর্তুগীজদের উপদ্রব দমন করবার জন্যে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলায় বারো ভুঁইয়া বিদ্রোহ করে। বাংলায় বারো ভুঁইয়া কথাটির অর্থ হলো, বারো জন সামন্তরাজা। কিন্তু কার্যত ঃ এই ভুঁইয়ার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তাঁরা সুযোগ পেলেই স্বাধীন রাজা হবার চেষ্টা করতেন।

রাজশাহীর সীমানার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের খবর এখনও ইতিহাসে খুব পাওয়া যায় না। মালদহ থেকে দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে জাহাঙ্গীরের সময় সুবেদার ইসলাম খাঁ পদ্মার তীরে অবস্থিত রাজশাহী জেলার আলাইপুরে পৌঁছে (১৬০৯ খ্রি:) প্রথম ঘাঁটি গড়েন। পুঠিয়ার জমিদার পীতাম্বর, ভাতুরিয়া রাজ-পরগণার অন্তর্গত চিলাজয়ার জমিদার অনন্ত এবং আলাইপুরের জমিদার ইলাহ্ বখ্শ্ ইসলাম খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। আলাইপুর অবস্থানকালে ইসলাম খাঁ ভুষণার রাজা সত্রাজিতকে যুদ্ধে পরাস্থ করেন এবং মুঘলের প্রতি বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ইসলাম খাঁ আলাইপুর থেকে পূর্ববঙ্গে মুসা খাঁ-কে পরাস্থ করবার জন্যে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইসলাম খাঁ পূর্ব বঙ্গে যুদ্ধ যাত্রার আগে মীর-বহর ইব্রাহীম খাঁর কছে থেকে এক বিরাট নৌবহর যোগাড় করেন।

আলাইপুর একারণে মুঘল বাংলার যুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ইসলাম খাঁ মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্তন করেন। তিনি উন্নতমানের সমর কৌশল ও প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। নবাবী আমলে রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে নবাবগঞ্জের কাছে মনিহারী গ্রামে শওকত জঙ্গের যুদ্ধ হয়। শওকত জঙ্গ এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। শওকত জঙ্গ সিরাজকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব হতে চেয়েছিলেন। শওকত জঙ্গ ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার চাচাতো এবং খালাত ভাই। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা। তিনি দিল্লীর বাদশাহের উজিরকে এক কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে সুবেদারী ফরমান এবং সিরাজকে বিতাড়িত করবার জন্য বাদশাহের অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। সিরাজ এই যুদ্ধে উন্নতমানের রণ কৌশল দেখাতে পেরেছিলেন। শওকত জঙ্গকে ঘিরে ফেলতে পেরেছিলেন তিনি।

ইংরেজ আমলে রাজশাহী অঞ্চলে কোন যুদ্ধ হয়নি। দু এক সময় কলকাতা থেকে সৈন্য এসেছে। নকল যুদ্ধের মহড়া দেখিয়েছে। পাকিস্তান আমলে রাজশাহীবাসী প্রকৃত যুদ্ধের সামান্য কিছুটা রূপ দেখতে পায়, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে । রাজশাহীতে সেসময় একটা ছোট ক্যান্টনমেন্ট ছিল। সেখানে ২৫-পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য (প্রায় ৫০০) ছিল। ২৫শে এবং ২৬শে মার্চ রাজশাহী শহর খুব অশান্ত ছিল। ২৭শে মার্চ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য

www.pathagar.com

ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে রাজশাহী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। পুলিশরা যুদ্ধ করে। কিন্তু তাদের অস্ত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের উপযুক্ত ছিল না। ১৮ জন পুলিশ যুদ্ধে মারা যান। রাজশাহীর তৎকালীন পুলিশ সুপার মামুন মাহমুদ পুলিশদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। পাক বাহিনী তাকে ধরে ফেলতে পারে ও হত্যা করে। বাদবাকীরা পুলিশ লাইন থেকে চলে যেতে সক্ষম হন। ২৭শে মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জে ইপিআর (ইস্ট পাকিস্থান রাইফেলস = আধা সামরিক বাহিনী) বিদ্রোহ করে এবং ইপিআর-এর অবাঙ্গালী অফিসারদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। ২৮শে মার্চ রাজশাহীতে ইপিআর-এর বাঙ্গালী সদস্যরা বিদ্রোহ করে। রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং নওঁগা-র ইপিআর-এর বাঙ্গালী সৈন্যদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজশাহীতে ইপিআর ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে রাখে। পাঞ্জাবী ফৌজ এসময় ক্যান্টনমেন্ট থেকে আর বাইরে আসতে পারে না। ২৮শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল রাজশাহী শহর ছিল পাকসেনার নিয়ন্ত্রণমুক্ত। ১৬ই এপ্রিল ঢাকা থেকে আগত পাক-ফৌজ রাজশাহী শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় রাজশাহীর একদল ইপিআর পদ্মার চর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে নদী পেরিয়ে ভারতে চলে যায়। এর আগে ২৯শে মার্চ বিদ্রোহী ইপিআর-এর সঙ্গে গোপালপুরে পাক-ফৌজের যুদ্ধ হয়। এই ফৌজ পাবনা থেকে ফিরছিল রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে। এরা রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে থেকেই গিয়েছিল পাবনায়। ইপিআর-এর সঙ্গে যুদ্ধে ৪০জন পাকসেনা নিহত হয়। পরে আবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এক কোম্পানী পাক সৈন্যের কারো পক্ষেই শেষ পর্যন্ত পাবনা থেকে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। মে মাসের ৫ তারিখে গোপালপুরে নর্থ-বেঙ্গল সুগার মিলের বাঙ্গালী ম্যানেজারসহ ২০০ কর্মচারীকে পাক-সেনারা একসাথে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এধরনের হত্যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা ছিল একটা গণহত্যারই নজির। সম্ভবত পাক-ফৌজ চাচ্ছিল, মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে। ১৯৭১-এর ৩-রা ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ভারতের সৈন্য ৬ই ডিসেম্বর চাঁপাই-নবাবগঞ্জে প্রবেশ করে। পরে এসে পৌঁছায় রাজশাহীতে। চাঁপাই-নবাবগঞ্জে কিছু গোলাগুলি চলেছিল। কিন্তু রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ছিল শান্ত। যুদ্ধের আঁচ লাগেনি এসব অঞ্চলে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল হিলিতে। অনেক ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল সেখানে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধে ভারত সরকার তার সেনা শক্তির যে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রকাশ করে, তা থেকে দেখা যায় ঃ

	পূর্ব- রণাঙ্গন	পশ্চিম- রণাঙ্গন
মৃত	১,০৪৭	১,৪২৬
আহত	৩,০৪২	৩,৬১১
নিখোঁজ	৮৯	২,১৪৯
মোট	৪,১৭৮	৭,১৮৬

ভারতের সৈন্য পশ্চিম-রণাঙ্গনে যত মারা গিয়েছিল , আহত ও নিখোঁজ হয়েছিল

www.pathagar.com

পূর্ব-রণাঙ্গনে তা হয়নি। বিগ্রেডিয়ার আর.এন.মিশ্র (R.N. Mishra), যিনি ভারতীয় বাহিনী নিয়ে প্রথম ঢাকায় প্রবেশ করেন, তিনি সাংবাদিকদের বলেন ঃ স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের সাহায্য করেছে নানাভাবে। শত্রুসৈন্যের অবস্থান সম্বন্ধে তারা আমাদের নিখুঁতভাবে অবগত করেছে। ফলে আমাদের সৈন্য যে হারে মারা পড়তে পারতো, তা পড়েনি। আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা হয়েছে অনেক সহজ। স্থানীয় লোক আমাদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছে নদী পেরুবার জন্যে নৌকা দিয়ে। না হলে নদী পেরিয়ে ঢাকা আসতে আমাদের সময় লাগতো আরো অনেক বেশি। আমরা এত দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে আসতে সক্ষম হতাম না। অন্যদিকে পাকিস্তানের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ্ খান নিয়াজী তার জবানবন্দীতে বলেছেন ঃ "এটা প্রত্যেক সচেতন ও বিবেকবান ব্যক্তিরই জানা ছিল যে, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের মনে বিষ ঢুকিয়ে তাদের অসন্তুষ্ট করে তোলা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অনাগ্রসরতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মনে কতকগুলো ন্যায়সংগত অভিযোগ ছিল। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হৃদয় জয় করার জন্য রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ে জোরালো প্রচেষ্টা চালানোই ছিল আমাদের কর্তব্য। কেননা শুধু সামরিক কার্যক্রম রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে অক্ষম। ..... সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কোন প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। ..... পূর্ব পাকিস্তানে যখন রাজনৈতিক সমাধানের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন জনগণের বিরূপতা ক্রমান্বয়ে চরমে গিয়ে উপনীত হলো। আর এভাবে আমরা নিজেরাই স্বদেশে প্রবাসী হয়ে গেলাম। এর ফলে আমাদেরকে চরম মূল্য প্রদান করতে হলো। বস্তুত পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের পরাজয়কে কার্যত সামরিক পরাজয় বলা চলে না। এটা ছিল আমাদের রাজনৈতিক পরাজয়। এর মূল কারণ ছিল ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অযোগ্যতা ও দেউলিয়াপনা। ....."

আমি যুদ্ধের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানিনা। ১৯৭১-এর যুদ্ধের সর্ম্পকে তাই দুইজন যোদ্ধার উদ্ধৃতি দিলাম। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবেই ছিলেন যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। একজন ভারতীয় এবং অপরজন পাকিস্তানী। আমি জীবনে যুদ্ধের প্রথম গোলাগুলির আওয়াজ শুনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে। আমার বাড়ি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে খুব দূরে অবস্থিত নয়। তাই ঘরে বসে শুনতে পেয়েছিলাম গোলাগুলির আওয়াজ। পাকসেনারা ছিল ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে। চারধারে ছিল ঘন কাটা তারের বেড়া। এর পরে ছিল স্থল মাইনের চক্র। ক্যান্টনমেন্ট দখল করা সহজ ছিল না। ইপিআর-এর কাছে প্রথমে কোন আধুনিক অস্ত্র ছিল না। কিন্তু পরে বেশ কিছু আধুনিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। সে সময় শহরে গুজব ছিল, পদ্মা পেরিয়ে এক রেজিমেন্ট ভারতীয় তামিল সৈন্য এসে যোগ দিয়েছে ইপিআর-এর সঙ্গে। কয়েক মাস পরে জেনে ছিলাম ভারতীয় সৈন্য সীমান্ত এলাকায় সত্যিই ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু তারা সরে যেতে বাধ্য হয়। এর একটা কারণ, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সৈন্য পাঠাবার মত অবস্থা তখনও সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া ভারত সরাসরি পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ঐ সময় সামরিক হস্তক্ষেপ করে চললে ঐ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। ভারত ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল। আমরা

www.pathagar.com

অনেকে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম ভারতে। ভারতের এই আতিথেয়তা আমাদের অনেকের জীবনেই হয়ে আছে স্মরণীয়। কিন্তু এই সময়ের বহু ঘটনার ব্যাখ্যা আমাদের অনেকের কাছেই ছিল, এবং এখনো রয়েছে, অজানা। অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা এখনো সাধারণভাবে পাওয়া সম্ভব হয়নি। যেমন, ভারত, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি স্বতন্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছিল। যার নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল BLF বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স। পরে এর নাম দেওয়া হয় 'মুজিব বাহিনী'। এই বাহিনী চলতো মেজর জেনারেল উবান-এর নেতৃত্বে। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না এই বাহিনীর উপর। এতে বিশেষভাবে বাছাই করে লোক নেওয়া হতো। শেখ ফজলুল হক মনি এই লোক বাছাই করে দিতেন। মেজর জেনারেল ওবান-এর কাছ থেকে নির্দেশ পেত এই বাহিনীর লোকেরা। এই বাহিনীতে প্রধানত ছাত্রদের থেকে লোক নেওয়া হতো। মুজিব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ২৫ হাজারের কাছাকাছি । এদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর কোন সমন্বয় ছিলনা। মুক্তিবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল সম্ভবত ৩৫ হাজার। এর মধ্যে নিয়মিত বাহিনী বলে পরিচিতি অংশের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। আর যে অংশটিকে বলা হতো গণবাহিনী, তার সংখ্যা বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হতো। একটি সূত্র অনুসারে, এদের লোকবল ছিল ৩০ হাজারের কাছাকাছি।

মুজিব বাহিনী নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম) তাঁর "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" বইতে। তাঁর মতে, ভারতের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা RAW (রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইঙ্গ) ছিল এর পরিকল্পক। (আমি যতদূর জানি তখন RAW বলে কিছু ছিল না। ছিল RAD। RAD অর্থ হলো রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্ট।) এরকম গোপন পরিকল্পনা অনুসারে একটা আলাদা বাহিনী সৃষ্টি করবার জন্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সে সময় মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে বুঝছিল না আসলে ভারত সরকার কেন দুটো বাহিনী গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত কি চাচ্ছে। পৃথক করে 'মুজিব বাহিনী' গড়া হচ্ছে কেন! কেউ কেউ বলতেন, এই বাহিনী গঠন করা হচ্ছে, বাংলাদেশে চীনপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভবিষ্যত যুদ্ধ করবার জন্যে। ভারত ভাবছে এরকম যুদ্ধের সম্ভাব্যতার কথা।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল খুবই জটিল। ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি না দিয়েই ৩ রা ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এর ফলে সে সময়কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি ইন্দিরা গান্ধীকে হুশিয়ার করেন এই বলে যে, বাংলাদেশ সরকারকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি না দিয়ে ভারত যদি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়, তবে মার্কিন সপ্তম নৌবহরে করে মার্কিন সৈন্যরা যেয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করবে। সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ (টাস্ক ফোর্স) বঙ্গোপসাগরের পানি সীমানায় প্রবেশ করে ভিয়েতনাম থেকে এসে। এর নেতৃত্বে ছিল পরমাণু শক্তি চালিত অতিকায় মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজ। ১৫ ই ডিসেম্বর মার্কিন সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ চট্টগ্রামের খুব কাছে এগিয়ে আসে। ১৬ ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জেনারেল

www.pathagar.com

নিয়াজী স্বাক্ষর করেন আত্ম-সমপর্ণের দলিল। ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই যুদ্ধ বন্ধ করেছিল একটা বড় শক্তির প্রবল চাপে।

আজকাল বাজারে মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক বই কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বই পড়ে মনে হয়, বহু গুরুত্ববহ ঘটনা সম্বন্ধে এসব বইয়ের লেখকগণ যথাযথভাবে অবহিত নন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নেপথ্যে ঘটেছিল অনেক কিছু। সেটা ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগ। এই সময় সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন চাচ্ছিল চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়ন্ত্রণ পেতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল এর বিরোধী। বাংলাদেশকে নিয়ে চলেছিল ভূমন্ডলীয় রাজনীতির (Geopolitics) বিরাট টানা-পড়েন। বাংলাদেশকে ঘিরে একটা বড় রকমের সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়ে ছিল। যা ইন্দিরা গান্ধী শেষ পর্যন্ত চান এড়িয়ে যেতে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা প্রথমে মনে করেছিল, কোন যুদ্ধ হবেনা। ২৬শে নভেম্বর ঢাকায় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হতে যাচ্ছে না। কারণ, বিশ্ব এটা হতে দিতে পারে না। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছিল। তবে যুদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করতে পারেনি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে। তাই মাত্র ১২ দিনেই বাংলাদেশে পাক-ভারত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতে পেরেছিল। প্রলম্বিত একটা যুদ্ধের রূপ তা নিতে পারেনি।

www.pathagar.com

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দী কাল এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ ছিল পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন ও পরীক্ষা গ্রহণ। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিয়ম ছিল যে, ছাত্রগণ প্রবেশিকা (Entrance, পরে নাম হয় Matriculation) পরীক্ষার পর চার বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করে পাস করলে বি,এ, ডিগ্রি পাবে। কিন্তু বি,এ, পাস করবার পর কোন কলেজে অধ্যয়ন না করে এম, এ, পরীক্ষা দিতে পারবে এবং পাস করলে ডিগ্রি পাবে। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি নতুন আইন পাশ করা হয়। যার ফলে বি,এ পাস করবার পর অন্ততঃ দুই বছর কোন প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন না করলে এবং অন্যথায় তিনবছর অতিবাহিত না হলে, কেউ এম, এ, পরীক্ষা দিতে পারবে না। নতুন আইনের ফলে এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্যসূচী বদলে যায়। এই সূচী অনেক বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু পড়ান হতো না। কিন্তু এখন এম, এ, পড়াবার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় থেকে পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রদান ও গবেষণার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যরূপে পরিগণিত হয়। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ ই জুলাই সরকার ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান পূর্বক এর দোষ ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে কি রকমের শিক্ষা সংস্কার প্রয়োজন, সে জন্যে একটি কমিশন নিযুক্ত করা হবে। ঐ বছর ১৪ই জুলাই এই কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি হন বিলাতের লিডস (Leeds) বিশ্ববিদ্যালয়ের সে সময়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এম, ই, স্যাডলার (Dr. M.E. Sadler)। রাজশাহী সরকারী কলেজ সেসময় ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত একটি নামকরা কলেজ। স্যাডলার কমিশন তার রিপোর্টে বলেন, রাজশাহী সরকারী কলেজকে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করবার চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। রাজশাহী শহরের পরিবেশ একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হবার উপযুক্ত। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ হয়। পূর্ব বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং আসামকে নিয়ে একটা নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়,যার রাজধানী হয় ঢাকা। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই বঙ্গ ভঙ্গ রদ হয়ে যায়। তবে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি মুসলমানদের পক্ষ থেকে খুব জোরাল হতে থাকে। হিন্দুরা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন এই বলে যে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলিম প্রাধান্য। এর ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বঙ্গ প্রদেশ আবার দুই খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কেবল বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুরাই নন, ঢাকার হিন্দুরাও এই একই যুক্তিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

লর্ড হার্ডিং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক হয়, ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (Residential University) হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এর অধীনে কোন কলেজ থাকবেনা। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (Academic Registrar) পি. জি. হার্টগ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। দেশের সমস্ত কলেজ থেকে যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। এ সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল কলেজগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করত না, ম্যাট্রিক পরীক্ষাও নিয়ন্ত্রিত করত। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই অধিকভাবে জড়িত। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার একটা লক্ষ্য হলো ভাষা ব্যবহারে কুশলতা লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলাভাষী ছাত্রদের জন্য বাংলা সাহিত্য আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় রূপে নির্ধারিত করা হয়। এক পর্যায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্কুলে পড়াশুনার অধিকার প্রদান করে। অর্থাৎ স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে বাংলা ভাষা। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন (অর্থাৎ এখনকার মাধ্যমিক) পরীক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে বাংলা ভাষার একটা বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, স্যাডলার কমিশন মন্তব্য করেছিলেন যে, স্কুলে ইংরাজি ভাষায় ছাত্রদের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ ক্ষতিকর। ইংরাজি এবং গণিত ছাড়া আর সব বিষয় পঠন -পাঠন মাতৃভাষায় হওয়া উচিৎ।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান হবার পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) সমস্ত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কিন্তু রাজশাহী কলেজকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি ওঠে স্যাডলার কমিশনের যুক্তি দিয়ে। সাবেক পাকিস্তানে সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় হলো লাহোর। ইংরাজ আমলে তা স্থাপিত হয় ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে । পাকিস্তান হবার সময় সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরপর পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে এবং করাচিতে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে । রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে । নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের যে ঢেউ উঠেছিল তা রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সহায়ক হয়েছিল। সেদিনের পাকিস্তানের বিশেষ জাগরণের প্রেক্ষাপটেই বিচার করে দেখতে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক ইতিহাসকে। যদিও এর একটি ভিত্তি আগে থেকে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান হবার ফলেই রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটা বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কোন কিছু হতে হলে সব ক্ষেত্রেই কাউকে না কাউকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন ডক্টর ইতরাৎ হুসেন জুবেরী। তিনি ছিলেন ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে সুদক্ষ। তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের উর্দুভাষী। একসময় তিনি কলকাতার ইসলামীয়া কলেজ-এর (এখন মৌলানা আবুল কালাম

www.pathagar.com

আজাদ কলেজ) প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এছাড়া জুবেরী সাহেব ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সংগে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আর সেই সুবাদে তাঁর একটা উল্লেখযোগ্য পরিচিতি ছিল মুসলিম লীগের উপর মহলে। রাজশাহী এসে তিনি বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ। প্রধানত তাঁর উদ্যোগের কারণেই রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পথ অনেক সুগম হতে পেরেছিল। মানুষের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ থাকে। জুবেরী সাহেবেরও ছিল। তিনি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর। পাকিস্তান হবার পর উত্তরবঙ্গে এসে বসতি করতে থাকেন ভারত থেকে আগত অনেক উর্দুভাষী রিফিউজি মুসলমান। রাজশাহীতে গড়ে উঠছিল একটা উর্দুভাষী উপশহর। এরাও চাচ্ছিলেন রাজশাহীতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় হোক। ডক্টর জুবেরীর আমলে বেশ কিছু উর্দুভাষী শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছিলেন। যাঁরা সব সময় চলতেন তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। তাঁদের মধ্যে ছিল একটা খানদানী ভাব। এক বিশেষ অহমিকাবোধ।

জুবেরী সাহেব চাকরী করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে অবগত। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুকরণ করে নয়। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোকে অস্বীকার করা। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কিছু ছিল যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। যেটা শোধরানো যুক্তিযুক্ত হত।

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীলঙ্কার (তখন সিংহল) রাজধানী কলম্বো শহরে বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মিলে একটা সাধারণ উন্নয়ন সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় 'কলম্বো প্ল্যান' (Colombo Plan)। এই কলম্বো প্ল্যান সংস্থার অনুরোধে অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসেন সে দেশের একজন খুবই সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার Lt. Col. G. Swayne Thomas, MA (Cantab)। তিনি রচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য পরিকল্পনা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিল ১৬১ জন ছাত্র এবং মুষ্টিমেয় শিক্ষক নিয়ে। শুরুতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস হতো রাজশাহী কলেজে। পরে তা আরম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ভবনসমূহে। শুরুতে খোলা হয়েছিল সাতটি বিভাগ ঃ ইংরাজি, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত, আইন এবং ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন। লক্ষ্য করবার বিষয়, জুবেরী সাহেব বাংলা বিভাগ খুলবার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অথচ ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল প্রবলভাবে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে । এখন (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ হাজার। বিভাগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৬৬০ -এর উপরে।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৩০১ হেক্টর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে একাংশে একসময় ছিল একটা নীল কুঠি, যার নাম ছিল মতিহার নীলকুঠি। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ নীলকুঠির মালিকরা তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি বিক্রি করে চলে যান। এক ব্যক্তি এখানে অনেক জায়গা জুড়ে গড়ে তোলেন আম বাগান। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে যে জমি হুকুম দখল করা হয়, তাতে ছিল একটা বিরাট আম বাগান, নীল কুঠির সাক্ষ্যবাহী কয়েকটি দালান, বড় বড় পুকুর। আর ছিল খানা খন্দ এবং জলা জায়গা। এক সময় এখানে বাঘ ডাকতো। ১৯৬০ এর দশকের কথা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলি বাড়িঘর তৈরি হয়েছে এবং আরো হচ্ছে। দর্শনের এক তরুণ প্রভাষকের সঙ্গে কোন এক সন্ধ্যায় গল্প করতে করতে চলছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ আমরা দুজনে একটা জলা জায়গার উপর আগুন জ্বলে উঠতে দেখি। যা দেখে সেই দর্শনের প্রভাষক ভয় পেয়ে যান। বলেন, 'জানেন, এটা ছিল একটা পোড়ো জায়গা। শুনেছি এখানে অনেক জিন আছে।' আমি তাকে অভয় দিয়ে বলি, 'ভয় পাবার কিছু নেই। ঐ আগুন জিনে জ্বালায়নি। ওকে চলতি কথায় বলে আলেয়া। জলা জায়গায় ঘাস পাতা পচে এক রকম গ্যাস হয়। যাকে বলে ফসফিন। গ্যাসটা অত্যন্ত দাহ্য। বাতাসের সংস্পর্শে সাধারণ উত্তাপেই দপ্ করে জ্বলে উঠে।' দর্শনের সেই প্রভাষক আমার কথায় ভরসা পাননা। তিনি বিড় বিড় করে কি একটা যেন দোয়া পড়তে শুরু করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই জলা জায়গাটা এখন ভরাট করে রাস্তা বানান হয়েছে। রাস্তার দুপাশে গড়ে উঠেছে মনোরম তরুবীথি।

যে অঞ্চল নিয়ে আজকের বাংলাদেশ গঠিত, ইংরাজ আমলে সেখানে ছিল মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তান আমলে স্থাপিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এটা এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই ঐতিহাসিকভাবে আসে এর স্থান। পাকিস্তান হবার পর এই অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষিত জনসমষ্টির একটা বিশেষ চাহিদা। এই চাহিদা পূরণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রেখেছে তার বিশিষ্ট্য অবদান। আমাদের দেশে ঠিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এখন যা বোঝায়, ইংরাজ আমলের আগে তা ছিল না। ইংরাজ আমলে প্রথম স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য ছিল না। যদিও সিলেবাস সমূহ ছিল প্রায় তুল্য। আজও আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত নয়। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহু কিছুই করণীয় আছে। তবে একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, একটা জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে স্কুলের শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ সেখানেই কাঁচা বয়সে সৃষ্টি হয় ছাত্রদের মানসিক গঠন। তাই স্কুলের শিক্ষার গুণগত মান না বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির চেষ্টা সেভাবে ফলপ্রসু হতে পারেনা। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, সাধারণভাবেই আমাদের শিক্ষার গুণগত মান অন্য অনেক দেশের তুলনায় হয়ে আছে যথেষ্ট নিচু। একটা দেশের শিক্ষার মান কেবল পাঠ্যসূচীর মান পরিবর্তন করে বাড়ানো সম্ভব হয়না। এর জন্যে প্রয়োজন করে উন্নতমানের শিক্ষকের। আমাদের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উন্নতমানের শিক্ষকের রয়েছে যথেষ্ঠ অভাব। আমাদের শিক্ষার সমস্যা যতনা কাঠামোগত (Structural) তার চাইতে বেশী হলো ক্রিয়াগত (functional),

www.pathagar.com

এইটাই হলো বেশ কিছু বিদেশী শিক্ষাবিদের অভিমত। আমাদের পাঠ্যসূচী যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু তা যথাযথভাবে পড়ান সম্ভব হয়না। এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিশেষ দুর্বলতা।

ইংরাজ আমলে শিক্ষারক্ষেত্রে হিন্দুরা ছিলেন এগিয়ে। অধিকাংশ শিক্ষক এবং অধ্যাপক ছিলেন তাঁরাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দুরা অনেকে ঠাট্টা করে বলতেন, "মক্কা ইউনিভার্সিটি"। কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরও অধিকাংশ অধ্যাপক ছিলেন হিন্দু। পাকিস্তান হবার পর, হিন্দু শিক্ষক এবং অধ্যাপকবৃন্দ চলে যেতে আরম্ভ করেন ভারতে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ফলে দেখা দেয় একটা বড় রকমেরই সমস্যা। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই ঘটনার বিচার করলে একে একটা বড় রকমের সাফল্যই বলা যেতে পারে। আমাদের শিক্ষার মান যাই হোক না কেন, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এখন শিক্ষার কিছুটা আলোক পেতে পারছে। পাকিস্তান হবার পর, মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই অনগ্রসর মুসলিম জনসমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বেশ কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। যা আগে ভাবতে পারা যেত না। বাংলাদেশ হবার পশ্চাতে উঠতি বাংলাভাষী শিক্ষিত সংস্কৃতি সম্পন্ন মুসলিম অংশই (intelligentsia) প্রদান করেছিল প্রধান নেতৃত্ব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

www.pathagar.com

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
কারিগরী শিক্ষা

আগের দিনে কারিগরী শিক্ষা চলত বংশপরম্পরা। বাপের কাছে থেকে কাজ শিখত ছেলে। আমাদের দেশে প্রায় সব বৃত্তিই ছিল কৌলিক বা বংশপরম্পরায় শেখা। কামারের ছেলে হতো কামার। কুমারের ছেলে হতো কুমার। রাজ মিস্ত্রির ছেলে হতো রাজ মিস্ত্রি। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। নির্মিত হয়েছে নদীর ওপর দিয়ে খিলান করে সেতু। কিন্তু এসব মানুষ শিখেছে একে অপরের কাছ থেকে। এর জন্যে ছিলনা কোন স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রণালীবদ্ধভাবে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়নি।

আমাদের দেশে মানুষ অনেক কিছু বানাতে জানতো। অনেক ধরনের নৌকা বানান হতো আমাদের দেশে। নৌকার দৈর্ঘ্য হিসাবে নাম হতো। যেমন, "বিশ হাতী", "বাইশা", "পঁচিশা", "আঠাইশা"। সমুদ্রগামী বড় নৌকাকে বলা হতো "বুহিত"। সমুদ্রগামী বুহিতে থাকতো "দিশারু", তারাবিদ, যে রাতে তারা দেখে দিক নির্ণয় করতো। "পবন বেত্তা", যে বাতাসের গতি নির্ণয় করতো। "গাবর", সাধারণ নাবিক, যারা দাঁড় টানতো। হিন্দুদের মধ্যে ছিল বর্ণ ব্যবস্থা। সাধারণত এক বর্ণের লোক এক পেশায় নিযুক্ত থেকেছে। মুসলমানদের মধ্যে এর কিছু ব্যতিক্রম ছিল। যদিও সাধারণত ছেলেরা কাজ শিখত পিতার কাছ থেকে, তবুও এক পেশার লোক ইচ্ছা করলে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারতো ওস্তাদের কাছ থেকে কাজ শিখে। বিশেষ করে শহরে। তাদের মধ্যে বৃত্তিগত বর্ণ ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রেই ছিল না। অবশ্য মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর "কবি কঙ্কনচন্ডি"-তে আমরা মুসলমান সমাজে বর্ণপ্রবণতার (Caste tendency) বেশ কিছুটা দৃষ্টান্ত পাই। যেমন, যেসব মুসলমান কাগজ বানাত, তাদের বলা হতো "কাগজি"। যারা কাপড় রং করতো, তাদের বলতো "রঙ্গরেজ"। যারা কাপড় বুনতো তাদের বলা হতো "জোলা"। যারা পিঠা বানিয়ে বেচত তাদের বলত "পীঠারি"। এক সময় রাজমিস্ত্রি সাধারণত হতো মুসলমানরা। তারা তাদের ওস্তাদের নির্দেশে বিরাট বিরাট ইমারত বানাত, যা ভেঙ্গে পড়তো না। আগেও মানুষ অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে। কিন্তু এসব যন্ত্রপাতি ছিল হস্তচালিত অথবা পশুশক্তি চালিত। ইউরোপের কারিগরী দক্ষতা এ সময় আমাদের থেকে খুব উন্নত ছিল না। জুলিয়াস সিজার থেকে নেপোলিয়ান, সবাই ঘোড়ায় চড়েই যুদ্ধ করেছেন। ইউরোপে এশিয়া থেকে অনেক বিদ্যা গিয়েছে। যেমন, চীন থেকে গিয়েছে কম্পাস, বারুদ তৈরির কৌশল এবং কাঠের উপর অক্ষর লেখে বই ছাপাবার কৌশল। লৌহার মধ্যে বিশেষ মাত্রায় কয়লা (১ থেকে ১.৬ শতাংশ) থাকলে তৈরি হয় ইস্পাত। ঢালা-লোহায় (Pig-iron) থাকে অধিক (২ থেকে ৪.৫ শতাংশ) কার্বন। ঢালা-লোহার মধ্যে বিশেষভাবে বায়ু প্রবাহিত করে বাড়তি কার্বন পুড়িয়ে ঢালা-লোহা থেকে তৈরি করা হয় ইস্পাত (Steel)। বেসেমার (Bessemer) সাহেব মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) অঞ্চলের লৌহকারদের কাছে এই পদ্ধতি শিখে ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন (১৮৫৬-৬০খ্রিঃ)।

www.pathagar.com

বিলাতে এই পদ্ধতিকে বলে বেসেমার পদ্ধতি। যদিও পদ্ধতিটি তার মৌলিক আবিষ্কার নয়। দক্ষিণ ভারতেই প্রথম ইংরাজরা টিপু সুলতানকে বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে বারুদ পুরে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখে (১৭৮০-১৭৮৪)। এ থেকেই প্রথম ইংরাজদের মাথায় আসে যুদ্ধে রকেট ব্যবহারের ধারণা। ইংরাজরা লোহার চোঙ্গে বারুদ পুরে রকেট বানিয়ে প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রয়োগ করে। এসব ইতিহাস থেকে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না, ইংরাজ যখন এই উপমহাদেশে আসে, তখন এই উপমহাদেশের মানুষের যথেষ্ট কারিগরী দক্ষতা ছিল। ঢাকার তৈরি মির জুমলা-র কামানে এখনও বিশেষ মরিচা ধরেনি। বিলাতের মানুষের কারিগরীবিদ্যা ও দক্ষতার সঙ্গে আমাদের বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়, বিলাতে শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটবার ফলে। ইংল্যান্ডে এ সময় অনেকগুলি আবিষ্কার পর পর ঘটে। ঘটে কলকব্জা চালাবার জন্যে বাষ্পশক্তির প্রয়োগ। যা বিভিন্ন দ্রব্য-উৎপাদন পদ্ধতিতে ঘটিয়ে দেয় অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতের প্রথম সুতা কলে স্টীমইঞ্জিন যুক্ত করা হয়। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে বিলাতে প্রথম চলে রেলগাড়ী। এর মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে লর্ড ডালহৌসি দক্ষিণ এশিয়াতে রেলগাড়ি চালু করেন। কিন্তু এর ফলে আমাদের দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটে না। দক্ষিণ এশিয়া থেকে বিলাতে কাঁচামাল রপ্তানী করা হয় সহজ, আর বিলাত থেকে আসা তৈরী পণ্য ছড়িয়ে পড়তে থাকে আমাদের গ্রাম-গঞ্জে। ভাল জিনিস আর বিলাতী জিনিস হয়ে দাঁড়ায় সমার্থক। বিলাতে কাঁচামাল সরবরাহ ও বিলাতের তৈরি জিনিস কিনবার বাজারে পরিণত হয় দক্ষিণ এশিয়া, যা সে আগে ছিল না। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল বাংলার উপর। আমাদের সমৃদ্ধ হস্তচালিত কুটির শিল্প ধ্বংস হতে থাকে। মানুষ কৃষিকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করতে থাকে জীবিকার উপায় হিসাবে। যে অবস্থার অবসানের জন্যে এক পর্যায়ে এদেশের মানুষ শুরু করে রাজনৈতিক সংগ্রাম। সে যুগের একজন লেখক ক্ষোভ প্রকাশ করে কবিতা লিখেছেন ঃ

সুঁই, সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই কাঠি, তাও আসে পোতে-
প্রদীপটি জ্বালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

এরকম পরিস্থিতিতে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন খুব না হবারই কথা। ইংরাজ আমলে বাংলায়, শিবপুরে (হাওড়ায়) ছিল একটি মাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। অনেক পরে ঢাকায় খোলা হয় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। রাজশাহী শহরে কারিগরী শিক্ষা দেবার জন্যে ১৮৯৮ সালে স্থাপিত হয় Dimond Jubilee Institution। এখানে দু'বছর পড়ে লোকে সাব-ওভারসিয়ার হতে পারতো। দু'বছর পড়ে শিখতে পারত জমি-জরীপবিদ্যা এবং অন্য কিছু কারিগরী কর্ম। এর বেশী নয়। স্কুলটি চলত রাজশাহী জেলা বোর্ডের অর্থে। এই কারিগরী শিক্ষার স্কুলের সঙ্গে লাগোয়া ছিল সেরিকালচার স্কুল। যেখানে শেখান হতো, কিভাবে রেশম চাষ করতে হয় এবং মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখে রেশম কীটের রোগ নির্ণয় করা যায়। রাজশাহী শহরের সবচেয়ে নামকরা হাইস্কুল ছিল রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। এতে বি-কোর্স বলে একটা পৃথক কোর্স ছিল। যাতে বেশি করে পড়ান হতো বিজ্ঞান, শেখান

www.pathagar.com

হতো অঙ্ক আর কাঠের কাজ। এই কাঠের কাজ শিখবার জন্যে বি-ক্লাশের ছাত্রদের ভোরবেলা যেতে হতো জুবলি ইন্সটিটিউটে। এই কোর্সে প্রথম বিভাগে পাশ করলে ছেলেরা শিবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে সাব-ওভারসিয়ারী পড়বার সুযোগ পেতে পারতো। কিন্তু কম ছাত্রই প্রথম বিভাগে পাস করতে পারতো।

রাজশাহীতে কারিগরী শিক্ষার কিছুটা ঐতিহ্য থাকার কারণে এখানে আগে থেকেই একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা যায় কিনা, তা ভাবতেন অনেকে। পাকিস্তান হবার পর ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে রাজশাহীতে স্থাপিত হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজটিকে রূপান্তরিত করা হয় একটি স্বায়ত্বশাসিত ডিগ্রি প্রদাণকারী প্রতিষ্ঠানে। এখন এর নামকরণ করা হয়েছে "বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রাজশাহী, (বি,আই,টি)।" ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী ছাত্রদের একাংশ এই প্রতিষ্ঠানে পড়বার সুযোগ লাভ করে থাকে। বর্তমানে এখান থেকে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজিতে ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে।

রাজশাহীতে কারিগরী শিক্ষার জন্যে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে । এখানে তিন বছর পড়বার পর ছাত্ররা ডিপ্লোমা পেয়ে থাকে।

ইংরাজ আমল থেকেই রাজশাহী শহরে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। অন্যান্য বহু শহরের তুলনায় রাজশাহী শহরে (রামপুর-বোয়ালিয়াতে) শিক্ষার সুযোগ ছিল অনেক বেশী। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ থাকা, আর তা গ্রহণ করতে পারা এক ব্যাপার নয়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ও'ম্যানলি রাজশাহীর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখেছেন, ভারতে শিক্ষিত বলতে ধরা হয় লিখতে পড়তে পারা। গোটা বাংলায় এরকম শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হলো মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। রাজশাহী জেলার শিক্ষিতের হার হলো শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। অর্থাৎ এই গড়, তখনকার জাতীয় গড়ের তুলনায় ছিল কম। একমাত্র তখনকার রংপুর জেলা ছাড়া উত্তরবঙ্গের আর সব জেলাতেই রাজশাহী জেলার চাইতে শিক্ষিতের হার ছিল বেশী। ওম্যানলি-র ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ।

বর্তমান বাংলাদেশে (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব) সাক্ষরতার জাতীয় গড় হলো ৩২.৪%। আর রাজশাহী জেলার সাক্ষরতার হার হলো ৩০.৬%। সাক্ষরতার দিক থেকে রাজশাহী জেলা আগের তুলনায় বেশ কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছে। নওগাঁর সাক্ষরতার হার ২৮.৪%; নাটোরে সাক্ষরতার হার ২৭% এবং নবাবগঞ্জে সাক্ষরতার হার ২৩.৮% । শিক্ষা ও সাক্ষরতা সমার্থক নয়। বৃহত্তর রাজশাহীতে সাক্ষরতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত হবার যে সুযোগ আছে, এই অঞ্চলের মানুষ তা গ্রহণ করতে চাচ্ছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

যাকে বলে কারিগরী শিক্ষা তা মানুষকে বিশেষভাবে শেখায় জিনিস তৈরির কৌশল। জীবন যাত্রার মান বাড়বার উপর নির্ভর করে ব্যবহার্য জিনিসের চাহিদা। দরিদ্র দেশের কারিগরী দক্ষতা বাড়তে চায়না। কারণ সেখানে জিনিসের চাহিদা কম।

শিক্ষার উপর যেমন নির্ভর করে সমাজ জীবন, তেমনি আবার সমাজ জীবনের চাহিদার উপর নির্ভর করে শিক্ষার মান। উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই কেবলই শিক্ষার মাধ্যমে একটা দেশের পরিবর্তন এনে দেওয়া যায় না। বরং সৃষ্টি হতে দেখা যায় শিক্ষিত বেকারের সমস্যা। সব দেশেই ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে এক পর্যায়ে বেকারের সংখ্যা বাড়তে দেখা যায়। কারণ, সমাজে অত ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয় না। তাদের উচ্চ মেধা সমাজের কোন কাজে লাগে না। মেধাবীদের চাইতে অমেধাবীদের শ্রমের উপরই মানব সমাজ অধিক নির্ভর করে চলে।

www.pathagar.com

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
অপরাধ ও শাস্তি

যে সব ঘটনাকে আমরা সাধারণত গণ্য করি অপরাধ হিসাবে, তা প্রাধান্য পায় দেশে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে। মুগল আমলের শেষভাগে একজন কবি লিখেছেন ঃ

টাকা কড়ি লোকে রাখে মাটিতে পুতিয়া
ডাকাত কাড়িয়ালয় গামছা মোড়া দিয়া ॥
ডাকাত দেশের রাজা বাদশায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজীর শাসনে ॥

লর্ড হেস্টিংস-এর সময় একদল তথাকথিত ফকির তাদের নেতা মজনু শাহ-র নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে লুটতরাজ এবং ডাকাতি আরম্ভ করে। বগুড়া জেলার ১২ মাইল দক্ষিণে গোয়াইল নামক স্থানের মদরগঞ্জ এবং মহাস্থানে ছিল মজনু শাহ্-র দলের ঘাঁটি। তখনকার দিনাজপুর ও রংপুরের দক্ষিণে এবং বগুড়ার পশ্চিমে মজনু শাহ্ তার দল নিয়ে ডাকাতি ও লুটতরাজ করতো। কেবল তাই নয়, এই সব ডাকাত নারীদের উপর করত ভয়াবহ পাশব অত্যাচার ঃ

ভাল মানুষের কূলবধু জঙ্গলে পালায়।
লুটেরা ফকির যত পাছে পাছে ধায় ॥
যদি আসি লাগে পাছ জঙ্গলের ভিতর।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর ॥
বসন কাড়িয়ালয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন ॥
দন্ডে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও।
অতিথ ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও ॥

মেয়েরা ধর্ষিতা হবার পর অভিশাপ দিত এই সব তথাকথিত ফকিরদের ঃ

লাজে নাহি কথা রাখে গুপ্ত ভাবে।
ধর্ম সাক্ষী করি তারা মজনুরে শাপে ॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক ॥
(বাংলা ১২২০ সালে পঞ্চানন দাস রচিত)

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মজনু শাহ ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্স-এর কাছে পরাজিত হয়ে ময়মনসিংহে যায়। পরে সেখান থেকে মাঝে মাঝে এসে রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়ায় উপদ্রব করতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মজনু শাহ্র উপদ্রব চলতে থাকে। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তার

www.pathagar.com

মৃত্যু হয়।

মজনুর একজন সহযোগী ছিল ভবানী পাঠক। সে সাধারণত বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে নদীপথে ডাকাতি করতো। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে অস্ত্র বোঝাই সাতখানা বড় নৌকা ধরা পড়ে। ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণী নামে একজন স্ত্রীলোকও ডাকাতি করতো। দেবী চৌধুরানী নৌকাতেই বাস করতো এবং একদল বেতনভোগী বরকন্দাজ পোষণ করতো। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যান্ট ব্রেনান একজন দেশীয় কর্মচারীর অধীনে ভবানী পাঠকের বিরুদ্ধে ২৪ জন সিপাহী পাঠান। তারা অতর্কিতে ভবানী পাঠক এবং তার ৬০ জন অনুচরের নৌকা আক্রমণ করে। ভবানী পাঠক ও তার তিনজন অনুচর এদের হাতে মারা যায়। আটজন আহত এবং বিয়াল্লিশ জন বন্দী হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছেন, তা পড়ে এদের সম্বন্ধে লোকের শ্রদ্ধা জাগতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস হলো, এরা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বঙ্কিম চন্দ্র এদের সঙ্গে রবিন হুডের কাহিনী কিছুটা জুড়ে দিয়েছেন। যা তিনি পেয়েছিলেন স্কট (Scott) এর উপন্যাস থেকে।

লর্ড বেনটিঙ্ক-এর একটা বড় কৃতিত্ব, ঠগী দস্যু দমন করতে পারা। ঠগী দস্যুরা এই উপমহাদেশের বহু অঞ্চলেই ছিল। এরা লোককে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করত এবং তাদের সবকিছু নিয়ে নিত। এই জন্যে এদের বলত ঠগী। ঠগীরা অভিনব কায়দায় রেশমি রুমালের ফাঁসে জড়িয়ে লোক খুন করতো। ঠগীরা মা ভবানীর (মা কালীর) পুজা করতো। তারা মনে করতো, লোক ঠগীয়ে খাওয়া হলো তাদের ধর্ম। আর মা ভবানী সেই নির্দেশ তাদের প্রদান করেছে। ঠগীদের দলে অনেক মুসলমানও যোগ দিয়েছিল। আর তারাও করতো ভবানী পুজা। ইংরাজ আমলে ঠগী দমনের ইতিহাস খুব বিচিত্র। কিলাত থেকে উইলিয়াম স্লিম্যান (Willium Sleeman) নামক এক ব্যক্তিকে আনা হয় ঠগী দমনের জন্যে। স্লিম্যান প্রথমে পরিণত হন একজন পাকা ঠগী দস্যুতে। তিনি ভালভাবে শেখেন ঠগীদের সাংকেতিক ভাষা। তারপর ঠগীদের সবকিছু জানা হয়ে গেলে তিনি ধরতে আরম্ভ করেন ঠগীদের। ঠগীদের শাস্তি ছিল প্রাণদন্ড। বড় বড় সব ঠগী সর্দার ধরা পড়ে গেলে ঠগীদের দল ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে। ঠগী দমনে খুব কঠোর হতে হয়ে ছিল লর্ড বেনটিঙ্ককে। রাজশাহীর পূর্বাঞ্চলে অনেক ঠগী ছিল।এরা রেশমী রুমালের স্থলে ব্যবহার করতো গামছা। গলায় গামছা জড়িয়ে দম বন্ধ করে এরা লোক খুন করতো। তাই এদের সাধারণত বলা হতো 'গামছা মোড়া' ঠগী। মুঘল আমলের শেষে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে ঠগীদের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। এখন আমাদের দেশে রেলে, বাসে যাত্রীদের ধুতরার বীচি খাইয়ে অজ্ঞান করে তাদের টাকা-কড়ি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরাও আসলে ঠগী। তবে সেই আমলের ঠগীদের মত এখনও অত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেনি ; উঠতে যে পারেনা, তা নয়।

ইংরাজ আমলের শেষ দিকেও রাজশাহী শহরের কাছে অনেক নামকরা ডাকাত

www.pathagar.com

ছিল। রাজশাহী শহর থেকে দূরে নয়, কাশিয়াডাঙ্গা নামকস্থানে ছিল এক দল নামকরা ডাকাতের ঘাঁটি। এছাড়া ডাকাত ছিল দামপাড়া, শ্যামপুর ও আরো অনেক জায়গায়। রাজশাহীর কাছে বড়গাছি একটা হাট। এই হাটের সন্নিকটে একজন নামকরা ডাকাত ছিল। তার নাম লোকমান। সে এখনও বেঁচে আছে। সে তার যৌবনে ঘোড়ায় চড়ে দল বল নিয়ে ডাকাতি করে বেড়াত। একবার সে এক গ্রামে ডাকাতি করতে যেয়ে ধরা পড়ে। গ্রামের লোক তার দুই চোখই উপড়ে ফেলে। সে এখন অন্ধ। গ্রামের লোক ডাকাত ধরে অনেক সময় হাত পা কেটে ফেলত। কারণ, ডাকাতদের অনেক সময়ই ছেড়ে দেওয়া হতো থানা থেকে। এখন আমরা যেসব কারণে পুলিশকে সমালোচনা করি, আগে যে এদেশের পুলিশের মধ্যে সেসব দোষ বিদ্যমান ছিলনা, তা নয়। ইংরাজ আমলে দারোগা, ডাকাত, জমিদার যোগসাজেসে ডাকাতি করবার কথা অজানা নয়। অনেক ডাকাত ধন সঞ্চয় করে পরে হয়েছে জমিদার। নাটোরের বিখ্যাত বিশী পরিবারের পূর্বপুরুষ নাকি ছিল ডাকাত। চলন বিল অঞ্চলে ডাকাতি করতো তারা । চলন বিল অঞ্চলে এক সময় অনেক দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। যেমন ঃ পঞ্চু ডাকাত। গ্রামের লোক পঞ্চু ডাকাতকে ধরে তার দুই হাত কেটে দিয়েছিল। চলন বিল অঞ্চলের নন্দ ডাকাত ছিল আরো ভয়ঙ্কর। লোকে তাকে ধরে টুকরো টুকরো করে কেটে তার দেহের কাটা অংশ ফেলে দিয়েছিল চলন বিলের পানিতে। কারণ, লোকে জানত, পুলিশের হাতে দিলে সে আবার সহজেই ছাড়া পেয়ে যেতে পারবে। অনেক ডাকাত সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন, অনেক ডাকাত ছাগল অথবা গরুর রূপ ধরে গ্রামে ঢুকে ডাকাতি করতে পারত এবং এখনও কোন কোন ডাকাত এরকম করতে পারে। পাকা ডাকাতরা অনেক রকম যাদুবিদ্যা জানে। এমন কি, তারা জেলখানা থেকে নাকি ভোমরা হয়ে পালাতে পারে! অনেক ক্ষেত্রে ডাকাতরা প্রথমে ভূত-প্রেতের ভয় ছড়িয়ে পরে ডাকাতি করতো। যাতে মানুষ ভূত-প্রেতের ভয়ে সহজে তাদের ধরতে না আসে। এখনও গ্রাম-গঞ্জে কোন কোন স্থানে এভাবে ডাকাতি করবার চেষ্টা হয়ে থাকে।

আমি যে পাড়ায় থাকি তার কাছেই জেলখানা। মুঘল আমলে ঠিক জেলখানা বলে কিছু ছিল না। কাউকে কয়েদ করে রাখতে হলে রাখা হতো দুর্গের মধ্যে। চোরের শাস্তি ছিল হাত কাটা। জেলে আটকে রাখা নয়। ডাকাতকে প্রাণদন্ড দেওয়া চলতো। তবে বাদশাহ্-এর হুকুম ছাড়া প্রাণদন্ড প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। চোর ডাকাতকে জেলে আটকে রেখে শাস্তি দেবার প্রথা এদেশে আরম্ভ হয় ইংরাজ শাসন আমলে। রাজশাহীতে সম্ভবত ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি একটি ছোট জেল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে পরিণত করা হয় একটি সেন্ট্রাল জেলে। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল ছিল খুব নামকরা। প্রায় ১৬ হেক্টর জমির উপর জেলটি স্থাপিত। এখানে সাধারণত সেই সব কয়েদিরা থাকে, যাদের দুই বছরের অধিক সময়ের সাজা হয়েছে। এই জেলে সাধারণত রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার দীর্ঘ মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা শাস্তি ভোগ করে। এই জেলে রাজশাহী জেলার স্বল্প মেয়াদী শাস্তিপ্রাপ্তরাও থাকে। আর থাকে হাজতিরা। এই জেলে হাসপাতাল আছে। যেখানে অসুস্থ কয়েদিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই জেলে ফাঁসি দেবার ব্যবস্থা আছে। এই জেলে মেয়ে কয়েদিদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। পুরুষ এবং মেয়ে কয়েদিদের অবশ্য পৃথক ভাবে

www.pathagar.com

রাখা হয়। রাজশাহী জেলে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা, বাঁশ, বেত ও তাঁতের কাজ করে। তারা যেসব জিনিস বানায়, তা বিক্রির ব্যবস্থা আছে। এই জেলে যে কাপড় বানান হয়, তা থেকে অন্যান্য জেলের কয়েদিদের জামা তৈরি করা হয়। আগে জেলখানার প্রাচীরের বাইরে সব্জির চাষ করতো কয়েদিরা। এখনও কিছু কিছু করে, তবে আগের মত করে না। আগে দেখেছি, গরুর বদলে মানুষ দিয়ে লাঙ্গল টানাতে। এখন, এরকম লাঙ্গল টানান আর চোখে পড়ে না। শাস্তির ধারা নিশ্চয়ই অনেক বদলেছে। আগে কয়েদিদের দিয়ে ঘান ঘোরান হতো। ঘানিতে ভাঙ্গা হতো সরিষা এবং রেড়ি। কিন্তু এখন তাও আর করান হয় না কয়েদিদের দিয়ে। ইংরাজ আমলের তখনকার সারা বাংলায় চিকিৎসার জন্য যে রেড়ির তেল প্রয়োজন হতো, তা প্রধাণত সরবরাহ করা হতো এই জেল থেকে। ইংরাজ আমলে জেলে কয়েদিরা এখনকার তুলনায় অনেক কঠিন সাজা পেত। কিন্তু তখনও জেলে কয়েদিরা যা খেতে পেত, এদেশে গরীব জনসাধারণ তা পেত না। কয়েদিদের জীবন যাত্রার মান ছিল সাধারণ মানুষের তুলনায় উন্নত।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। রাজশাহী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে একটি লোক আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য কিছু জিনিস চুরি করে ছিল। পরে ঐ একই দিন সে আরো কয়েক বাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি করে এবং ইচ্ছা করেই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। বিচারে তার কয়েক মাসের সাজা হয়। পরে বিশেষ সূত্রে জেনেছিলাম, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার কিছু করণীয় ছিলনা। সে তাই আবার জেলে যেতে চেয়েছিল। অনেকেই জেলে যাবার পর ছাড়া পেয়ে আবার জেলে যেতে চায়। কারণ, তারা জেলের জীবনকে অনেক নিরাপদ ও নিশ্চিত বলে মনে করে।

আমদের দেশে অপরাধ নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ গবেষকের মতে, সে দেশের কাঁচা চোররা জেলে যেয়ে পাকা চোরে পরিণত হয়। জেলখানা হলো কার্যত অপরাধকারিদের শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে যেয়ে ছোট খাটো অপরাধীরা বড় ধরনের অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আরো বড় অপরাধী হবার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর জেল থেকে যত লোক ছাড়া পায়, তার প্রায় অর্ধেক লোক আবার ফিরে আসে জেলে। আমেরিকাতে সাধারণ শিক্ষার খাতে যে পরিমাণ সরকারী ও বেসরকারী অর্থ প্রতি বছর ব্যয়িত হয়, তার প্রায় পাঁচগুণ বেশী অর্থ ব্যয়িত হয় অপরাধ দমনের জন্য। চোর-ডাকাতও বহু লোককে চাকরী দেয়। চোর-ডাকাত না থাকলে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের অনেক লোক বেকার হয়ে পড়বে। অনেক উকিল হারাবে তাদের জীবিকার উপায়। আদালতে প্রয়োজন হবে না বিচারকের। বহু লোক নানাভাবে বেঁচে আছে অনেক রকম অপরাধকে ঘিরেই।

আমরা আগে এক জায়গায় বলেছি, মুঘল আমলে চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কাটবার বিধান ছিল। কিন্তু ছোট খাটো চুরির জন্য হাত কাটবার বিধান ছিলনা। সাধারণত ১০ দিরহাম বা তার অধিক মূল্যের জিনিস চুরি করলে কাজী হাত কাটবার শাস্তি দিতে পারতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এক চোরকে বাঁচাবার জন্য আরো চোর আসত। তারা সকলেই বলতো, তার ঐ একই চুরির সঙ্গে জড়িত। সাধারণত দেখা যেত, চোরাই মালের মূল্যে চোরদের মাথা পিছু ভাগ করলে ১০ দিরহাম হচ্ছে না। ফলে চোরদের হাত কাটা হতো না। বেত্রাঘাত বা অন্য শাস্তি দেওয়া হতো। আইনের ফাঁক সব আমলেই ছিল। বিলাতে এক সময় চুরির শাস্তি ছিল প্রাণদন্ড। বিলাতের ইতিহাসে একটা ভেড়া চুরির জন্য প্রাণদন্ড হবার কথাও জানা আছে। বিলাতে শাস্তির পরিমাণ কমেছে, মানবিক ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধি পাবারই ফলে। আর শাস্তির কঠোরতা হ্রাসের ফলে যে অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে তা নয়। বিলাতে Habeas Cerpus Act প্রবর্তিত হয় ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে । এর আগে বিলাতে যেকোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে জেলে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা যেত। অনেক রকম অদ্ভুত আইন ছিল বিলাতে। কোন মেয়েকে ডাইনি বলে সন্দেহ হলে আদালতে তার বিচার হতো। বিচারে সে ডাইনি বলে সাব্যস্থ হলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার রায় দেওয়া হতো। বিলাতে ডাইনি পুড়িয়ে মারবার আইন তুলে দেওয়া হয় ১৭৩৬ খ্রিষ্টাব্দে । অনেকে মনে করেন, বিলাত চিরকাল গণতন্ত্রী ছিল। অপরাধীকে বিলাতে চিরদিন আমাদের দেশের চাইতে কম শাস্তি প্রদান করা হতো। কিন্তু তা সত্য নয়। এক সময় সেখানেও ছিল কঠোর শাস্তির বিধান। মানুষ বিলাতেও ভেবেছে, কেবলমাত্র শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব। মুঘল আমলের তুলনায় বিলাতের শাস্তি ব্যবস্থা কিছু কম কঠোর ছিল না।

আমাদের সংস্কৃতিতে এসে মিশেছে নানা ঐতিহ্যের ধারা। এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী সময় থেকেছে ইংরাজ শাসনে। ইংরাজ শাসন আমাদের ইতিহাসের বিশেষ অংশ হয়ে পড়েছে। ইংরাজদের কাছ থেকে পাওয়া গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের (Rule of law) ধারণা আমাদের মধ্যে, মনে হয়, স্থায়ী হতেই যাচ্ছে। আমরা এখন গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনকে আমাদের জীবনে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতেই চাচ্ছি। চাচ্ছিনা, মানুষের নাগরিক স্বাধীনতাকে খর্বিত করতে। ইংরাজের কাছ থেকে পাওয়া, Habeas Corpus-এর ধারণা এখন আমাদেরও আইন চিন্তার অংশ। তবে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য আমরা পেয়েছি, তার সমালোচনা করবারও কিছু আছে। বিশেষ করে দেওয়ানী আদালতের ক্ষেত্রে এই বিচার ব্যবস্থায় বিচার হতে সাধারণত সময় নেয় বেশী। যদিও বলা হয় আইনের চোখে সবাই সমান, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে ভাল উকিল প্রদান করতে পারে, মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারই জেতার সম্ভাবনা থাকে অধিকাংশক্ষেত্রে। বিচার পেতে হলে মানুষকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা খুবই ব্যয়বহুল। গরীব দেশের গরীব মানুষদের উপযোগী তা নয়। এ রকমই অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত। যদিও K.M. Panikar, তাঁর বহুল পঠিত বই, Asia and Western Dominance -এর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। অবশ্য বৃটিশ আইনের ধারণা যে আমাদের চিন্তা চেতনাকে, মানব সম্বন্ধের ধারণাকে বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের নেই।

www.pathagar.com

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
বিচিন্তা

সংক্ষিপ্ত পরিসরে রাজশাহীর ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করা গেল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল ছিল পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত। গুপ্ত সম্রাটদের সময় শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি। প্রত্যেক ভুক্তি কতগুলি মন্ডল, বিষয়, বীথি এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। ইংরাজ আমলে যাকে বলা হতো রাজশাহী বিভাগ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার এর মতে মোটামুটি তা-ই ছিল পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমা। পাল রাজাদের সময়ও পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়। সেন রাজাদের সময় পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমানা অনেক বেড়েছিল। পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি মন্ডলের নাম ছিল বরেন্দ্র। এই বরেন্দ্র মন্ডলের নাম পাল ও সেন রাজাদের সময়ও পাওয়া যায়। রাজশাহী ছিল এই বরেন্দ্র মন্ডলের অন্তর্গত। সুলতানী আমলে, 'বঙ্গালহ' রাজ্যটি অনেকগুলি রাজস্ব অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে বলা হত 'মহল'। কয়েকটি মহল নিয়ে গঠিত হতো এক একটি 'শিক'। 'শিকদার' নামক কর্মচারী এর ভার প্রাপ্ত হতেন। মুঘল আমলে শিক-এর নাম হয় পরগণা। কতগুলি পরগণা নিয়ে শাহ্জাহানের সময় গঠন করা হয় চাকলা। এক সময় রাজশাহী নামে একটা বড় চাকলা ছিল। যে চাকলা থেকে স্বাধীনভাবে খাজনা আদায় করতেন জমিদার উদিত নারায়ণ। উদিত নারায়ণকে মুর্শিদ কুলি খাঁ খুশী হয়ে 'রাজা' উপাধী প্রদাণ করেন। কিন্তু পরে উদিত নারায়ণের সঙ্গে মুর্শিদ কুলি খাঁর-র দেখা দেয় বিবাদ এবং যুদ্ধ হয়। উদিত নারায়ণ পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। মুর্শির্দ কুলিখাঁ তাঁর জমিদারীর একটা বড় অংশ প্রদান করেন নাটোরের জমিদার রাম জীবন কে। এর ফলে নাটোরের জমিদার পরিচিতি পান, রাজশাহীর জমিদার হিসাবে। এ থেকেই পরে সৃষ্টি হয় রাজশাহী জেলার ও এক পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগ এবং তারপর শহরের নাম। প্রথমে নাটোর ছিল রাজশাহী জেলার সদর। পরে নাটোর থেকে সদর দফতর উঠে আসে (১৮২৫ খ্রিঃ) রামপুর-বোয়ালিয়াতে। রামপুর-বোয়ালিয়া ধীরে ধীরে নাম পায় রাজশাহী শহর। রামপুর-বোয়ালিয়া নামটা বাদ পড়ে যায়। বর্তমান লেখকের স্কুল জীবনেও ভূগোল বইতে সদর শহরকে বলা হতো রামপুর-বোয়ালিয়া। যদিও ডাক বিভাগে শহরকে বলতো রাজশাহী। আর রেল স্টেশনের নামও ছিল রাজশাহী। সে সময়ে রাজশাহী নামটা লেখা হতো দন্ত্য-স দিয়ে।

রাজশাহী রেশম ও নীল চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পদ্মার তীরে রামপুর-বোয়ালিয়া ছিল স্বাস্থ্যকর স্থান এবং উল্লেখযোগ্য নদী বন্দর। এখানে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরাজরা এসে করেছিল কুঠি স্থাপন। বাণিজ্য উপলক্ষে বহু ইংরাজ বাস করতো এখানে। নাটোর থেকে সদর দফতর এখানে নিয়ে আসবার একটা বড় কারণ ছিল সেইটাই।

রামপুর-বোয়ালিয়া তুলনামূলকভাবে ছিল বড় শহর। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয় রামপুর-বোয়ালিয়া মিউনিসুপ্যালিটি। যা ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে উন্নীত হয়েছে কর্পোরেশনে। এটা

www.pathagar.com

ঘটতে অবশ্য লেগেছে প্রায় ১১১ বছর।

রাজশাহী শহরের উন্নতির মূলে জমিদারদের অনেক অবদান আছে। আমরা তাঁদের অবদান সম্পর্কে যথাস্থানে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। এসব জমিদারদের মধ্যে দিঘাপতিয়ার জমিদারদের দান হলো সবচেয়ে বেশী। দিঘাপতিয়ার জমিদাররা উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন " তিলি"। হতে পারে, তাঁরা চেয়েছিলেন দান ধ্যান করে সমাজে বিশেষভাবে মর্যাদার আসন পেতে। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথের পুত্র কুমার শরৎ কুমার রায়ের বিরাট কীর্তি হলো রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম। যা এখন হতে পেরেছে ইতিহাস চর্চার বিশেষ কেন্দ্র।

রাজশাহীতে অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তখনকার জমিদারদের উদ্যোগে। যেমন, হাসপাতাল। তাদের উদ্যোগেই রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরে ছিল একটা উন্নতমানের কলেজ। কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে তাঁরা যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন, সে তুলনায় জনহিতকর কাজের মাত্রা খুব যে বেশী ছিল, তা নয়। এঁদের প্রজারা থাকতো গ্রামে । তারা ছিল কৃষিজীবী। উন্নত গ্রাম গড়বার কাজে কোন জমিদার কোন নজর দেননি। অধিকাংশ জমিদার গ্রামে থাকতেন না। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। তাদের নায়েব, গোমস্তারা প্রজাপীড়ন করে বেআইনীভাবে আবওআব, নজরানা প্রভৃতি আদায় করতো। কিন্তু সে সময়ের জমিদাররা রাজশাহী শহরের জন্য যতটুকু করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই পরে ঘটছে রাজশাহী শহরের উন্নতি । এটাও ইতিহাস।

রাজশাহী শহরের বিশেষ উন্নতি ঘটে পাকিস্তান আমলে। রাজশাহীতে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (যা এখন বি,আই,টি নামে পরিচিত)। আজকের রাজশাহী শহরের শ্রীবৃদ্ধির কথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তার এই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরই জন্য। আর ভবিষ্যতে সম্ভবত প্রধানত শিক্ষা নগরী হিসাবেই হতে পারে তার আরো উন্নতি ।

বাংলাদেশ হবার পর রাজশাহীতে স্থাপিত হয় একটা বিভাগীয় লাইব্রেরি। আর স্থাপিত হয় একটি বড় পার্ক এবং সেইসঙ্গে একটা ছোট চিড়িয়াখানা। পার্কের পরিবেশ ইতিমধ্যে যথেষ্ট মনোরম হয়ে উঠেছে। পার্কটির পরিচালনা ভার সম্প্রতি জেলা পরিষদের হাত থেকে গ্রহণ করেছে সিটি কর্পোরেশন ।

এক সময় রাজশাহী শহরের সবচেয়ে ভাল বেড়াবার জায়গা ছিল পদ্মা নদীর ধার। উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে মানুষ বেড়িয়েছে, গান গেয়েছে। ফারাক্কা ড্যাম হবার ফলে পদ্মার সে সাবেক রূপ আর নেই। কিন্তু তবু পদ্মার তীরে বেড়িয়ে, সূর্যাস্ত দেখে, নির্মল আনন্দ পায় এ শহরের অনেক মানুষ। মনে জাগে প্রশান্তি।

www.pathagar.com

যা ছিল এক সময় রাজশাহী সদর মহকুমা তা নিয়ে গঠিত হয়েছে বর্তমান রাজশাহী জেলা। এর আয়তন এখন হয়ে পড়েছে অনেক ছোট। কিন্তু সাবেক রাজশাহী জেলার মানুষের মধ্যে যে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল, তার অনেকটাই অক্ষুন্ন আছে। আর সেটা থাকা বাঞ্ছনীয় । আমরা রাজশাহীবাসী সেটাই চাই।

আমরা রাজশাহীর ইতিহাস আলোচনা করতে যেয়ে দেশের সাধারণ ইতিহাসের আলোচনাও টেনে এনেছি। কারণ, রাজশাহীর ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে হলে দেশের সাধারণ ইতিহাসকে বাদ দেওয়া যায় না। রাজশাহী একটা পৃথক দেশ নয়। জেলা মাত্র। বাংলাদেশেরই তা একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে হিসাবেই বিচার করতে হয় তাকে। পক্ষান্তরে দেশের এক একটি অংশের ইতিহাস নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করলে দেশের সমগ্র ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গভীরতা পেতে পারে। বোঝা সহজ হতে পারে, নিজেদের সামগ্রিক রাষ্ট্রিক পরিচয়। আর সেই সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতিকেও।

এই বইতে যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে ভুল থাকা অসম্ভব নয়। যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তার সঙ্গেও অনেকে পোষণ করতে পারেন সম্পূর্ণ ভিন্নমত। নানা মতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, যার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছিল রাজশাহী শহরে, বলেছেন ঃ "সত্য প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিবো না। আমার স্বদেশের গৌরবে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজের বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব। কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিবো, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা। ..... ।'

স্যার যদুনাথ সরকারের ইতিহাস গবেষণা যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তকে এখন আর সমর্থন দেওয়া যায় না। এই বইতে যা বলা হয়েছে, তাও ভুল বলে মনে হতে পারে মাত্র কিছুদিনের মধ্যে। এটা একটা খুবই সামান্য বই। কোন মৌলিক গবেষণার ফসল নয়। জনপ্রিয় ধারায় কিছু ইতিহাস বলা মাত্র। একদিন রাজশাহী শহর ছেড়ে গিয়েছিলাম ঢাকা। ঢাকা থেকে ভাগ্যের খোঁজে চলে গিয়েছিলাম দূর বিদেশে। তারপর আবার ফিরেছি রাজশাহীতে। রাজশাহীর সঙ্গে আমার জীবন-স্মৃতি জড়িয়ে আছে বিশেষভাবে। এখানেই জন্মেছিলাম আমি। আর হয়ত মৃত্যুও হবে এখানে। আবেগ বশে হয়ত কিছু বাড়িয়ে বলে থাকতেও পারি। বৃদ্ধ বয়সে ভাবালুতা স্বাভাবিক ঘটনা। মন, হারানো দিনের সন্ধানে ঘুরে ফিরে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট
রাজশাহী বিভাগ পরিচয়

জেলা	আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	জনসংখ্যা (হাজার)	থানা	শিক্ষিতের হার (%)	কৃষিজীবী	ভূমিহীন কৃষক
বগুড়া	২৯২০	২৭৯৯	১১	২৮.৪	২০৬৭৫৫	৪৯৬১২
জয়পুরহাট	৯৬৫	৮০২	৫	৩০.২	৬০৭৫২	১৩৩৭২
দিনাজপুর	৩৪৩৮	২৩৭১	১৩	২৯.৮	২০১৫৯৫	৭০৫৮২
পঞ্চগড়	১৪০৫	৭৪৬	৫	৩০.৬	৬৪৩৫০	২৮৮৫৬
ঠাকুরগাঁ	১৮০৯	১০৫৯	৫	২৭.৩	৮৬৯৫৫	৩৭৬৮১
পাবনা	২৩৭১	২০১৬	৯	২৬.৮	১৩২০৯৮	৪৯৬১৮
সিরাজগঞ্জ	২৪৯৮	২৩৭৪	৯	২৭.০	১৪৬৬৯৪	৬৫৯৮৮
নওগাঁ	৩৪৩৬	২২৫১	১১	২৮.৪	১৯১৫২১	৬২০৫৭
নাটোর	১৮৯৬	১৪৫৫	৬	২৭.০	১২৬০৪০	৪৩০৪০
নবাবগঞ্জ	১৭০২	১২৩২	৫	২৩.৮	৮১৫৩৯	৩৯১৮০
রাজশাহী	২৪০৭	১৯৮৮	১৩	৩০.৬	১৩৮৫২৩	৫২৫৯৪
গাইবান্ধা	২১৭৯	২০৪১	৭	২৪.৩	১৯৬২৩১	৫৩৬৭৯
কুড়িগ্রাম	২২৯৬	১৬৮১	৯	২২.৩	১৬৪৫৪৫	৫৫৫১০
লালমনিরহাট	১২৪২	৯৯৯	৫	২৩.৮	৮৯৮০৯	৪১১০৫
নীলফামারী	১৬৪১	১৪১৬	৬	২৫.৩	১৩০১৯৬	৫০৯৫২
রংপুর	২৩০৮	২২৬৯	৮	২৬.৭	২০২৩৯২	৭২৭৭৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ১৯৯৭

www.pathagar.com

বিহারৈল- এর বুদ্ধ-মূর্তি। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। গুপ্তযুগের সারনাথ শৈলী। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে সব বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে এই মূর্তিটিই সর্ব প্রাচীন।

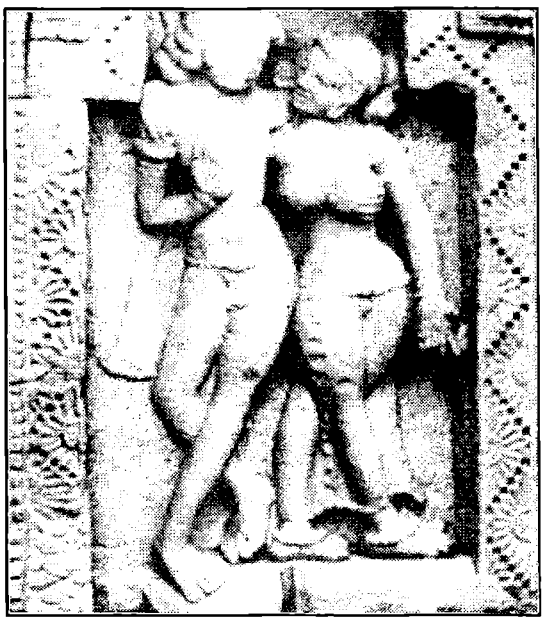

যুগল মূর্তি পাহাড়পুর নওগাঁ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি।

www.pathagar.com

বোধিসত্ত্ব (লোকেশ্বর) মূর্তি। আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। রাজশাহী শহরের হরগ্রাম এলাকায় প্রাপ্ত।

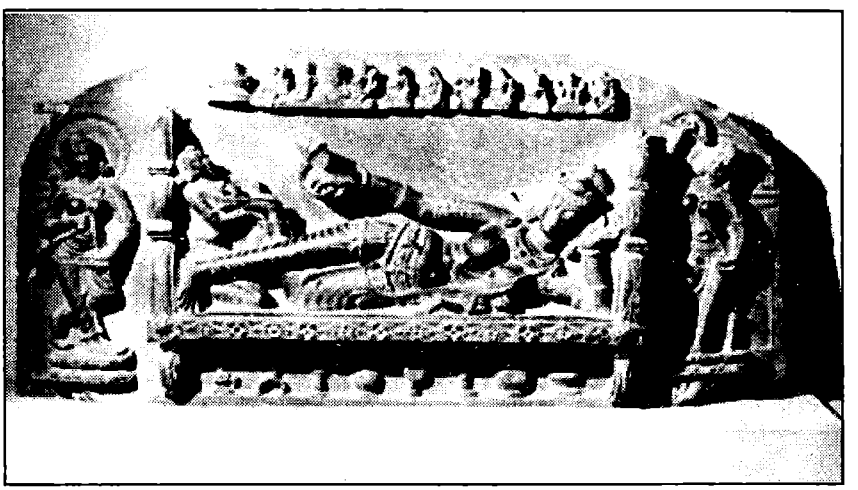

মা ও শিশু। পাল ভাস্কর্য।খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

www.pathagar.com

বাংলা লিপির উদ্ভব

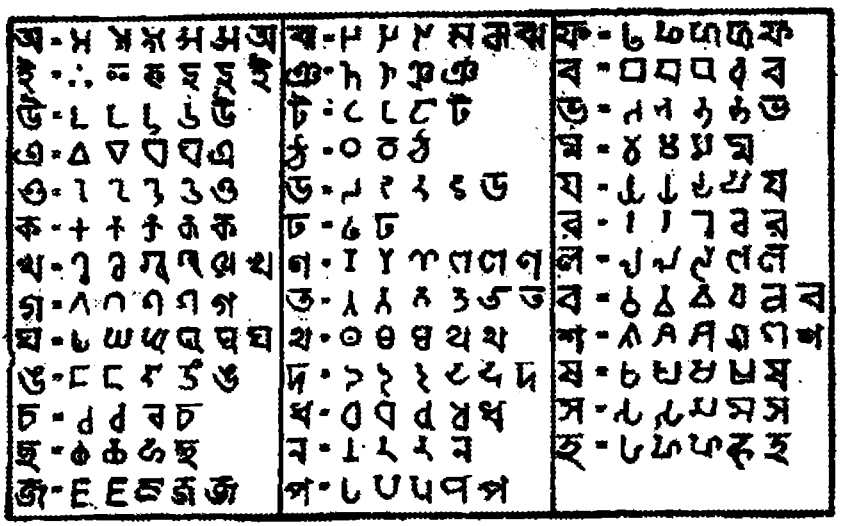

সম্রাট অশোক কতৃক ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপি থেকে বর্তমান বাংলা অক্ষরের উদ্ভব হয়েছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত রাজা বিজয় সেন- এর শিলালেখর অক্ষরকে সাধারণত আদি বাংলা হরফ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

www.pathagar.com

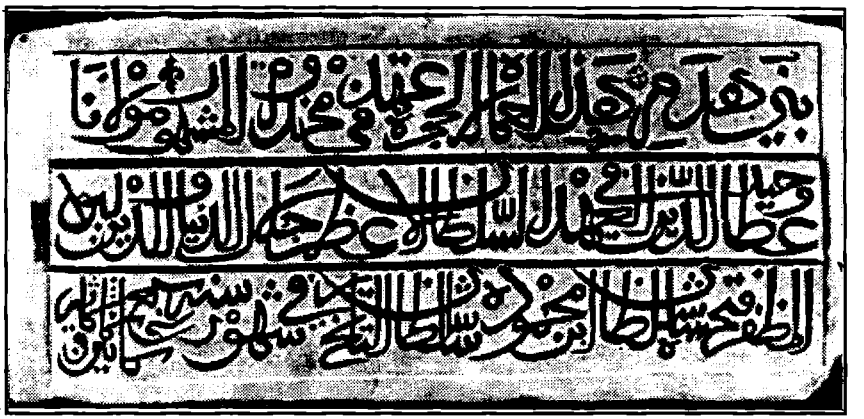

জালাল-আল্- দীন ফতে শাহ্-এর সময়কার শিলা-লিপি (১৪১৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি)।
রাজশাহী শহরের হাতেম খাঁ মহল্লায় প্রাপ্ত।

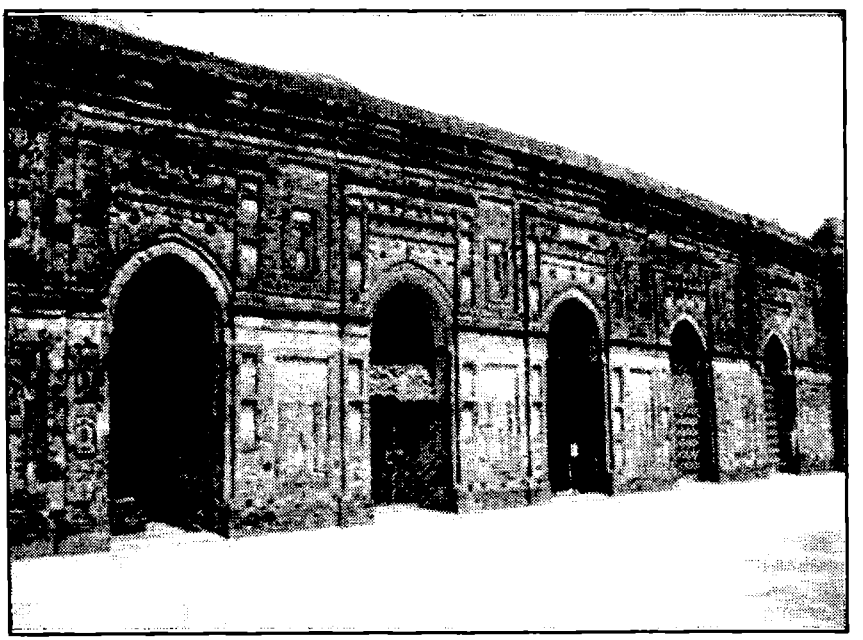

বাঘা মসজিদ। সুলতান নূসরৎ শাহ্ নির্মিত (৯৩০ হিজরি = ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে)।
গৌড়ীয় স্থাপত্যের নিদর্শন।

www.pathagar.com

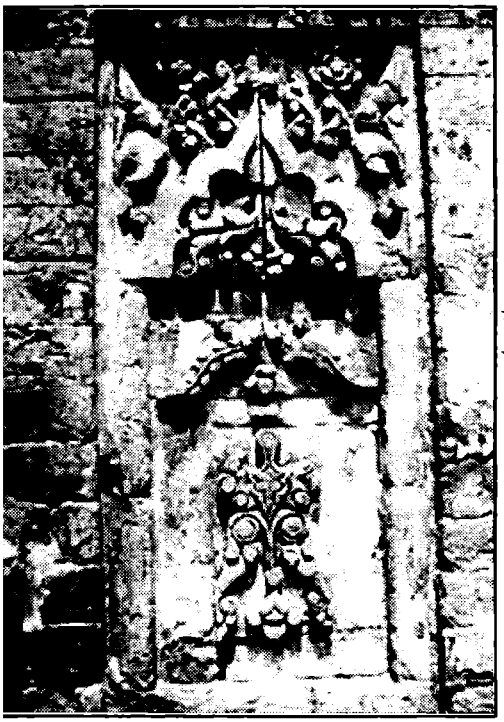

বাঘা মসজিদ এর পোড়া-মাটির ফলকের নকসা

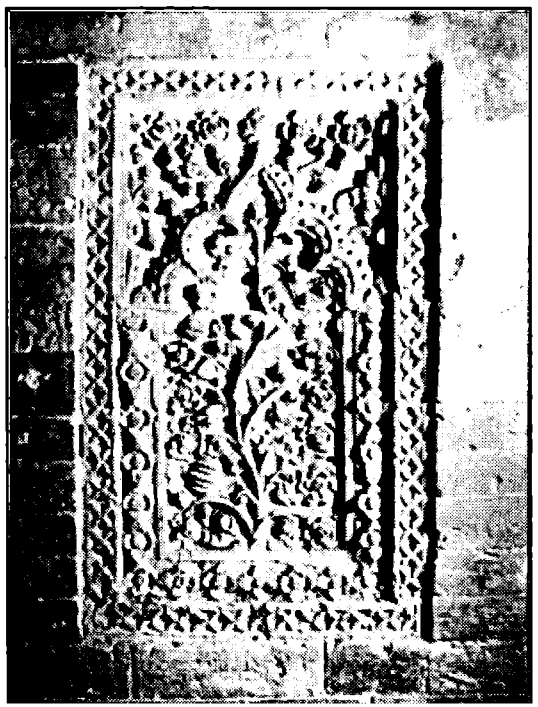

া মসজিদ এর পোড়া-মাটির
কের নকসা

www.pathagar.com

বাঘা মসজিদ এর পোড়া-মাটির ফলকের নকসা

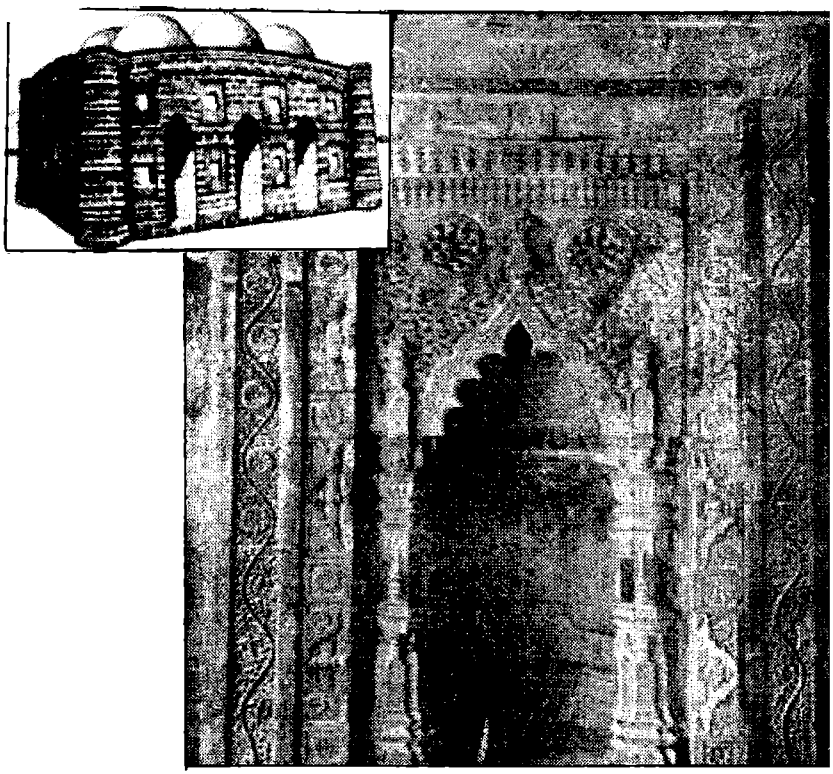

www.pathagar.com

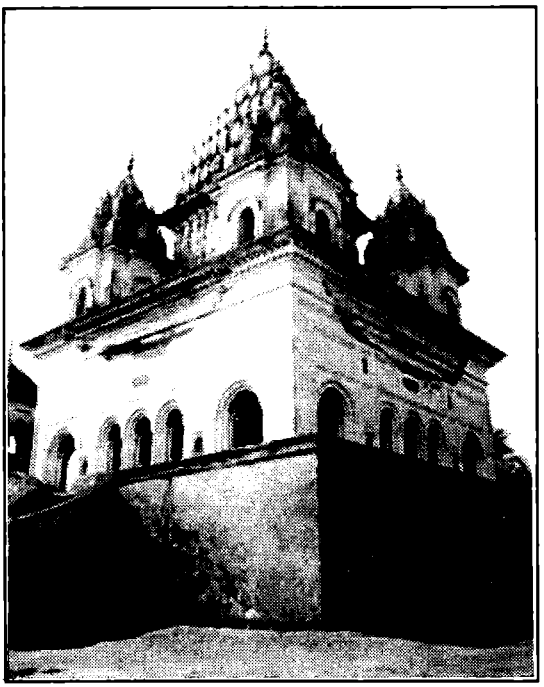

পুঠিয়ার শিব মন্দির। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।
রত্ন মন্দিরের বা বহু শিখর যুক্ত কুটির-দেউলের বিশেষ নিদর্শন। মধ্যযুগের ঐহিত্যবাহী।

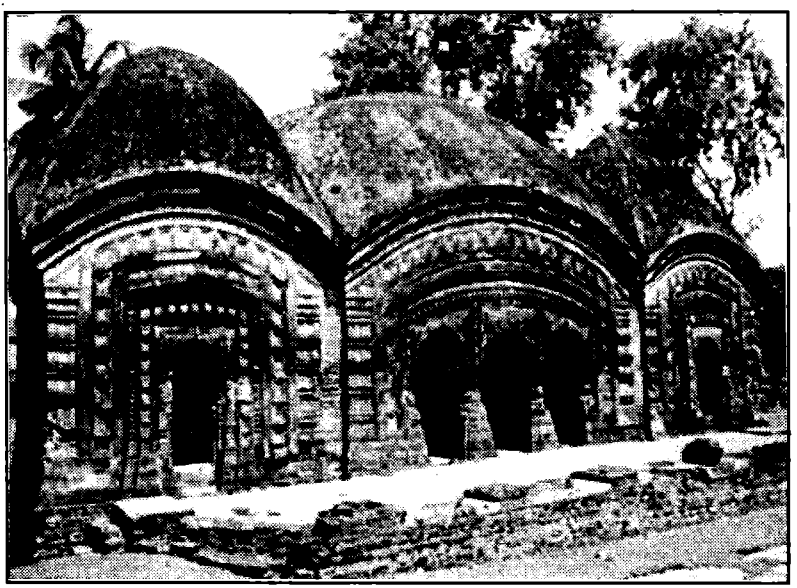

পুঠিয়ার গোবিন্দ দেবের মন্দির। ১৮২৩ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত।
দোচালা কুটির দেউলের বিশিষ্ট রূপ। মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী।

www.pathagar.com

ওলন্দাজের কুঠি-বাড়ি ঃ বড়কুঠি

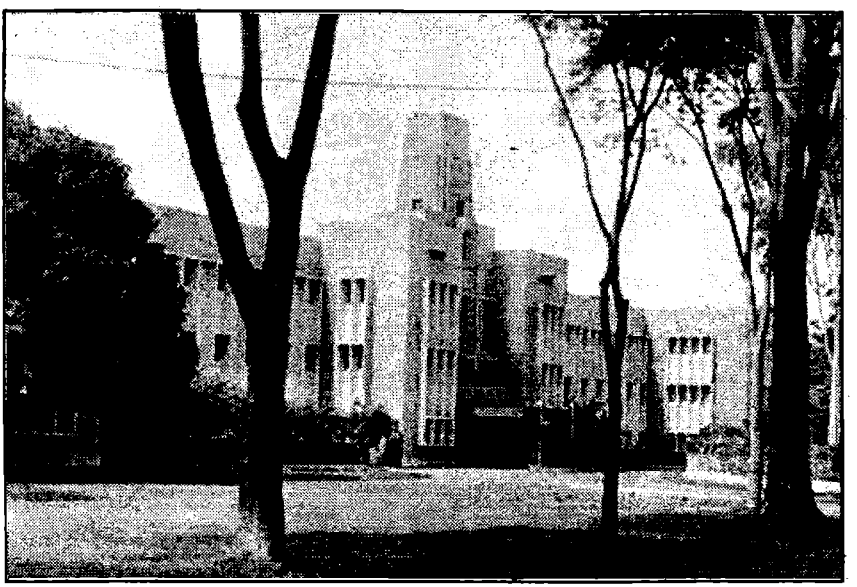

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশাসন ভবন

www.pathagar.com

লোক-শিল্প

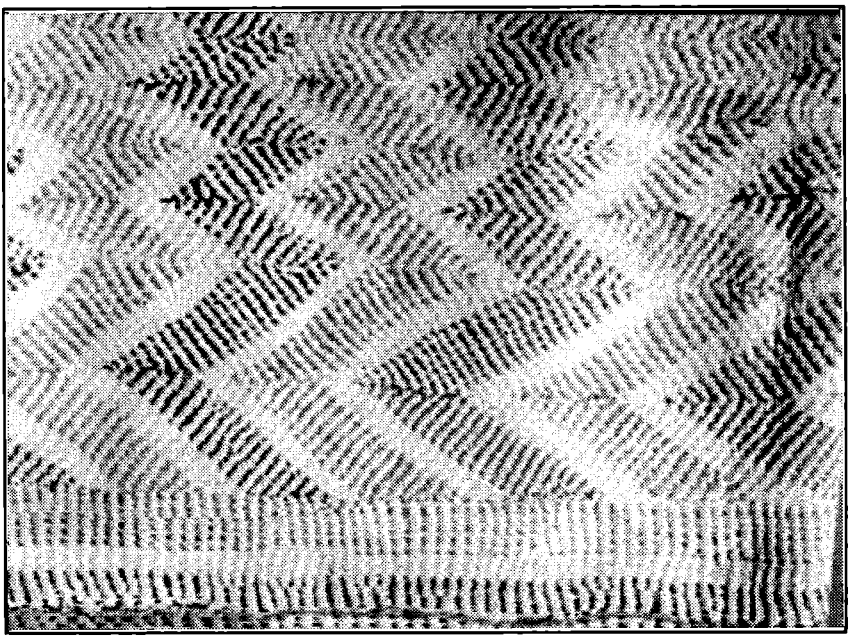

চাঁপাই নবাবগঞ্জের লহরী কাঁথা।

রাজশাহীর সোলার কুমীর

www.pathagar.com

বরেন্দ্র যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ঃ
কুমার শরৎ কুমার রায়।
বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় অঙ্কিত
প্রতিকৃতি।

মুক্তিযুদ্ধ

পদ্মা চরের যুদ্ধ। রাজশাহী। নাম না জানা শহীদের (ই.পি. আর) লাশ। ছবিটি ১৯৭১, ১৬ই এপ্রিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক Statesman পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

www.pathagar.com

www.pathagar.com